উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নূতন পরিবর্তিত সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত

ভারতজনের ইতিহাস

বিনয় ঘোষ

এম. এ রকফেলার রিসার্চ ফেলো (১৯৫৯-৬২) ও বিদ্যাসাগর-লেকচারার (১৯৫৬-৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় . মেম্বার, হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,' 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' প্রভৃতি গবেষণা-প্রধান ইতিহাসগ্রন্থের লেখক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য রাজ্যসরকারের শ্রেষ্ঠ সম্মান "রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার"প্রাপ্ত।

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

রূপশিল্পী :
শ্রীবিমলেন্দু সেন ও শ্রীমতী গীতা দাস

মানচিত্র :
শ্রীরবীন্দ্রলাল ঘোষ

মুদ্রক :
শ্রীক্ষিবোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস-পাঠ্যের যে সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। কথা উঠিতে পারে, ইতিহাসের আবার পরিবর্তন কি? পরিবর্তন বলিতে এখানে অবশ্যই বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন বুঝাইতেছে না। তবে বিষয় এক-ই হইলেও তাহা পড়িবার, জানিবার ও শিখিবার পদ্ধতির পরিবর্তন হইতে পারে। কোন্ বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কিভাবে তাহার বিবরণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়, নূতন ইতিহাস-পাঠ্যে তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করিয়া এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ('বিষয়সূচী' দ্রষ্টব্য)। ইহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে রাজবৃত্তান্তের কাঠামো যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়া, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের লৌকিক ধারার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পাঠ্য বিষয় সাঁইত্রিশটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। রাজবৃত্তান্তকে পর্বভেদে খুব ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে এবং যে-সব বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের সবিস্তারে জানার প্রয়োজন নাই, সেগুলি শুধু ইতিহাসের ধারা বুঝিবার জন্য যেটুকু জানা প্রয়োজন সেইভাবেই দেওয়া হইয়াছে।

এককথায় বলা যায়, ইতিহাসের খুঁটিনাটি সন-তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজবৃত্তান্তের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও, কিশোর-বয়সের শিক্ষার্থীদের কাছে গোড়াতেই তাহা খুব বড় করিয়া তুলিয়া ধরার প্রয়োজন নাই। মোটামুটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খসড়া আকারে (outline) জানিলেই চলিবে। তবে এই খসড়াটুকু শিক্ষার মধ্যে কোন ফাঁক বা গলদ থাকা ঠিক নহে, তাহার সন-তারিখের বন্ধনও দৃঢ় হওয়া কাম্য। ইতিহাসের পর্বান্তরের বাঁকগুলিও বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ভারতের জনসমাজের ও সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারাটি আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত ইতিহাস কি তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবে, এবং ইতিহাসের প্রতি অনুরাগীও হইবে। মনে হয় এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন ইতিহাস-পাঠ্য রচিত হইয়াছে এবং যথাসম্ভব এই গ্রন্থে সেই লক্ষ্যটিকে সযত্নে ও সাবধানে অনুসরণ করা হইয়াছে।

নূতন সিলেবাসে ঠিক যেভাবে পাঠ্যবিষয় অধ্যায়ভেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রত্যেক অধ্যায়ের পাদদেশে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত করার কারণ, ইহা চোখের সামনে থাকিলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই পাঠনিয়ন্ত্রণের সুবিধা হইবে। কোন্ বিষয়ের জন্য কত পৃষ্ঠা আলোচনা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিষয়সূচীতে প্রত্যেক অধ্যায় ও বিষয়ের পাশে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা একেবারে সঠিক হওয়া সম্ভব না হইলেও, যথাসম্ভব এই নির্দেশই পালন করা হইয়াছে। এই পৃষ্ঠা-সংখ্যার নির্দেশ হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে, কোন্ বিষয়ের কতটুকু বিস্তার বা বিশদ ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয়।

এই পাঠ্যবইখানি লেখার ব্যাপারে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বীণা ঘোষ এম. এ. বি. টি. (ইতিহাসের সিনিয়র শিক্ষিকা, নৃপেন্দ্রনাথ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, টালিগঞ্জ) আমাকে সকলরকমে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে ইহার 'সহযোগী লেখকও' বলা যায়। কেবল লেখার স্টাইল বা ভঙ্গি যাহাতে একরকম হয় সেইকারণে আগাগোড়া ইহা আমি নিজে লিখিয়াছি।

৪৭/৩ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২
অগ্রহায়ণ ১৩৬২। বিনয় ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণ

দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি বিষয় সংশোধন ও সংযোজন করা হইয়াছে। কয়েকটি নূতন চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। বিনয় ঘোষ

উৎসর্গ

স্বামী শান্তিময়ানন্দ (বেলুড়)

স্বামী কৃষ্ণময়ানন্দ (নরেন্দ্রপুর)

বিষয় সূচী

[বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যা]

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস

মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রকৃতির সহিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের নায়ক মানুষ, আর তাহার রঙ্গমঞ্চ প্রকৃতি। কথায় বলে মানুষের যেমন দুইটি চোখ, ইতিহাসেরও তেমনি দুইটি চোখ আছে। একটি চোখ ভূগোল (Geography), আর একটি চোখ কালক্রম (Chronology)। এই দুইটি চোখ দিয়া পথ দেখিয়া ইতিহাস আগাইয়া চলে। অর্থাৎ এই দুইটি বিষয় যেন ইতিহাসের দুইখানি পা, এবং এই দুইটি পা'য়ের উপর ভর দিয়া মানুষের ইতিহাস হাঁটিয়া চলে।

ভূগোল ও ইতিহাস

যত অতীতের দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব তত দেখিতে পাইব মানুষ কত বেশী প্রকৃতির উপর অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির ভূ-সংস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সমতল-মালভূমি-উপত্যকা, সমুদ্র-মরুভূমি, নদনদী, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার জলবায়ুর তারতম্য ইত্যাদি মিলিয়া যে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেশে-দেশে রচিত হইয়াছে, তাহার

Syllabus

CHAPTER I—(a) Geography—the principal element of environment.

Geographical features contributing to the unique character of some nations.

(b) Physical features of the Indian sub-continent—five well-defined areas. Importance of the Himalayas—the Vindhyas, the Indian Ocean.

(c) MAN IN INDIA—Different races, languages, religions, ways of life—evolution of a composite culture.

(d) Unity in Diversity.

সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া মানুষ যে কেবল বাঁচিবার ও উন্নতি করিবার কলাকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে তাহা নহে, এই সংগ্রামের ফলে সে বাহিরের প্রকৃতিকে বদলাইয়াছে, নিজেও বদলাইয়াছে। পাহাড় অঞ্চলের মানুষ, নদীবহুল অঞ্চলের মানুষ, বনাকীর্ণ দেশের মানুষ, মরুভূমির মানুষ, সাগরদ্বীপের মানুষ, শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ পরিবেশের ভিন্নতার জন্য বিচিত্র সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে।

গ্রীস ও ইংলণ্ড। দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রীস ও ইংলণ্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীসের চারিদিকে ও মধ্যখানে পাহাড়-পর্বত এবং করিন্থিয়ান উপসাগর দুইভাগে দেশটিকে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতি নিজেই যেন গ্রীসের ঐক্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাসেও তাই হইয়াছে দেখা যায়, গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ-বিবাদ করিয়াছে। কিন্তু গ্রীসের তিনদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ভূমধ্যসাগর, তাহার ফলে গ্রীকরা নৌবিদ্যায় ও বাণিজ্যে কুশল হইয়াছে, এবং সমুদ্রপথে দেশ-বিদেশের সহিত সংস্কৃতিরও লেনদেন করিয়াছে। ইংলণ্ড সমুদ্রবেষ্টিত একটি দ্বীপের মতো বলিয়া ইংরেজ জাতি যেরকম সমুদ্রমুখী হইয়াছে, বোধ হয় ইউরোপের আর কোন জাতি ঠিক তেমনটি হয় নাই। নৌবলই ইংরেজদের প্রধান বল, এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অন্যতম অবলম্বন।

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষ একটি বিশাল মহাদেশের মতো, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেরও তাহার অন্ত নাই। প্রকৃতিবিদ্ ও ভূবিদ্‌রা কেহ কেহ ভারতবর্ষকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তিনটি প্রধান অঞ্চলে, কেহ বা চারটি ও পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়াছেন। তিনটি প্রধান অঞ্চলের মধ্যে প্রথমটি উত্তরের হিমালয় পর্বতের বিশাল প্রাচীর, দ্বিতীয়টি তাহার তলায় বিস্তৃত সমতলভূমি যাহার উপর দিয়া সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদনদী বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহিয়া গিয়াছে। ইহাকে উত্তরভারতের সমভূমি বলা হয়, অথবা 'ইন্দো-গাঙ্গেয়' সমভূমি। তৃতীয়টি উপদ্বীপ-ভারতের বিরাট মালভূমি। এই তিনটি প্রধান অঞ্চলকে পাঁচটি অঞ্চলেও এইভাবে ভাগ করা যায়:

১। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল।

২। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত সমভূমি।

৩। ইহার দক্ষিণে বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতমালা পর্যন্ত প্রসারিত উচ্চমালভূমি, আরাবল্লী পাহাড়ের পূর্বদিক হইতে ছোটনাগপুর ও বিহারের মধ্য দিয়া রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল।

৪। ইহার দক্ষিণে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল।

৫। ইহার দক্ষিণে আসমুদ্রবিস্তৃত গোমুখের মতো সঙ্কীর্ণ সমতলভূমি। আমাদের পুরাণের 'ভুবনকোষ' বিভাগেও ভারতবর্ষকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে।

১। উদীচ্য বা উত্তরাপথ।

২। দক্ষিণাপথ।

৩। প্রাচ্য বা পূর্বভারত।

৪। অপরান্ত বা পশ্চিমভারত।

৫। মধ্যদেশ বা মধ্যভারত।

প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশেষত্বের জন্য ইতিহাসের ধারাতেও বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এক কথায় সমগ্র উত্তরভারতকে 'আর্যাবর্ত' এবং দক্ষিণভারতকে 'দাক্ষিণাত্য' বলা হইয়াছে, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যবর্তী অঞ্চলেরও এমন বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা উপেক্ষা করা যায় না।

হিমালয় পর্বতের গুরুত্ব

ভারতের ইতিহাসে হিমালয়পর্বতের মতো ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর কোন পাহাড়-পর্বত বা নদনদীর নাই। উত্তরের সীমানা জুড়িয়া ধনুকের মতো বাঁকিয়া হিমালয় অবস্থান করিতেছে। এই পর্বতমালা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল এবং পূর্বাংশের তুলনায় পশ্চিমাংশ বেশী প্রশস্ত। হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বাহিরের কোন রাষ্ট্র বা জাতির পক্ষে সহজে এদেশে অভিযান করা, অথবা ভারত সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। একদিকে হিমালয়

ভারতকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী নিশ্চিন্ততা ও শান্তির কোলে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির সাধনা করিবার সুযোগ দিয়াছে। তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে এই হিমালয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া ভারতের মনও বহির্মুখী ও সাম্রাজ্যলিপ্সু হয় নাই। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের অহিংসা ও শান্তির আদর্শ যে কতখানি এই হিমালয়ের দান তাহা ভাবিবার কথা। হিমালয়ের তুষারশুভ্র ধ্যানগম্ভীর মূর্তি যেন ভারতেরই আত্মার প্রতিমূর্তি। মহাকবি কালিদাস হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' বলিয়াছেন, আমরা 'ভারতাত্মা' বলিতে পারি।

কেবল আত্মা নহে, হিমালয় ভারতের প্রাণ। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদনদী শাখা-প্রশাখাসহ সমগ্র উত্তরভারতের পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষকে জীবন ও জীবিকা দান করিতেছে। ইহাদের উৎস হিমালয়ের গিরি-নির্ঝর। যেন ভারতজনের জীবনের উৎস হিমালয়।

হিমালয় দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও এবং ভারতকে শান্তিতে থাকিতে দিলেও, খাইবার বোলান গোমাল প্রভৃতি গিরিপথের ভিতর দিয়া বাহিরের অনেক জাতি উপজাতি ভারতে বহুবার অভিযান করিয়াছে। বাহিরের জগতের সহিত যোগাযোগের পথগুলি আসিয়া মিশিয়াছে ভারতের এই উত্তরপশ্চিম সীমান্তে। পূর্ব-ভূমধ্যসাগর ও ককেশাস হইতে, রাশিয়ার স্টেপি অঞ্চল হইতে, তাকলামাকান, মোঙ্গলিয়া ও চীনদেশ হইতে যোগাযোগের স্বাভাবিক পথগুলি সব এই প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুদূর অতীতে কত জাতি যে আসিয়াছে ঠিক নাই, আমরা সঠিক তাহা জানিও না। যাহাদের কথা আমরা জানি সংখ্যায় তাহারাও কম নহে। এই পথে আর্যরা আসিয়াছে, গ্রীকরা আসিয়াছে, শক কুষান হুনরা আসিয়াছে। এই পথে ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতার সহিত গ্রীক-সভ্যতা ও খ্রীষ্টানসভ্যতার মিলন হইয়াছে, জীবনদর্শনের আদানপ্রদান হইয়াছে।

বিন্ধ্য পর্বতমালার গুরুত্ব

হিমালয়ের পরে ভারতের প্রাকৃতিক রূপায়ণে বিন্ধ্য পর্বতমালা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, আর্যাবর্তকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মধ্যখানে বিন্ধ্যপর্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিন্ধ্যশ্রেণীর এই বাধা স্বচ্ছন্দে উত্তর ও দক্ষিণভারতের সভ্যতাকে দুইটি স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করিতে পারিত। ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট পাহাড় স্কটল্যাণ্ডকে ইংলণ্ড হইতে সভ্যতার ভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছে, এবং পীরেনিজ পর্বতমালা আইবেরিয়ান উপদ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বিন্ধ্য ও উত্তর ও দক্ষিণভারতের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া উভয়ের সভ্যতার ধারার মধ্যে কতকটা পার্থক্য আনিয়াছে। এই পার্থক্য যে শেষ পর্যন্ত বাড়িয়া যায় নাই, এবং 'হিমবৎসেতু-পর্যন্তম্' অর্থাৎ হিমালয় হইতে রামেশ্বরম্ পর্যন্ত যে ভারতসভ্যতার ধারা অবিচ্ছিন্ন খাতে বহিয়া গিয়াছে, বিন্ধ্যের বাধা মানে নাই, তাহার কারণ অগস্ত্য মুনি এই পর্বতের গর্বোদ্ধত মাথা হেঁট করাইয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচরদের সামনে দক্ষিণাভিমুখী যাত্রাপথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য কি? উত্তরাপথের আর্যসভ্যতার প্রতিভূ ও ধারক-বাহক হইলেন অগস্ত্য। সমস্ত প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণাপথেও আর্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল, এই কাহিনী তাহারই ইঙ্গিত করে। আজও তাই দক্ষিণভারতে অগস্ত্য মুনি ঋষিশ্রেষ্ঠ ও বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

ভারত-মহাসাগরের গুরুত্ব

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার মতো দক্ষিণে ভারতমহাসাগর ভারতবর্ষকে একদিকে আরব, আফ্রিকা এবং অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া প্রভৃতি দেশের অভিযান ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু পার্বত্য পথের মতো সমুদ্রপথ মানুষের কাছে তেমন দুর্গম নহে। সামান্য ভেলায় করিয়া, অথবা তিনকাঠের ক্যাটামারানে করিয়া (পুরী, গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি উপকূল-অঞ্চলে নুলিয়া-জেলেরা ইহাতে চড়িয়া এখনও সমুদ্রে মাছ ধরে) আদিকাল হইতে আদিম মানুষ সমুদ্র পাড়ি দিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিয়াছে। সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করিতে কোনদিনই বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। দক্ষিণভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে গুজরাট হইতে ত্রিবন্দ্রাম পর্যন্ত, এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত যে সব ছোটবড় বন্দর ও পোতাশ্রয় আছে তাহা পূর্ব পশ্চিম দুই দিকের সাগরপারের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে অতীতে সাহায্য করিয়াছে, বর্তমানেও করিতেছে।

ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী

মানবজাতির অনেক শাখা-প্রশাখা লইয়া ভারতজনের বিকাশ হইয়াছে। দুই-চারশত বছরে হয় নাই, হাজার হাজার বছরে হইয়াছে। 'আর্য', 'দ্রাবিড' ইত্যাদি নাম ভাষাগোষ্ঠীর নাম, এখন জাতির নাম হিসাবে চলিয়া গিয়াছে। তাই জাতির নাম হিসাবেই আমরা এই কথাগুলি এখানে ব্যবহার করিতেছি। ভারতবর্ষে আর্যরা আসিবার পূর্বে প্রধানত তিনটি জাতির মানুষ এদেশে বাস করিত—

১। **নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু।** চেহারা খাটো, রঙ ঘোর কালো, নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু, চুল কোঁকড়ানো। সভ্যতা বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি তাহা ইহাদের বিশেষ কিছুই ছিল না। মনে হয় সমুদ্রের উপকূলে বাস করিয়া, মাছ ধরিয়া বা শীকার করিয়া ইহারা জীবনধারণ করিত। এখন ইহারা প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তবে দক্ষিণভারতে ও আসাম অঞ্চলে কোথাও কোথাও ইহাদের একটু-আধটু অবশেষ এখনও দেখা যায়। ইহারাই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া নৃবিজ্ঞানীরা কেহ কেহ অনুমান করেন।

২। **অস্ট্রিক জাতি।** চেহারা কেমন ছিল সঠিক জানা যায় না, তবে মনে হয় আকারে খাটো ছিল এবং নাক ও থ্যাবড়া ছিল। গঙ্গার উপত্যকায়, মধ্য ও দক্ষিণভারতে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে, এবং মনে হয় ধান ও ফলের চাষ, পান-সুপারির ব্যবহার, এগুলি ভারতীয় সভ্যতায় অস্ট্রিকদের দান। এখন এই জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উত্তরভারতের সমভূমিতে হিন্দু-সাধারণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

৩। **দ্রাবিড় জাতি।** ইহারা দেখিতে দীর্ঘকায়, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। অনেকে মনে করেন যে মহেঞ্জদড়ো ও হড়প্পার নগরসভ্যতা দ্রাবিড়দেরই কীর্তি। হিন্দুসভ্যতার ধর্ম ও ধ্যানধারণায় দ্রাবিড়দের অনেক দান আছে।

এই তিনটি আর্যপূর্ব জাতি ছাড়া প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নামে এক চতুর্থ জাতি ভারতে ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিমালয়ের পূর্ব-পাদদেশে মোঙ্গলয়েড জাতির প্রবেশ ও মিশ্রণের কথাও বলা হইয়া থাকে।

ভারত
নদী ও পাহাড়
আরাবল্লী
চম্বল
যমুনা
গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র
নর্মদা
তাপ্তী
শোণ
মহাদেব
অজন্তা
মহানদী
গোদাবরী
কৃষ্ণা
কাবেরী
ভারত
প্রাকৃতিক
১৮০০০ ফুট হইতে অধিক
৬০০০ ,, ,, ১৮০০০
১২০০ ,, ,, ৬০০০
সমুদ্রতল হইতে ১২০০
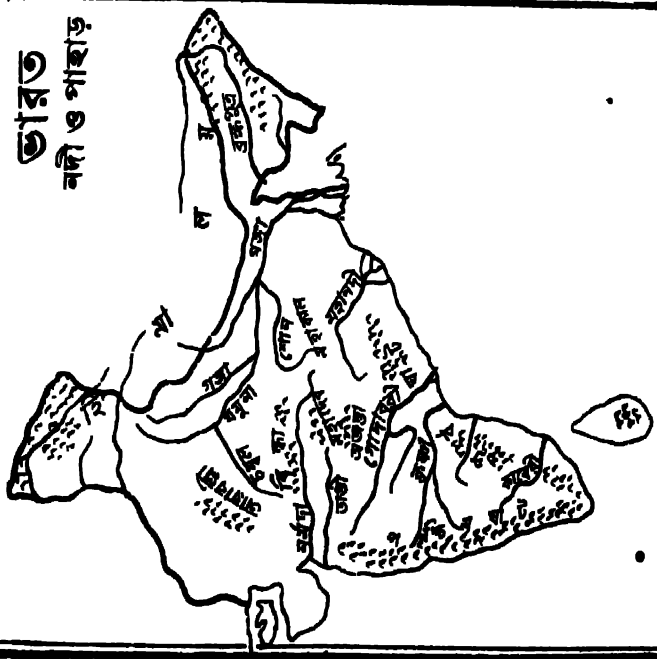
ভারতজনের ভাষা

এত জাতি-উপজাতির মিলন-মিশ্রণ যেদেশে হইয়াছিল তাহার ভাষারও বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য আছেও, সংখ্যাও কম নহে, এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্যের ধারাও আছে। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত গ্রিয়ারসন সাহেব বড বড় ২০টি খণ্ডে ভারতের ভাষাগুলির আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতীয ভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ১৭৯টি, এবং উপভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ৫৪৪টি। ভাষার এই সংখ্যা দেখিলে ভয় পাইবার কথা। মনে হইবে, ভারতেব ভাষারণ্যে প্রবেশ কবিয়া পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সত্যই যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ভারতের একরাষ্ট্রীয়তাও এই অরণ্যে হারাইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হাবায নাই, কারণ ভাবতের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা কয়েকটি মাত্র, এবং তাহাদেব মধ্যেও দুই-তিনটি মূল ভাষার যোগসূত্র আছে। ছোটখাট অপ্রচলিত ভাষা বাদ দিয়া ভাবতের মোট প্রধান ভাষা ১৫টি ধরা যাইতে পাবে। কেবল এই ভাষাগুলি আমাদের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে ব্যবহাব কবা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বিচার করিলে এই পনেরটি ভাষাকে ১২টিতে দাঁড় করানো যায়।

ভারতের ১৫টি মুখ্য ভাষার মধ্যে উত্তরভারতের ভাষা ১১টি :

হিন্দী		গুজরাটী
উর্দু		সিন্ধী
বাংলা		কাশ্মীরী
ওডিয়া		পাঞ্জাবী
মারাঠী	আসামী	নেপালী

দক্ষিণভারতের প্রধান দ্রাবিড়-ভাষা ৪টি :

তেলুগু	তামিল্
কানডী	মালয়ালম্

উত্তরভারতের ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী ও উর্দুকে একই ভাষার দুইটি রূপ বলা যায়, বিদেশী শব্দ আমদানি করিয়া দুইটি লিপির দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। পাঞ্জাবী ও নেপালী ভাষাও সাধু-হিন্দীর নিকট-আত্মীয়, বাংলা ও আসামীর

সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। উত্তরভারতে আর্যগোষ্ঠীর এই ১১টি ভাষা যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) অতি সহজ আন্তঃপ্রাদেশিক সূত্ররূপে কাজ করে। এই হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষার কল্যাণে প্রায় সারা উত্তরভারতের (এবং অনেকটা দাক্ষিণাত্যেরও) অধিবাসীরা পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান দূর করিয়া ভাবের আদান-প্রদান করে।

ভারতের মিশ্র-সংস্কৃতি। ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বহু ভাষা-উপভাষা, নানারকমের ধর্মমত ও সম্প্রদায়, বিবিধ আচার-ব্যবহার ইত্যাদি মিলিয়া-মিশিয়া যে অখণ্ড ভারত ও একটি ভারতজনের মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, তাহা একটি মিশ্র-মূর্তি, কোন যান্ত্রিক মসৃণ মূর্তি নহে। ভারতের জনগণের জীবন নানারকম ডিজাইনের বহুবর্ণের একটি চিত্রের মতো, সমস্ত বৈচিত্র্য মিলাইয়া কতকটা কার্পেটের মতো তাহার সংস্কৃতির প্যাটার্ন। এইজন্য ভারত-সংস্কৃতিকে 'মিশ্র-সংস্কৃতি' বলা যাইতে পারে।

ভারতের ধর্ম

ভারতের প্রধান ও প্রাচীন ধর্ম হইতেছে হিন্দুধর্ম। তাহা ছাড়াও আরও ধর্মমতের বিকাশ হইয়াছে ভারতবর্ষে, যেমন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম ইত্যাদি। আর হিন্দুধর্মের মধ্যে যে কত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে তাহার ঠিক নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বড় বড় সম্প্রদায় তো আছেই, আবার এই সম্প্রদায়গুলিও অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া হিন্দুসমাজের ভিতরে বহু জাতি-উপজাতির নিজস্ব ধর্মমত আছে, দেবদেবীর ও পূজার্চনার অন্ত নাই। আদিবাসীদের মধ্যে এবং সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এত ধর্মমত ও সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, হানাহানিও নাই। যে যাহার নিজস্ব মত ও পথ লইয়া ধর্মক্ষেত্রে চলিয়াছে, পাশাপাশি বাস করিতেছে, মতামত লইয়া বচসা, তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, কিন্তু কোন গুরুতর মনান্তর বা বিরোধ হইতেছে না। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে তাই বাহির হইতে ইসলামধর্ম, খ্রীষ্টধর্মের মতো বড় বড় ধর্ম যখন আসিয়াছে, তখন ভারতের

মাটিতে হিন্দুসমাজের পাশাপাশি অবস্থান করিতে তাহাদের অসুবিধা হয় নাই। একই গ্রামে মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গির্জা আছে, এরকম গ্রামের অভাব নাই আমাদের দেশে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান একই গ্রামে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে, এ-দৃশ্যও বিরল নহে।

ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐক্য

ভারতের কত জাতি, কত ধর্ম, কত ভাষা, কত বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানিতে পারিলাম। যে-দেশে এত ধর্ম, এত জাতি ও এত ভাষা, সে-দেশে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐক্য কোথায়? কোথায় সেই অদৃশ্য সূত্র, যাহা দিয়া এই সকল ধর্ম ভাষা ও জাতিকে এক ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের বন্ধনে ভারত বাঁধিয়া রাখিয়াছে?

ভারতের ঋষি, ভারতের কবি, ভারতের পুরাণকার সকলে যে-ভারতের স্তুতি ও কীর্তি গাহিয়াছেন, সে-ভারত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বা মধ্য ভারত নহে। যে-দেশ ভারতমহাসাগরের উত্তরে এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত, বিষ্ণুপুরাণে সেই দেশকেই বলা হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'। সেখানে যত রকমের লোকেরই বাস থাক, তাহারা সকলে **'ভারতী সন্ততি'**, অর্থাৎ পুরাকালের ভরত রাজার সন্তান। ভারত সম্বন্ধে এই যে পৌরাণিক ধারণা ইহা বহু-ভারতের নহে, এক-ভারতের, এবং এই ঐক্যবোধ কেবল ভৌগোলিক নহে, ইহা জাতিগত ভিত্তির উপর স্থাপিত। সকলে ভরতের সন্তান, অবশ্যই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে—এই উক্তির মধ্যে জাতি-জনগত ঐক্যবোধই জাগিয়া উঠিয়াছে। অতএব অখণ্ড ভারতের ধারণা আধুনিক নহে, খুবই প্রাচীন।

প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাগ্রন্থে এমন একজন রাজার কথা কল্পনা করা হইয়াছে যিনি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের সর্বময় অধীশ্বর হইবেন। তিনি শুধু 'রাজা' নহেন, ভারতের সর্বলোকপ্রিয় **রাজচক্রবর্তী**। তাঁহার মহিমা-কীর্তনে শাস্ত্রকারেরা মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। মৌর্যযুগে, গুপ্তযুগে, মোগলযুগে এই সবভারতীয় স্বপ্ন রাষ্ট্রনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা হইয়াছে। কেবল যে ব্রিটিশযুগে হইয়াছে তাহা নহে।

ভারতের ঐক্য স্থাপনের আর একটি বড় উপায় ছিল **মেলা**। বারো মাসে যেমন তেরো পার্বন ছিল, তেমনি সেই উপলক্ষে শত শত মেলা বসিত সারা

দেশ জুড়িয়া। এই সব মেলায় বহু দূর অঞ্চল হইতে শিল্পী ও কারিগরেরা আসিত তাহাদের জিনিসপত্রের লেনদেন করিতে, বিভিন্ন ধর্মের উপাসক সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিয়া মিলিত হইত। মেলা দীর্ঘকাল চলিলে সেখানে ধীরে ধীরে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বা নগর গড়িয়া উঠিত। এই সব মেলায় ভারতের জনজীবনের বৈচিত্র্য যেমন ফুটিয়া ওঠে, ঐক্যের সেতুও তেমনি রচিত হয়।

ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রচনার আর একটি বড় কেন্দ্র ছিল **তীর্থস্থান**। ভারতের সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিজেদের তীর্থস্থান আছে এবং এমন প্রদেশ নাই যেখানে এই তীর্থ নাই। হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যেমন বিশেষ বিশেষ তীর্থ আছে, মুসলমানদের তীর্থের সংখ্যাও তেমনি কম নহে, খ্রীষ্টানদেরও কিছু আছে। বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ দ্বাদশটি, শাক্তদের পীঠস্থান একান্নটি, প্রাচীনকালে সৌরসম্প্রদায়েরও সাতটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। এই সব তীর্থের প্রধান বিশেষত্ব হইল, এগুলি ভারতবর্ষের কোন বিশেষ প্রান্তে বা প্রদেশে সীমাবদ্ধ নহে, সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। রাজা ও বাদশাহরা যাহা শাসনের জোরে করিতে পারে নাই, ভারতের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সেই সর্বভারতীয় সংস্কৃতিগত ঐক্যভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ভারতের এই ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা" (ভারতবর্ষের ইতিহাস)।

QUESTIONS

1. Estimate the influence of the Himalayas and the Indian Ocean on the history of the Indian people.

2. Show how India offers an example of Unity in Diversity.

3. Show how far India's geography has influenced her history.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের আকর ও উপাদান

দুই-এক পুরুষের কথা আমরা মা, বাবা, ঠাকুমা ঠাকুরদাদার মুখ হইতে শুনিয়া থাকি। তাহাও ইতিহাসেব উপাদান, কিন্তু খুব বেশী হইলে হয়ত একশত বছরের। তাহার আগেকার ইতিহাস জানিতে হইলে কোন লেখা বা ছাপা বই, পুথি পাণ্ডুলিপি, পুবাতন সংবাদপত্র, সরকাবী দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দেখিতে ও পড়িতে হইবে। কিন্তু ছাপাখানা আবিষ্কার অথবা সরকারী দলিলপত্র সংরক্ষণের রীতি খুব বেশী হইলে চার-পাঁচশত বছরের বেশী নহে। চাব-পাঁচ হাজার কি তাহারও বেশী কাল পর্যন্ত অতীতের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদেব নৃতত্ত্ববিদ্ (Anthropologists) ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের (Archaeologists) কাছে যাইতে হইবে। তাঁহারা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করিয়া বহু বিচিত্র উপাদান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই সব উপাদানের সাহায্যে আজ শত শত, হাজাব হাজার বছবের ইতিহাস আমরা জানিতে পারিয়াছি।

শিলালিপি ও তাম্রলিপি

প্রাচীন ইতিহাসের উপকবণের মধ্যে প্রধান হইল শিলালিপি (Inscriptions) ও তাম্রলিপি (Copper Plates)। অতীতেব অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সন-তাবিখ হদিশ কবিতে না পাবিলে ঐতিহাসিকের পক্ষে দিকনির্ণয় করা কঠিন। উনিশ শতকের গোড়া হইতেই শিলা-তাম্রলিপিব দিকে অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জেমস প্রিন্সেপ্ (James Prinsep) ১৮৩৭ সনে দীর্ঘ সাত-আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যখন ব্রাহ্মী বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করিয়া অশোকের রাজত্বকালের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন, তখন হইতে এই সব উপাদানের গুরুত্ব ঐতিহাসিকদের কাছে আরও পরিষ্কার হইতে থাকে। তাহাদের মানস-চক্ষুর সামনে অতীত ইতিহাসের বহুকালের

CHAPTER II—Sources of Indian History : Varied sources of history—ancient. medieval and modern—Inscriptions, coins, monuments, literary evidence.
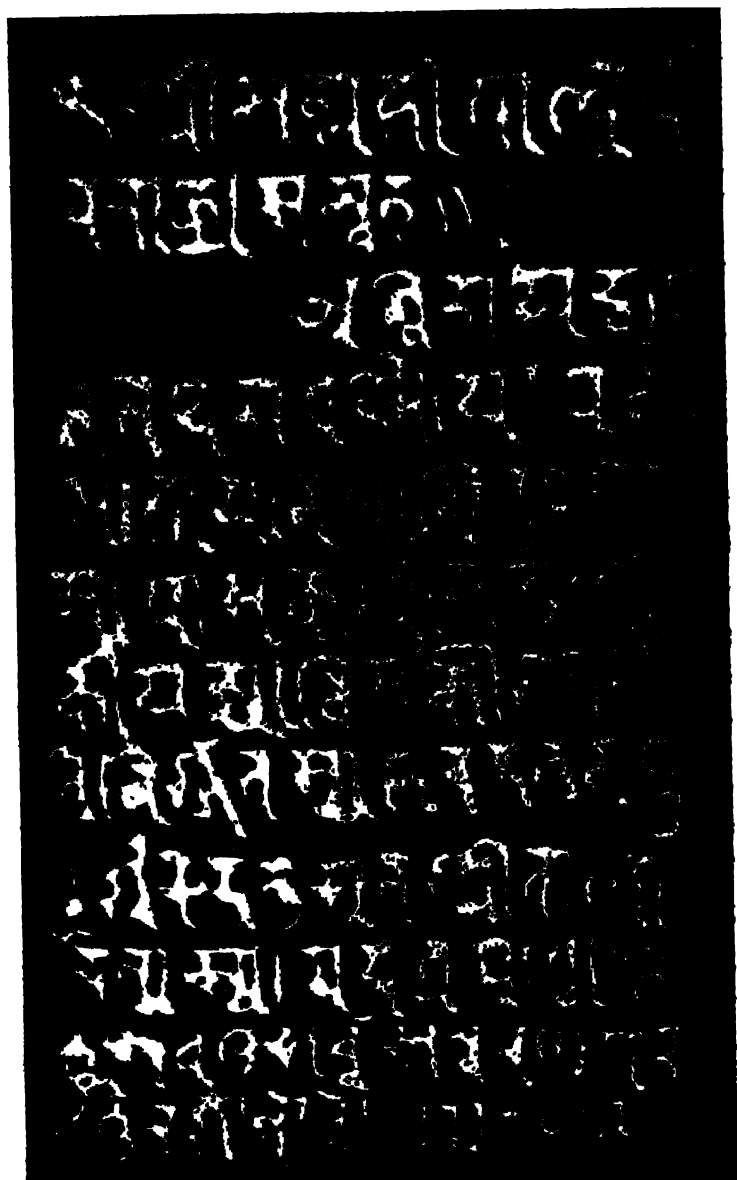
পালরাজা মহীপালের শিলালিপি

রুদ্ধ দ্বার একে একে খুলিয়া যাইতে থাকে, অনাদি অনন্ত অতীত কথা কহিয়া ওঠে।

আদি ব্রাহ্মী বর্ণমালা

এই লিপিগুলি নানা প্রকারের জিনিসের গায়ে লেখা ও খোদাই করা। ধাতুর মধ্যে সোনা রূপা লোহা পিতল ব্রোঞ্জ তামা এবং অন্য বস্তুর পাথর ও পোড়ামাটির ইট বা পাত্র প্রধান। অশোকের শিলালেখগুলিকে 'ধম্মলিপি' বা 'ধর্মলিপি' বলা হয়, কারণ ইহাতে ধর্মের কথা বলা হইয়াছে। 'লিপি'র বদলে ইহাদের শিলাশাসন বা তাম্রশাসনও বলা হয়। 'শাসন' কথার অর্থ চার্টার বা সনদ, শিলাশাসন ও তাম্রশাসন মানে পাথর ও তামার গায়ে খোদিত চার্টার। পাথরের গায়ে রাজা-রাজড়াদের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক উক্তি খোদাই করা থাকিলে তাহাকে শিলাপ্রশস্তি বলা হয়।

ধাতুর মধ্যে তাম্রলিপির সংখ্যাই বেশী। তামার চাদরের উপর খোদাই করিয়া অক্ষরগুলি লেখা। সাধারণত তাম্রলিপিগুলি আকারে ছোট (২½″ × ১⅞″ হইতে ২½″ স্কয়ার পর্যন্ত)। ইহাকে 'পট্টিকা'ও (ট্যাবলেট, প্লেট) বলা হয়।

অধিকাংশ 'লেখা', 'শাসন' ও 'লিপি' পাথরের গায়ে খোদাই করা। এগুলি পাওয়া গিয়াছে পাহাড়ের গায়ে, পৃথকভাবে প্রোথিত শিলাস্তম্ভে, বৌদ্ধস্তূপের আধারে রক্ষিত অস্থিভস্মাধারে, বাহিরে স্তূপের গায়ে, কোন গুহার গায়ে বা প্রবেশ-পথে বড় বড় পাথরের মূর্তির পাদদেশে, শীলমোহরের ছাঁচে, দেবালয়ের দেয়ালে, কড়িকাঠে ও থামে। অশোকের চৌদ্দটি শিলালিপি পাহাড়ের গায়ে পাওয়া গিয়াছে। শিলাস্তম্ভের লিপির মধ্যে এলাহাবাদ, দিল্লী ও চম্পারণে অশোকের স্তম্ভগুলি উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপি ও তাম্রলিপি হইতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের অনেক অজানা ঐতিহাসিক বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণের মধ্যে ঐতিহাসিকের কাছে এই লিপিমালার বা লেখমালার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। ইহার পরেই প্রাচীন মুদ্রার স্থান।

প্রাচীন মুদ্রা

লিপিমালার পরেই প্রাচীন মুদ্রা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম আকর। কিন্তু উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গ্রীকদের প্রভাবে মুদ্রার উপর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সংকেত দিবার রীতি প্রচলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মুদ্রার এই গুরুত্ব সম্বন্ধে কেহই বিশেষ

BAΣIΛEΩΣMEΓAΛOY

ΣΩTHPOΣEΠIΦANOYΣ

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় গ্রীক বর্ণমালা

সচেতন ছিলেন না। কারণ গ্রীকদের আগে ভারতে যে-সব মুদ্রার চলন ছিল তাহা সোনা রূপা বা তামার নিছক মুদ্রা মাত্র। তাহাতে বাজারের মূল্য ঠিক করা যাইত, কিন্তু ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইত না। ভারতে প্রথম যে-রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তিনি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক, নাম 'সৌভূতি। ইহার পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে আর কোন মুদ্রা পাওয়া

গুপ্তরাজাদের মুদ্রা। পরিচারিকা-সহ রাজা। পদ্মবেষ্টিত মহিলা।

যায় নাই। এই সময়ের মধ্যে উত্তরপশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজত্বের অবসান হয়। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের বক্ট্রিয়ান উত্তরাধিকারীরা তাঁহাদের ভারতীয় রাজ্যে দ্বিভাষী মুদ্রা চালু করেন। ইহার একদিকে গ্রীক, অন্যদিকে ভারতীয় ভাষায় বিবরণ লেখা। এই সব দ্বিভাষী মুদ্রা হইতে প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা পাঠোদ্ধারের হদিশ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের

ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুযুগের রাজাদের, মুসলমানযুগের সুলতান ও বাদশাহদের, এমনকি ইংরেজযুগের প্রচলিত সব মুদ্রা হইতে আমরা তৎকালের রাজধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি।

প্রাচীন শিল্পকীর্তি

শিলালিপি, তাম্রলিপি ও মুদ্রা ছাড়াও ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলি (Ancient Monuments) ইতিহাসের অফুরন্ত উপাদান। ছোটবড় শতশত মিউজিয়ামে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সব কীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। মিউজিয়ামে যাহা আছে তাহা প্রধানত ভাস্কর্য ও ধাতুশিল্পের নিদর্শন। অসংখ্য দেবালয়, বিহার চৈত্য স্তূপ মঠ মসজিদ ইত্যাদি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, মিউজিয়ামে তুলিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। সিন্ধুসভ্যতার বহু পোড়ামাটির মূর্তি, শীলমোহর, ছাঁচ, হাঁড়িকুড়ি, পাত্র ইত্যাদি হইতে আমরা তাহার স্বরূপ ও কাল নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। উত্তরভারতে তক্ষশীলা হইতে সারনাথ, নালন্দা, রাজগীর, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, মহাস্থানগড় এবং দক্ষিণভারতে নাগার্জুনকুণ্ড, অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক শিল্প-নিদর্শন খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া স্তূপ দেবালয় মসজিদ মিনার সমাধি প্রভৃতির শেষ নাই। সাঁচীর স্তূপ, সারনাথের স্তূপ, অজন্তা, ইলোরা, কার্লি, এলিফান্টা, খাজুরাহো, মহাবলিপুরম, কাঞ্চী প্রভৃতি এরকম নিদর্শনের দীর্ঘ তালিকা তৈরী করা যায়। এই সব ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের শিল্পকীর্তি হইতে বিভিন্ন যুগের ধর্ম, রীতিনীতি আচার, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

সাহিত্যিক উপাদান

এতক্ষণ আমরা ইটপাথরের ও ধাতুর নিদর্শনের কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু এই সব ইটপাথর ছাড়াও আর এক প্রকার ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে, তাহা প্রাচীন পুথিপত্র, কাব্যনাটকাদি গ্রন্থ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি। এগুলিকে একত্রে আমরা 'সাহিত্যিক উপাদান' (Literary evidence) বলিতে পারি। ইহার বৈচিত্র্য এত যে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলা যায়। যেমন—

ক। **প্রাচীন পুথিপত্র।** গত দুইশত বছরের আগে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, মোটামুটি বলা যাইতে পারে তাহা সবই হাতেলেখা পুথি ও

পাণ্ডুলিপি। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এই সব পুথি-পাণ্ডুলিপির মধ্যে যেগুলির ইতিহাসমূল্য বা সাহিত্যমূল্য খুব বেশী কেবল তাহাই কিছু কিছু ছাপা হইয়াছে। বাকি হাজার হাজার অপ্রকাশিত পুথি এখনও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাহিত্য-পরিষদে রহিয়াছে। অতীত ইতিহাসের অনেক কথা আমরা এই সব পুথি হইতে জানিতে পারিয়াছি।

বেদ উপনিষদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিও একদা হাতেলেখা পুথির আকারে প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে হাতে ঘুরিত, আজ তাহা ছাপা হইয়া সকলের হাতে পৌছিয়াছে। ভারতের প্রাচীন বৈদিক যুগের ও হিন্দুযুগের ইতিহাস আমরা বৈদিক সাহিত্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। একথা ঠিক যে সাহিত্য ও ইতিহাস একবিষয় নহে। যাঁহারা সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাস লিখিবার জন্য তাহা করেন নাই, আবার যাঁহারা ইতিহাস রচনা করেন তাঁহাদেরও কেবল সাহিত্য করিলে চলে না। কিন্তু সাহিত্য মানুষের সমাজ, জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা লইয়া রচিত বলিয়া তাহা ইতিহাসের উপাদান হইয়া থাকে। রাজকাহিনীর সাহিত্য যেমন, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের জীবনকথা তেমনি ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণও। একখানি নাটক, একখানি মহাভারত, একখানি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, একখানি মনুসংহিতা হইতে ইতিহাসের, বিশেষ করিয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, যে পর্যাপ্ত উপাদান সংগ্রহ করা যায়, কয়েকশত শিলালিপি হইতে অনেক সময় তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

খ। **পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত**। ইতিহাসের সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অন্যতম। গ্রীকদের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের সময় হইতে ভারত সম্বন্ধে এই বিবরণ বিচ্ছিন্ন হইলেও মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়। মৌর্য রাজসভায় মেগাস্থেনিস রাজদূত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং ভারতের সমাজ ও জনজীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা 'ইণ্ডিকা' নাম দিয়া রচনা করিয়াছিলেন। টলেমির (Ptolemy) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ হইতেও সেকালের ভারতের অনেক কথা জানা যায়।

গ্রীকদের পরে চীনা পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আসেন ইউয়ান চোয়াং (হিউয়েন সাঙ, ৬২৯-৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ), তাঁহার

আগে আসিয়াছিলেন ফা হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। উভয়েরই ভ্রমণকাহিনী হইতে সেকালের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়।

মুসলমানযুগে ভারতে যে-সব পর্যটক আসেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন বতুতা (১৩৪২-৪৭), মার্কো-পোলো (১২৯৩), রুশ নিকিটিন (১৪৭০-৭৪), উইলিয়াম হকিন্স (১৬০১-১২), টমাস রো (১৬১৫-১৯), ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের (১৬৫৯-৬৬) তাভার্নিয়ের (১৬৪০-৬৭) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-মুসলমান যুগের সন্ধিক্ষণে আরবদেশ হইতে আসিয়াছিলেন মনীষী অল্ বেরুনি। ইঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িয়া একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

হিন্দুযুগের পুরাণের মতো মুসলমানযুগেও অনেক রাজকাহিনী রচিত হইয়াছে। যেমন তারিখ-ই ফিরুজ শাহী, হুমায়ুন-নামা, আকবর-নামা ইত্যাদি। কিন্তু সুলতান ও বাদশাহদের কথা যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের রচনার মধ্যেও অতিরঞ্জন ও প্রশস্তির মাত্রা কম নহে। তবু পরবর্তীকালের এই সব 'বাদশাহনামা' ইতিহাস হিসাবে অনেক উন্নত ও নির্ভরযোগ্য।

ইংরেজযুগে ঠিক এই ধরনের রাজবৃত্তান্ত লেখার প্রথা উঠিয়া যায়, কারণ ইতিহাসের উপকরণ তখন ছাপাখানা, বই ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়। সরকারী নীতি ও কাজকর্মের বিবরণ দলিলপত্রে (Records) সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্বও আধুনিক যুগে স্বীকৃত হয়। ইহার পর হইতে কেবল ইতিহাস রচনার উপাদান নহে, ইতিহাস রচনার ধারাও বদলাইতে থাকে।

QUESTIONS

1. Discuss briefly the principal sources of ancient and medieval Indian history.

2. Estimate the importance of inscriptions and coins in the reconstruction of ancient Indian history with suitable examples.

3. Show how far the ancient monuments have been helpful in the study of Indian history.

তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধুসভ্যতা

মানুষের সভ্যতা প্রথম বাঁক ফিরিয়া একধাপে অনেক উন্নত স্তরে উঠিয়া যায় কৃষিকর্মের আবিষ্কারের পর। এই আদিম কৃষিসভ্যতাকে নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা হয়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Childe) বলিয়াছেন, সুদূর প্রাগিতিহাসের শেষরাত্রির আলোছায়ায় নব্যপ্রস্তরযুগের এই 'কৃষিবিপ্লব' ঘটিয়া যায়। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে একেবারে প্রাগিতিহাসের উষাকালে, যখন চাষ করিয়া ফসল ফলানো ছাড়াও মানুষ তামার মতো ধাতু ব্যবহার করিতে শেখে, দ্রব্যের আদান-প্রদান করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং চাষ হইতে উৎপন্ন ফসলের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করিয়া নগরসভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। প্রথম বিপ্লব ঘটিয়াছিল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দশ-বারো হাজার বছর আগে, দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে। গর্ডন চাইল্ড এই দ্বিতীয় বিপ্লবের সীমানা নির্দেশ করিয়াছেন এইভাবে :

পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি ও ভূমধ্যসাগর, পূবে থর মরুভূমি ও হিমালয়, উত্তরে বলকান, ককেসাস, হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer)। পশ্চিমের অংশটিকে ঐতিহাসিকরা বলেন 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent)। পূর্বের অংশটি প্রধানত ভারতের সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র।

সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র

সিন্ধুসভ্যতার দুইটি প্রধান কেন্দ্র—হড়প্পা ও মহেঞ্জদড়ো—আমাদের কাছে অধিক পরিচিত। হড়প্পা হইল পাঞ্জাবের মণ্টোগোমেরী জেলায়, মহেঞ্জদড়ো সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায়। এই দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও প্রায় ৮০টি কেন্দ্র জুড়িয়া এখানে এক বিশাল সভ্যতার রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উত্তরে

CHAPTER III—Indus Valley Civilization.
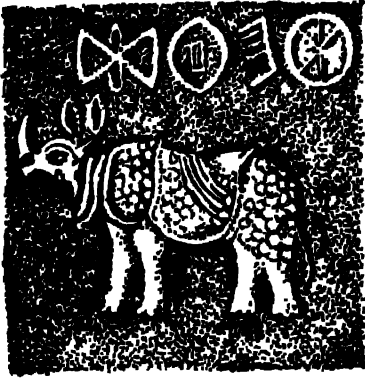
সিন্ধুসভ্যতার শীলমোহর

সিমলা পাহাড়ের নীচে রুপার হইতে করাচীর প্রায় ৩০০ মাইল পশ্চিমে আরবসাগরের কাছে সুত্কাগেন-দর পর্যন্ত এই সভ্যতার সীমানা প্রসারিত। হিমালয় হইতে আরবসাগর পর্যন্ত নদী-উপত্যকার কেন্দ্রগুলি সিন্ধু ও ঘগ্‌গর নদনদীমালার ধারাপথে অবস্থিত বলিয়া এই সভ্যতার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সিন্ধু-উপত্যকাব সভ্যতা' বা 'সিন্ধুসভ্যতা'।

নগর-পরিকল্পনা

হড়প্পা-মহেঞ্জদড়োতে ভূগর্ভ হইতে নগরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বেশ বিন্যস্ত ও পরিকল্পনাসম্মত। নগরদুর্গ হইতে আসল নগর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে একটি টানা রাস্তা আছে, পূর্ব-পশ্চিমে আরেকটি টানা রাস্তাকে ইহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তাটি প্রায় ইহার সমান্তরাল। রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে আধ-মাইলের কিছু বেশী, এবং প্রস্থে ১৪ ফুট হইতে প্রায় ৩৩ ফুট। ছোট পথ ও অলিগলিগুলি আকাবাঁকা হইলেও চোরাগলি বা অন্ধগলি নহে। গলিগুলি ৪ ফুট হইতে ৯ ফুট পর্যন্ত চওড়া। নগরের রাস্তাগুলির আর-একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল ইহাদের ধার ঘেঁষিয়া তলা দিয়া ড্রেন বা নর্দমা চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট রাস্তা ও লোকের বাড়ি হইতে ড্রেনের জল আসিয়া ইট দিয়া গাঁথা চৌবাচ্চায় বা মাটির হাঁড়ি-কলসী-জালায় পড়ার ব্যবস্থা আছে। নগরদুর্গের চারিদিকে কোন প্রাচীর ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ঘরবাড়ির মধ্যে মহেঞ্জদড়োর বিরাট স্নানাগার, স্তম্ভযুক্ত বড হলঘব (মনে হয় দেবালয়), এবং হডপ্পার বিশাল শস্যাগার বা গোলা অন্যতম। স্নানাগারটি উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট, পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট। হডপ্পার বিশাল শস্যগোলাটিও উত্তব-দক্ষিণে ১৬৯ ফুট, এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৫ ফুট, দুইটি ব্লক, মধ্যে প্রায় ২৩ ফুট চওড়া দেওয়াল দিয়া পৃথক করা। যখন মুদ্রার (currency) অভাব হইত বা থাকিত না, তখন নগরবাসীদের মুদ্রার বদলে শস্য দিয়া 'কর' বা 'ট্যাক্স' দিতে হইত। সেই বিপুল শস্য জমা হইত এই বিশাল গোলাঘরে।

অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন

নগরের এই রূপ হইতে সিন্ধুসভ্যতার নাগরিক জীবনেরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ঘরের বাসন-কোসন ছিল পোড়ামাটি পাথর তামা ব্রোঞ্জ রূপা ও হাতির দাঁতের তৈরী। মাটির পাত্রই বেশী। হাতিয়ার (tools) ও অস্ত্রশস্ত্র
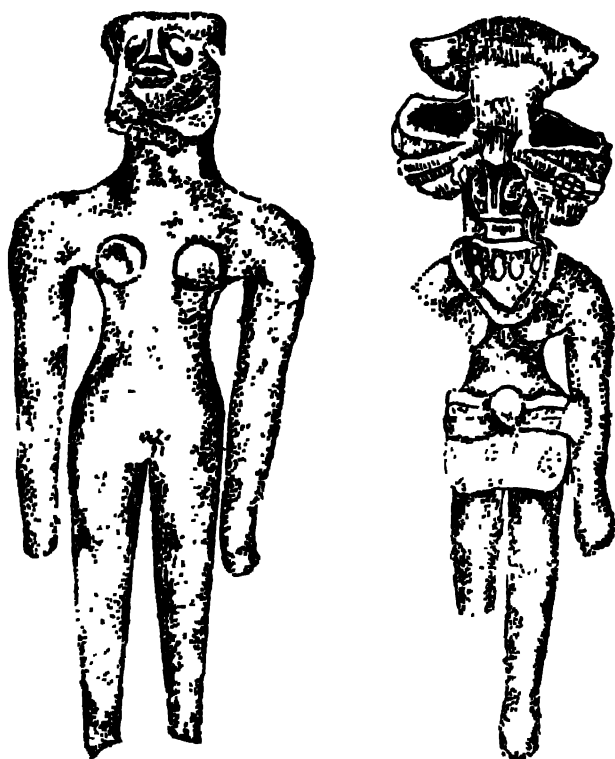
সিন্ধুসভ্যতার পোড়ামাটির মূর্তি

অধিকাংশই দেখা যায় তামার বা ব্রোঞ্জের, লোহার নহে। ছোট সূচ হইতে ক্ষুর ছুরি কাস্তে বড়শি কুঠার লাঙ্গলের ফলা প্রভৃতি কোনটাই লোহার নহে, সবই প্রায় তামার ও ব্রোঞ্জের, এবং কিছু কিছু পাথরেরও আছে। এই সব তামার ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র দেখিয়া মনে হয় সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা সেই সময় ধাতুবিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়াছিল।

এখানকার অধিবাসীরা গম, বার্লি, ছোলা প্রভৃতি চাষ করিত। কিন্তু তাঁহারা নিরামিষভোজী ছিল বলিয়া মনে হয় না। নানাবিধ প্রমাণ দেখিয়া বোঝা যায় মাছ-মাংসও খাইত। খুঁড়িবার সময় এই অঞ্চলের বহু স্থান হইতে মাছ-মাংসের হাড় পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা নানারকমের পশুপালন করিত জানা গিয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল কুঁজতোলা-গরু

ছাগল ভেড়া মহিষ ইত্যাদি। উট না পাওয়া যাওয়াতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সিন্ধু-উপত্যকার পরিবেশে তখন উত্তাপ ও শুষ্কতার মাত্রা খুব বেশী ছিল না। আর ঘোড়ার মতো গতিশীল জন্তু তাহারা নিজেদের বশে আনিতে পারে নাই বলিয়াই আর্যরা প্রধানত ঘোড়ার জোরে তাহাদের জয় করিয়াছে।

সিন্ধুসভ্যতার চিত্রলিপি

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ভারতের ইতিহাসে সিন্ধুসভ্যতার যথেষ্ট গুরুত্বও আছে। প্রথম গুরুত্ব হইল, আগে প্রাচীন সভ্যতার দিগন্ত ছিল আর্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধুসভ্যতার পরিচয় পাওয়ার পরে এখন তাহা নিঃসন্দেহে আরও প্রায় দুই হাজার বছর পিছাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় গুরুত্ব হইল, কিছুকাল আগে পর্যন্ত পণ্ডিতেরা মনে করিতেন ভারতীয় সভ্যতার উদ্‌যোগপর্বে যাহা কিছু দান তাহা প্রধানত আর্যদেরই। সিন্ধুসভ্যতা এই ধারণা ভুল প্রমাণ করিয়া তাহা বদলাইতে বাধ্য করিয়াছে। এখন অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্যরা আসিবার পূর্বেও ভারতের মাটিতে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং তাহার জন্য বাহিরের কোন প্রেরণা তাহার প্রয়োজন হয় নাই। তৃতীয় গুরুত্ব হইল, একই সময়ে পৃথিবীর যে-সব কেন্দ্রে উন্নত নগর-কেন্দ্রিক মানবসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহা কেবল পশ্চিম এসিয়ায় অথবা নীলনদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতও তাহার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। চতুর্থ গুরুত্ব হইল, আগে আর্যদের এদেশে আগমনের ব্যাপার ধোঁয়াটে তো ছিলই, আর্যপূর্ব কালটাও ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর্যরা কাহারা ও কখন আসিল, আসিয়া বেদবর্ণিত যে-সব নগরদুর্গ ধ্বংস করিল তাহা কোথাকার ও কাহাদের,

সিন্ধুসভ্যতার উপাদান হইতে এই সব জটিল সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হইয়াছে। আর্যপূর্বযুগের ইতিহাসের বিরাট শূন্যতা আজ অনেকটা পূরণ হইয়া গিয়াছে।

QUESTIONS

1. Describe briefly the principal features of the Indus Valley Civilisation.

2. Describe the economic life of the Indus Valley people with reference to (a) town-planning, (b) agriculture and trade.

3. Estimate the historical significance of the Indus Valley Civilisation.

চতুর্থ অধ্যায়

আর্যসমাজ ও সভ্যতা

একথা মনে রাখা দরকার যে 'আর্য', 'দ্রাবিড' এই নামগুলি জাতিবাচক নহে, ভাষাবাচক। তবু জাতির নাম হিসাবেই এই নামগুলি চলিয়া গিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করেন, সংস্কৃত গ্রীক লাটিন পারসী প্রভৃতি ভাষাগুলি কোন একটি অতিপ্রাচীন মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সব ভাষার মধ্যে বহু শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা ইহা অনুমান করিয়াছেন। এই মূল ভাষায় যাঁহারা এককালে ভাবের আদান-প্রদান করিতেন পণ্ডিতেরা তাঁহাদেরই 'আর্য' বলেন। মূলত তাঁহারা 'শ্বেতকায়' বা 'ককাসয়েড' গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও, তাঁহাদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার একাধিক বৈজ্ঞানিক নাম আছে। এককালে বা একসঙ্গে আর্যরা ভারতে আসেন নাই, বিভিন্ন সময়ে দলে দলে আসিয়াছেন।

সিন্ধুসভ্যতার সহিত আর্যদের আগমনের সম্পর্ক

সিন্ধুসভ্যতার কাল প্রত্নতাত্ত্বিকরা আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতের মাটিতে আর্য বা বৈদিক সভ্যতার কাল খুব বেশী হইলে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে একথা বলা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৫০০ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার সিন্ধুসভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে (পাঞ্জাব ও তাহার পরিপার্শ্ব) আর্যরা আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের সুরক্ষিত নগরে বারংবার হানা দিয়াছিলেন, ঋক্‌বেদে তাহার বর্ণনা আছে। বেদে এইসব নগরকে 'পুর' বা দুর্গ বলা হইয়াছে। বেদের প্রধান দেবতা 'ইন্দ্র'

CHAPTER IV—Coming of the Aryans in India—their social life and institutions—non-Aryan influence.

তাঁহার অনুগত আর্যদের এই সব দুর্গ ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'পুরন্দর' (অর্থাৎ যিনি পুব ধ্বংস করিতে পারেন)। আর্যপতি দিবোদাসের জন্য দেবতা ইন্দ্র ৯০টি পুর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অনার্যদলপতি শম্বরের শত দুর্গ চূর্ণ করিয়া তিনি আর্যদের জয়যাত্রায় সহায় হইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্যরা এই সব পুর, দুর্গ ও নগর কোথায় দেখিতে পাইলেন? স্বভাবতঃই মহেঞ্জদড়ো, হড়প্পা প্রভৃতি নগবের কথা মনে হয় এবং এই সব নগরেব রূপ বেদের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়।

অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন

বৈদিক যুগ বলিতে দুই-তিনশত বছর বোঝায় না, দুই-তিন হাজার বছর কি তাহাবও বেশী বোঝায়। ঋক্‌বেদ ও তাহার আগের যুগ পর্যন্ত (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে প্রায় ৬০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বৈদিক যুগ বিস্তৃত। ঋক্‌বেদের রচনাকাল পণ্ডিতেরা ১২০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ঋক্‌বেদেব মধ্যে আর্যদের জীবনধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা স্বভাবতঃই আরও অনেক আগেকার কালেব স্মৃতি বহন কবিতেছে। তাই ঋক্‌বেদের আর্যজীবনের সহিত পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য-বর্ণিত আর্যদেব জীবনযাত্রার বেশ পার্থক্য ঘটিয়াছে দেখা যায়।

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা ছোট ছোট পিতৃপ্রধান পবিবারে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে বাস করিতেন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি **বিশ** ও **জনপদ** গড়িয়া উঠিত। পরিবাবের কর্তাকে বলিত **গৃহপতি**, গ্রামেব মোড়লকে বলিত **গ্রামণী**। যাঁহার উপর বিশ পরিচালনার ভার থাকিত তিনি **বিশপতি** এবং জনপদের অভিভাবক হইতেন যিনি তাঁহাকে বলিত **গোপা** বা **জনপতি**। রাষ্ট্রের উদ্ভব তখন হইয়াছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন বংশানুক্রমে রাজারা বা জনপতিরা। রাজারা ঠিক প্রজাদের দ্বারা মনোনীত হইতেন কিনা সঠিক বলা যায় না, হইলেও হইতে পারেন। তবে বংশানুক্রমে রাজত্ব করার প্রথাই তখন বেশী প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদে পুরু ও ত্রিৎসু আর্যজনের রাজবংশের অনেকের নাম পাওয়া যায়। রাজ্য ও প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিল প্রধান রাজধর্ম। এই রাজধর্ম পালনের জন্য যাঁহারা তাঁহার সহায়ক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে

আর্য্যদের প্রবেশ ও প্রসার
কুরুক্ষেত্র
বিদেহ
(মিথিলা)
মগধ
কামরূপ
বিন্ধ্যপর্বতমালা
দ্বারকা
সৌরাষ্ট্র

পুরোহিত প্রধান। ইহা ছাড়া সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন **সেনানী**। পদাতিক সৈন্তদের **পত্তি** এবং রথারোহীদের **রথিন** বলিত। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল তীরধনুক। ধনুকে দুই রকমের তীব ব্যবহার করা হইত, একটি শিং-এব তৈরী তীর, তাহাতে বিষ লাগানো থাকিত; আর-একটিতে তামা বা লোহার ফলা থাকিত, 'অয়োমুখ' বলিত। বর্শা তরবারি ও কুঠারের উল্লেখও পাওয়া যায়। যুদ্ধে নিশান উড়িত বাজনা বাজিত। কুলপতিরা বা পরিবারের কর্তারা গ্রামণীর অধীনে থাকিয়া লড়াই করিতেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংকটের সময় গৃহ ছাড়িয়া কুলপতিদের যুদ্ধ করিতে হইত। দুর্গ বা নগরের ভার যাঁহাদেব উপর থাকিত তাঁহাদের বলা হইত **পুরপতি**। রাজাদের দূত ছিল, গোয়েন্দাও ছিল গোপন খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। জনপদের কাজকর্ম পবিচালনা করিত **সমিতি**, রাজা ও প্রজারা বা গ্রামণীবা এখানে মিলিত হইযা সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সমিতি ছাড়া একটি **সভা** ছিল, মনে হয় সেখানে গ্রামজ্যেষ্ঠরা মিলিত হইতেন।

গ্রাম ছিল জীবনের প্রধান কেন্দ্র। **নগর** বলিয়া কোন কথা ঋক্‌বেদে নাই, 'পুর' কথা আছে। **পুর** দুর্গ বলিয়া মনে হয়। নগরের বিকাশ ঠিক ঋক্‌বেদের কালে হয় নাই। চাষবাসই ছিল প্রধান জীবিকা। **কৃষ্টি, চর্ষণী** প্রভৃতি কথা হইতে কৃষিকর্মের প্রাধান্য বুঝিতে পারা যায়। চাষের জমিকে **উর্বরা** বা ক্ষেত্র বলিত। ক্ষেত্রে জলসেচন করা হইত, সারও দেওয়া হইত। ধান ও যবের চাষ হইত বেশী। কৃষির মতো পশুপালনও অন্যতম জীবিকা ছিল। পশুর মধ্যে গরুকেই অধিক আদরযত্ন করা হইত। গোপদের পেশা ছিল গরু চরানো। গরুর দুধ আর্যদের অন্যতম খাদ্য ছিল। গরুর কান বিঁধাইয়া একটি ৮-এর মতো চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া গরুকে **অষ্টকর্ণী** বলিত। গরু ছাড়া আর্যরা ঘোড়া ছাগল ভেড়া ও কুকুর পালন করিতেন।

কৃষিকর্ম প্রধান পেশা হইলেও আর্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করিতেন। যাঁহারা বণিক ছিলেন তাঁহাদের **পণি** বলিত। বোধ হয় তাঁহারা অনার্য ছিলেন, কারণ তাঁহাদের অপরিচ্ছন্ন আচার-ব্যবহারের বেশ নিন্দা করা হইয়াছে। দ্রব্যের বদলে দ্রব্য দিয়া (barter বলে) ব্যবসা চলিত, মুদ্রা দিয়া নহে। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র, চাদর ও চামড়া। গরু দিয়া দাম ঠিক হইত, এখন যেমন আমরা টাকা দিয়া দাম ঠিক করি। **নিষ্ক** নামে একরকমের

সোনাব মোহর বা চাকতির ব্যবহার ছিল, কিন্তু তাহা মুদ্রা কিনা ঠিক বলা যায় না। যানবাহন ছিল রথ ও গরুর গাড়ি, রথ ঘোড়ায় টানিত। ঋক্‌বেদে অগ্নি দেবতাকে প্রায়ই 'পথিকৃৎ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 'পথিকৃৎ' হইল যিনি পথ করিয়া দেন। বোঝা যায়, চলাচলের পথ বেশী ছিল না, সুগমও ছিল না। চারিদিকে গভীর অরণ্য ছিল, তাহার মধ্যে হিংস্র জীবজন্তু,
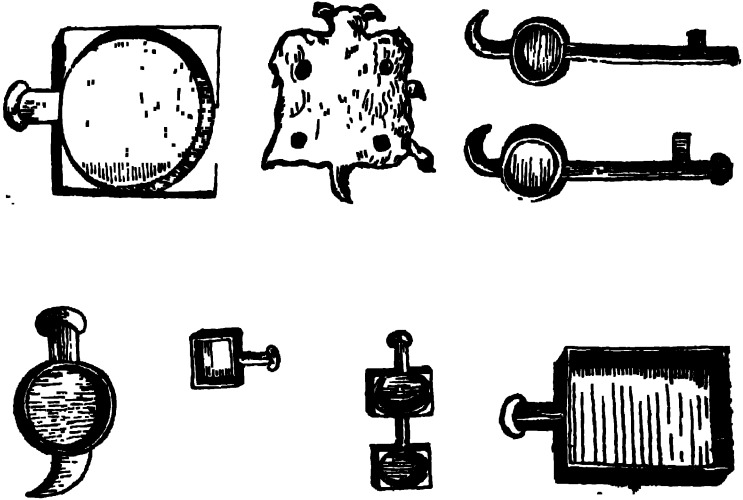
আর্যদেব হোমযজ্ঞাদির জিনিসপত্র

দস্যু ও শত্রু অনার্যরা বাস করিত। সেই অরণ্য ভেদ করিয়া পথ করিতে হইয়াছে, অগ্নি তাহাতে সাহায্য করিয়াছেন। ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা সমুদ্রগামী পোতে চলাচল করিতেন কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে ঋক্‌বেদে শতদাঁড়ী পোতের কথা জানা যায় এবং পোতডুবির কাহিনীও পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয় আর্যরা যে কেবল নৌকায় করিয়া নদীতে চলাফেরা করিতেন তাহা নহে, বড় বড় পোতে করিয়া সমুদ্রেও পাড়ি দিতেন, হয়ত বাণিজ্যের জন্য।

কারিগরদের মধ্যে সূত্রধর, ধাতুশিল্পী, চর্মকার, তন্তুবায় ও মৃৎশিল্পীদের ঘন ঘন উল্লেখ আছে ঋক্‌বেদে। সূত্রধররা কাঠের রথ, গাড়ি, গৃহ, নৌকা, পোত ইত্যাদি নির্মাণ করিতেন, কাঠ-খোদাইয়ের কাজেও খুব দক্ষ ছিলেন। ধাতু-শিল্পীদের মধ্যে কর্মকারেরা তামা ব্রোঞ্জ ও লোহার হাতিয়ার যন্ত্রপাতি তৈরী করিতেন, স্বর্ণকারেরা গহনা গড়িতেন। তন্তুবায়দের মধ্যে মেয়েরাও সুতাকাটা

ও সেলাইয়ের কাজ করিতেন। কুলাল বা কুম্ভকাররা নানারকমের মাটির পাত্র গড়িতেন।

সমাজে পুরুষরা প্রধান ছিলেন, আর্যরা অধিকাংশ প্রার্থনায় পুত্র কামনা করিতেন। তবে কন্যারা যে অবজ্ঞার পাত্রী ছিল তাহা নহে। কন্যা হইলে তাহাকে যত্নেই পালন করা হইত, শিক্ষাও দেওয়া হইত। ঘোষা, অপালা প্রভৃতি আর্যকন্যারা ঋষিতুল্য মর্যাদা পাইয়াছেন, কেহ কেহ বেদের স্তোত্রও রচনা করিয়াছেন। পরিণত যৌবনেই কন্যাদের বিবাহ হইত। একবিবাহ সাধারণত প্রচলিত ছিল, তবে বহুবিবাহে কোন বাধা ছিল না। মেয়েদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ছিল না, কিন্তু বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয়ত তখন চলিত ছিল। ঋক্‌বেদে অন্তত মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথার কোন কথা নাই। মনে হয় না মেয়েরা তখন কেবল অন্তঃপুরে বন্দী হইয়াই জীবন কাটাইতেন। সামাজিক উৎসবে সাজিয়া-গুজিয়া তাঁহারা যে বাহিরের আনন্দে যোগদান করিতেন, বেদে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

পোশাক ও অলংকারের দিকে আর্যদের বেশ দৃষ্টি ছিল দেখা যায়। পোশাকের তিনটি ভাগ ছিল—**নীবি** (অন্তর্বাস), বাস বা **পরিধান,** ও অধিবাস বা **দ্রাপী**। বস্ত্র নানারঙের ছিল—তুলা, হরিণের ছাল ও পশম দিয়া তৈরী হইত। সোনার গহনা ও ফুল সংযোগে অঙ্গসজ্জা করা হইত, বিশেষ করিয়া উৎসবের সময়। পুরুষ ও মেয়েরা মাথায় একটি কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করিতেন এবং উভয়েই মাথার চুল দীর্ঘ রাখিতেন।

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যসমাজে গোষ্ঠীবিভাগ ছিল দেখা যায়। 'বর্ণ' বা রঙ এবং 'সাজাত্য' ভেদে পরিবারগুলিকে ভাগ করা হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণের আর্যরা কৃষ্ণবর্ণের অনার্য দাসদস্যুদের সংস্পর্শ হইতে স্বভাবতঃই নিজেদের দূরে রাখিয়াছিলেন। পুরোহিত ও রাজাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। পুরোহিতরা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত এবং রাজারা ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত হন। বাকি আর্যজনদের 'বিশ' বলা হইত। 'বিশ' হইতে 'বৈশ্য' হইয়াছে।

ঋক্‌বেদের প্রথমদিকের স্তোত্রে সমাজকে এইভাবে চারটি গোষ্ঠীতে বা বর্ণে ও শ্রেণীতে ভাগ করার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু পরে 'পুরুষসূক্তে'র মধ্যে এই বর্ণবিভাগ আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই সূক্তে বলা হইয়াছে যে আদিপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জানু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে

শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। বোঝা যায়, এই সূক্তের দ্বারা আর্যঋষিরা চারটি বর্ণে বিভক্ত সমাজের গড়নকে সংগত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে ঋক্‌বেদের যুগে এই বর্ণভেদ অনেকটা গুণভেদ ও কর্মভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের গতিশীলতা বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। পরবর্তীকালের কঠোর জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের মতো সমাজকে তাহা অচল ও অসাড় করিয়া তোলে নাই।

ঋক্‌বেদোত্তর বৈদিক যুগে এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। রাজ্য বিস্তৃত হয়, রাজারাও ক্রমে বিরাট শক্তিশালী পুরুষ হইয়া ওঠেন। তিনি সকল শ্রেণীর প্রজাদের সর্বময় ভাগ্যবিধাতা হন। সাধারণ বৈশ্যরা তাঁহাকে 'বলি' 'শুল্ক' ও 'ভাগ' দিত এবং তাহাদের উপর তিনি যদৃচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন। শূদ্রদের বহিষ্কার ও নিধন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, এমনকি ব্রাহ্মণদেরও ইচ্ছা করিলে তিনি সামাজিক পদমর্যাদা কাড়িয়া লইয়া পারিতেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার বিধিব্যবস্থার বিকাশ হয় এই সময়। ঋক্‌বেদের যুগে পুরোহিত ছাড়া আর কাহাকেও রাজকার্যে সাহায্য করিতে দেখা যায় না। পরবর্তীকালে একাধিক রাজকর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন **সংগ্রহিত্রি** (কোষাধ্যক্ষ), **ভাগদুঘ** (কর-আদায়কারী), **সূত** (রাজদূত, গায়ক), **অক্ষাবাপ** (জুয়াখেলার পরিদর্শক), **গো-বিকর্তন** (রাজার শিকারসঙ্গী), **পালাগল** (সংবাদদাতা) প্রভৃতি। এই সব রাজকর্মীর কাজের দায়িত্ব দেখিয়া মনে হয় যে রাষ্ট্রশাসন তখন বেশ জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। **'স্থপতি'** ও **'শতপতি'** নামে দুই শ্রেণীর রাজকর্মীর নাম হইতে মনে হয় কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তারও প্রয়োজন হইয়াছিল। স্থপতির কাজ ছিল অনার্য আদিবাসীপ্রধান প্রান্তীয় অঞ্চল শাসন করা, শতপতির কাজ ছিল কয়েকটি গ্রামের (একশত হইতে পারে) শাসনকার্য পরিচালনা করা।

সমাজের প্রধান চারটি শ্রেণীর পরস্পরের সম্পর্কেও বৈদিক যুগের শেষে বেশ গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারটি বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ অনেক দৃঢ় ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বৈশ্যের কোন মর্যাদা নাই, শূদ্র অবহেলার পাত্র, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব এই সময় বেশ মাথা তুলিতে থাকে।

আর্য-অনার্যের মিশ্রণ। হিন্দুসভ্যতার বিকাশ

পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রধান কীর্তি হইল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতার সংগঠন। আর্যদের বসতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার ভৌগোলিক সীমানা পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে উত্তর-গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুরুপঞ্চাল (দিল্লী মিরাট অঞ্চল), কোশল (অযোধ্যা), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর-বিহার) প্রভৃতি রাজ্য গড়িয়া উঠিযাছে।

ঋক্‌বেদের 'দশ রাজার যুদ্ধের কাহিনী'র মধ্যে আর্য-অনার্যের সংঘাত ও মিশ্রণের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর্যরা যখন পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে মধ্যদেশে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন আর্য ও অনার্য অনেক জাতির সম্মিলনে বড় বড় জাতি গড়িয়া উঠিতেছিল। **ভরত** এইরকম একটি বড় জাতি এবং **সুদাস** তাঁহাদের রাজা। সুদাসের সহিত পূর্বে পাঞ্জাব অঞ্চলের আর্যদের দশজন মিত্ররাজার বিরোধ ও যুদ্ধ হয়। লক্ষণীয় হইল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই স্থানীয় অনার্যরা তাহাদের দলপতিদের অধীনে যোগদান করিয়াছিল। এই সংগ্রামে সুদাসের জয় বোধ হয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার পর হইতে বিজয়ী রাজা ও তাঁহার দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা প্রসারলাভ করিতে থাকে, এবং একচ্ছত্র সম্রাটের কল্পনাও বাস্তব রূপ ধারণ করে। রাজা সুদাসের এই জয় হইতে আর্য-অনার্যের রাষ্ট্রিক মিলনও সূচিত হয়, যে-মিলন হইতে '**হিন্দুসভ্যতা**' গড়িয়া ওঠে।

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত

আর্যসভ্যতার প্রসার এবং আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে হিন্দুসভ্যতার পত্তন ও প্রতিষ্ঠার চিত্র ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে যেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমন আর কোথাও ফোটে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন: "রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র। ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ইহার সরল অনুষ্টুপ্-ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।"

রামায়ণের কাহিনী হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আর্যসভ্যতার কেন্দ্র তখন গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; বাহিরে তাহার বিশেষ বিস্তার হয় নাই। রামায়ণের কাহিনী মূলত দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী, কারণ ইহাতে সর্বভারতে আর্যদের প্রসারের আভাস পাওয়া যায়। রাম তাঁহার রাজ্যসীমার বাহিরে গেলেই কেবল অরণ্য এবং সেই অরণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আর্য-তপোবন দেখিতে পান। কিষ্কিন্ধ্যায় (বর্তমান বেলারী অঞ্চল) পৌছিবার আগে কোন সুশৃঙ্খল সমাজবদ্ধ জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। গঙ্গার দক্ষিণ হইতে বিন্ধ্যপর্বত পার হইয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত কেবল বড় বড় অরণ্য দেখা যায়। এই চিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, মধ্যদেশ হইতে পূর্ব-ভারতে ও দক্ষিণভারতে আর্যসভ্যতার প্রসারের স্মৃতি 'রামায়ণ' বহন করিতেছে।

মহাভারতের চিত্র একেবারে অন্যরকম। দক্ষিণভারত, পূর্বভারত ও পশ্চিম-ভারতের বড় বড় রাজা ও রাজ্যের কথা মহাভারতে আছে, এবং তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের কেন্দ্রস্থ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ কাথিয়াওয়াড় উপকূলে দ্বারকার অধিবাসী। ভারতের সকল তীর্থস্থান, নদনদী, পাহাড়-পর্বত মহাভারতে সুপরিচিত, কিন্তু রামায়ণে নহে। রামায়ণ যে আর্য-সভ্যতার আদিপর্বের এবং মহাভারত যে আর্য-অনার্যের মিশ্রণে গঠিত পরবর্তী হিন্দুসভ্যতার পর্বের কাহিনী ও চিত্র অবলম্বনে রচিত তাহা এই ভৌগোলিক উপাদান হইতে বোঝা যায়।

QUESTIONS

1. Give a brief account of the social and economic life of Vedic Aryans.

2. Show how far the Ramayana and Mahabharata stories indicate the extent of Aryanisation in India.

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম –

বেদের ধর্ম ক্রমে জীবনবিচ্ছিন্ন হইয়া জটিল রূপ ধারণ করিতেছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বোধবুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা, অথবা তাহা আচরণ ও পালন করা সম্ভব হইতেছিল না। বেদের আচারবহুল, বলিবহুল জটিল ধর্মের প্রতি কেবল সাধারণ লোকচিত্তে নহে, জিজ্ঞাসু ও চিন্তাশীল মনেও ক্রমে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। ইহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষত 'উপনিষদে' প্রচুর পাওয়া যায়। বেদের বিরুদ্ধে বেশ বড় রকমের একটি ধর্মান্দোলন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল দেখা যায়, এবং অনেকেই তাহাতে যোগ দিতেছিলেন। ইঁহাদের 'লোকায়ত', 'নাস্তিক' ও 'চার্বাক' বলা হইত। বেদবিরোধী ধর্মমতের প্রচলন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, উপনিষদের কাল হইতেই ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের জন্য।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া ইহাকে 'বৌদ্ধধর্ম' বলা হয়। গৌতমের জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ আছে, তবে অধুনা-গৃহীত মত হইল ৫৬৭-৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে কপিলবস্তুর অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে শাক্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শুদ্ধোধন, মাতার নাম মহামায়া। বৌদ্ধগ্রন্থে (সুত্তনিপাত) কথিত আছে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর গৌতম একদিন বিম্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষা করিতে যান। তখন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার জাতি কি, জন্ম কোথায়?" উত্তরে গৌতম বলেন "হিমালয়ের ঠিক পাশে কোশলবাসী ধনবীর্যসম্পন্ন এক

CHAPTER V—Religious movements—Buddhism and Jainism—Buddhism outside India.

জাতি আছে। তাহাদের গোত্র 'আদিত্য', কুল 'শাক্য'। আমি সেই কুল হইতে উৎপন্ন।" এখানে দেখা যায় শাক্যরা কোশল-রাজার অধীন ছিলেন এবং শুদ্ধোধন তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতেন। কোশলের (অযোধ্যা) নায়কত্ব নামমাত্র ছিল মনে হয়।

জাতকের নিদান-কথায় লিখিত আছে যে, গৌতম জন্মগ্রহণ করিবার পর পঞ্চম দিনে তাঁহার নামকরণ হয়। সেই উপলক্ষে আটজন ভবিষ্যৎদর্শী ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে সাতজন বলেন, 'এই সন্তান হয় রাজচক্রবর্তী হবে, না হয় নূতন ধর্ম প্রবর্তন করবে।' অষ্টম ব্রাহ্মণ বলেন, "এ সন্তান বুদ্ধত্ব লাভ করবে, গৃহী হবে না।" তখন শুদ্ধোধন জিজ্ঞাসা করেন, "আমার সন্তান কি দেখে গৃহত্যাগী হবে?" ব্রাহ্মণ বলেন জরাজীর্ণ, ব্যাধিত, মৃত ও প্রব্রজিত—এই চার রকমের মানুষ দেখে।" ইহা শুনিয়া শুদ্ধোধন এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে তাঁহার সন্তান কোনদিন এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখিতে না পায়। কিন্তু যৌবন বয়সে রথে চড়িয়া একদিন উদ্যানভূমিতে যাইবার সময় এই চারটি দৃশ্যই গৌতম দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স ঊনত্রিশ, পূর্ণযৌবন। রাজকীয় ভোগবিলাসিতার লোভ ছাড়িয়া, সংসারের মোহ কাটাইয়া, বিবাহিত হইয়াও তিনি গৃহত্যাগী হন। মানুষকে এই দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত করা যায় কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মনপ্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। তিনি প্রথমে রাজগৃহে, পরে উরুবেলায় যাইয়া পাঁচজন তপস্বীর সহিত মিলিত হইয়া তপস্যা করিতে থাকেন। ছয় বছর তপস্যার পর তিনি অনুভব করেন যে কেবল কঠোর তপস্যার দ্বারা সত্যলাভ করা যায় না। তারপর অনেকটা সাধারণভাবে জীবন যাপন করিয়া নিরন্তর ধ্যানমগ্ন হইয়া তিনি পরম-জ্ঞান লাভ করেন। প্রায় ৪৫ বছরের বেশীকাল নানাস্থানে পর্যটন ও প্রচার করিয়া ৮০ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। কথিত আছে, দেহরক্ষার সময় তিনি ধ্যানস্থ হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থার ভিতর দিয়া শেষে নির্বাণলাভ করেন। ইহাকেই মহা-পরিনির্বাণ বলে।

বৌদ্ধধর্মের সারকথা

সকল ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেও কতকগুলি সত্য স্বীকৃত এবং কতকগুলি অস্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধদের ধর্মে ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, জগতের স্রষ্টা ও

কর্তা কোন অদ্বিতীয় পুরুষ কেহ আছেন বলিয়া বৌদ্ধরা স্বীকার করেন না। বেদ, বেদের ধর্মাচার, যাগযজ্ঞ, পশুবলি অথবা উপনিষদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বৌদ্ধধর্মে অস্বীকৃত। তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম কি স্বীকার করে?

॥ জীবের জীবন দুঃখময় ॥

॥ দুঃখের কারণ আছে ॥

॥ দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব ॥

॥ নিবৃত্তির একটা পন্থা আছে ॥

এই চারটি সত্যকে বৌদ্ধরা স্বীকার করেন এবং 'আর্যসত্য' বলেন। বৌদ্ধরা বলেন দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় জ্ঞান নয়, বেদের জ্ঞান তো নয়ই। উপায় হইল কঠোর নৈতিক জীবন, কঠোর চরিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রজ্ঞা, সমাধি ও শীল অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও চরিত্র, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সারকথা। বৈদিক ধর্ম যে পরিমাণে যজ্ঞাদি কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানকে বড় মনে করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম (এবং জৈনধর্মও) সেই পরিমাণে আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া নৈতিক চরিত্রকে বড় মনে করিয়াছে। বেদ-বিরুদ্ধ ধর্মান্দোলনের শ্রেষ্ঠ সুফল এই কঠোর চারিত্রনীতির আদর্শে প্রকাশ পাইয়াছে।

অহিংসা, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী বৌদ্ধধর্মের প্রধান আদর্শ হইলেও উহা সাধনা করিবার পদ্ধতি ঠিক হিন্দুধর্মের মতো নহে: অসংযত ভোগবিলাস অথবা অতি-সংযত কঠোর তপস্যা—এই দুই রকম আতিশয্যের কোনটাই বুদ্ধ সংগত বলিয়া মনে করিতেন না: এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথই তাঁহার মতে ধর্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। ইহাকেই বৌদ্ধধর্মের 'মধ্যপন্থা' বলা হয়। বৌদ্ধরা যে চরিত্রের উপর জোর দিয়াছেন সেই 'চরিত্র' কথার অর্থ হইল যাহাতে করিয়া চলা যায়। 'শীল' হইল চলিবার সম্বল বা নীতি অর্থাৎ চরিত্র-গঠনের নীতি। যেমন (১) প্রাণীহত্যা করিবে না (২) যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই তাহা লইবে না, (৩) মিথ্যাকথা বা কটুকথা বলিবে না—এইগুলি এক-একটি 'শীল'। শীলগুলি হইতেছে মঙ্গললাভের উপায়। মঙ্গললাভ করিতে হইলে মৈত্রীচিন্তা প্রয়োজন। তাহা কি? সকল প্রাণী সুখী হোক, সকলে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাক—ইহাই মৈত্রীচিন্তা।

বৌদ্ধরা কোন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী মানিতেন না। ধনী নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সমাজে সকল মানুষই বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। গৌতমের শিষ্যদের

মধ্যে রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক, কারিগর, এমন কি পতিতাও ছিলেন। পুরুষ ও নারীর কোন মর্যাদাভেদ বৌদ্ধরা স্বীকার করিতেন না, ধর্মের অধিকার উভয়েরই সমান বলিয়া মানিতেন। শিষ্য আনন্দ একবার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সংসার ত্যাগ করিয়া সংঘের কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করিয়া কোন নারীর পক্ষে কি এই ধর্মসাধনা সম্ভব?" উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় সম্ভব।'

ধর্ম-সংগঠন। সন্ন্যাস ও সংঘ

॥ ধ র্ম - সং গ ঠ ন। স ন্ন্যা স ও সং ঘ॥ ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ অনেক বড় বলিয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাস জীবনের স্থান বৌদ্ধধর্মে অনেক উঁচুতে। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ-সন্ন্যাসী তাঁহাদের ভিক্ষু এবং যাঁহারা নারী-সন্ন্যাসী তাঁহাদের ভিক্ষুণী বলা হয়। এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সংঘগঠন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জৈনরা এ-ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু বৌদ্ধরা হইয়াছিলেন। স ন্ন্যা স হিন্দুদের বর্ণাশ্রমধর্মেও বিহিত আছে, কিন্তু উহা জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্বে। হিন্দুদের বিধান হইল প্রথমে ব্রহ্মচারী, পরে গৃহী, তারপর বানপ্রস্থ, শেষে সন্ন্যাসী। হিন্দুর সন্ন্যাস-বিধানে সংঘ গড়িবার কোন নির্দেশ নাই, উহা বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের দান। পরে শংকর হইতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যে সন্ন্যাস ও সংঘ গঠনের বিস্তার হইয়াছে তাহা হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সর্দার পানিক্কর বলিয়াছেন: "The Buddhist Sanghas were essentially democratic; as the monks were ordained from among all classes of people. More, the movement itself was democratic and the lay community consisted of recruits from all classes." বৌদ্ধ সংঘগুলি গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যে-কেহ সংঘে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কেবল তাহাই নহে, সংঘ গড়িবার এই পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তারের জন্য। এইদিকে হইতে বৌদ্ধসংঘের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই সংঘের শক্তিশালী সংগঠনের ভিতর দিয়াই বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের শাখা ও তাহার বিস্তার

বৌদ্ধ আচার্যেরা তাঁহাদের ধর্মমতকে পরে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, একটি **হীনযান** আর একটি **মহাযান**। বুদ্ধের নির্বাণের চার-পাঁচশত বছর পরে তাঁহার ধর্মমত খ্যাতনামা আচার্যদের হাতে সমৃদ্ধ হইয়া যখন নূতনরূপ ধারণ করিল তখন তাহাকে নূতন আখ্যা দেওয়াই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। প্রাচীনপন্থীরা নিশ্চেষ্টভাবে বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি পুরাতন আচার আঁকড়াইয়া রহিলেন, তাই নূতন মত 'মহাযান' এবং প্রাচীন মত 'হীনযান' আখ্যা পাইল।

বুদ্ধমূর্তির পরিবর্তন—মুখ ও উষ্ণীষ লক্ষণীয় (বাম হইতে দক্ষিণে)
উপরে—মথুরার মূর্তি, নীচে—গান্ধার, সারনাথ ও দক্ষিণভারত

বৌদ্ধধর্ম আজ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই ধর্মের আদর্শই আজ ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনার প্রতিমূর্তি অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী, গৃহীর ও সন্ন্যাসীর জীবনের বাস্তব সামঞ্জস্য ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের কঠোর চারিত্র-নীতি, শীল, মৈত্রীচিন্তা ও সংঘের আদর্শকে পরাজিত

করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বৌদ্ধধর্ম একটি মহত্তর কাজ করিয়াছে, যাহা ভারতের ইতিহাসে চিরগৌরবে উজ্জ্বল। ভারতীয় সভ্যতাকে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এসিয়ায় তো বটেই, সারা পৃথিবীতেও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারত হইতে সাইবেরিয়া, পারস্য হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত দেশের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রাণিত করিয়াছে, অনেকটা রূপায়িতও করিয়াছে। মধ্য-এসিয়া, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান; দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে এবং এখনও জীবন্ত রহিয়াছে।

মহাবীর ও জৈনধর্ম

ইতিহাসে জৈনধর্মের স্থান আগে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশী বলিয়া আমরা তাহার কথা আগে আলোচনা করিয়াছি। জৈনধর্মের অন্যতম প্রবর্তক মহাবীর বয়সে গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা কিছু বড ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চমশতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত তিনি ধর্মপ্রচার করেন। উত্তরবিহারে বৈশালী নগরে ক্ষত্রিয়বংশে মহাবীরের জন্ম। জৈনদের বিশ্বাস, মহাবীরের পূর্বে ২৩ জন তীর্থংকর জৈনধর্ম প্রচার করেন এবং মহাবীর ২৪-তম তীর্থংকর। মহাবীরের পূর্বে পার্শ্বনাথ। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে কাশী নগরে ক্ষত্রিয় রাজবংশে পার্শ্বনাথের জন্ম হয়।

জৈনধর্ম ও জৈনদর্শন এখনও ভারতে বর্তমান আছে, তবে বৌদ্ধধর্মের মতো বাহিরে তাহার বিস্তার হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্ম যে প্রধানত অভারতীয় হইয়া যায় নাই তাহার কারণ বেদবিশ্বাসী হিন্দুধর্মের প্রতি উভয়ের ব্যবহারে পার্থক্য ছিল। হিন্দুমতে যদিও জৈন ও বৌদ্ধ উভয়েই নাস্তিক, তাহা হইলেও হিন্দুধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম সমান তীব্র ও ব্যাপক হয় নাই। হিন্দুদের উপর জৈনরা প্রত্যক্ষ আক্রমণ কম করিয়াছেন। হিন্দুদের বর্ণাশ্রম, হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দুর আচারনিয়ম তাঁহারা অনেকটা মানিয়াছেন, রক্ষাও করিয়াছেন। ফলে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের বসবাসে কোন বাধা হয় নাই।

জৈনদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছেন—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। এক সম্প্রদায়ের জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরেন, তাঁহাদের বলে শ্বেতাম্বর। অন্য

সম্প্রদায়ের জৈনরা নগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বলে দিগম্বর। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল দর্শনতত্ত্বের বিশেষ কোন ভেদ নাই, তবে আচারগত অনেক বৈষম্য আছে।

QUESTIONS

1. Give a short account of the rise of Buddhism and Jainism in India.

2. Briefly describe the main teachings of Gautama Buddha.

3. Briefly describe the main teachings of Mahavira.

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্য

বৈদিক যুগের শেষে আমরা দেখিযাছি আর্যদের একাধিক কৌম (clan) মিলিয়া বড বড জাতি (tribe), এবং ছোট ছোট রাজ্য মিলিয়া বড বড রাজ্য গডিয়া উঠিতেছিল। রাজ্য 'সাম্রাজ্য' হইতেছিল, রাজাও 'সম্রাট' হইতেছিলেন। পাঞ্জাব ও উত্তর-গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে আর্য বা হিন্দুসভ্যতার বিস্তার হইতেছিল পূব ও দক্ষিণভারতে। তবে ইহা একচ্ছত্র বিস্তার ছিল না, পাশাপাশি ভারতজনেব আবও অনেক শক্তিশালী রাজ্য ছিল—অনার্যদের, ব্রাত্যদের ও বিচ্ছিন্ন আর্যদেব রাজ্য। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্রমে মধ্যদেশ বা মধ্যভারত অপেক্ষা পূর্বভাবতেব গুরুত্ব বাডিতেছিল। ইতিহাসের ভারকেন্দ্র উত্তরভারত হইতে ক্রমে পূর্বভারতে স্থানান্তরিত হইতেছিল।

ষোলটি মহাজনপদ

বৈদিক সাহিত্যে ভারতজনের মধ্যে উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, ভোজ, পশ্চিম-ভারতের 'নীচ্য' ও 'আপাচ্য' এবং পূর্বভারতের 'প্রাচ্য'দের কথা জানা যায়। নীচ্য ও আপাচ্যরা পশ্চিমভারতের কোন জনগোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্যরা মগধ ও তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির অধিবাসী। মগধের বাহিরে উত্তরবঙ্গে 'পুণ্ড্র'-জনেরা এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে 'বঙ্গ'-জনেরা বাস করিত, তাহারা ঠিক আর্যগণ্ডীর মধ্যে ছিল না। দক্ষিণে ভোজরা ছাড়া গোদাবরী উপত্যকায় 'অন্ধ্র'-

---

CHAPTER VI—Sixteen Mahajanapadas—Growth of Magadha—Persian invasion—Alexander's invasion - Chandragupta—Bindusara—Asoka his Dharma, his achievements.

Mauryan administration—Megasthenes—Kautilya. Art during Mauryan period.

জনেরা ছিল এবং বিন্ধ্য অরণ্যেও আদিবাসিদের বাস ছিল যথেষ্ট। পরবর্তীকালে আরও নূতন জনপদের নাম পাওয়া যায়—যেমন 'কলিঙ্গ'-জনেরা বৈতরণী হইতে গোদাবরীর কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া পূর্ব-উপকূলে বাস করিত, উত্তর-গোদাবরীতে বাস করিত 'অশ্মক' ও 'মূলক'-জনেরা। কাবুল উপত্যকা হইতে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত এইরকম প্রায় ষোলটি জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের ঠিক আগে। বৌদ্ধসাহিত্যে তাহাদের এই নাম দেওয়া হইয়াছে—

১। অঙ্গ (পূর্ব-বিহার)
২। মগধ (দক্ষিণ-বিহার)
৩। কাশী (বারাণসী)
৪। কোশল (অযোধ্যা)
৫। বৃজ্জি (উত্তর-বিহার)
৬। মল্ল (গোরক্ষপুর জেলা)
৭। চেদি (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল)
৮। বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল)
৯। কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী ও মীরাট)
১০। পঞ্চাল (বেরিলি, বুদাউন, ফরাক্কাবাদ)
১১। মৎস্য (জয়পুর)
১২। শূরসেন (মথুরা)
১৩। অশ্মক (গোদাবরী-তীরে)
১৪। অবন্তী (মালবতে)
১৫। গান্ধার (পেশওয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি)
১৬। কম্বোজ (দক্ষিণপশ্চিম কাশ্মীর ও কাফিরস্তানের অংশ)

লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল ভারতজনের এই ১৬টি মহাজনপদের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের কোন জনপদের নাম নাই।

মগধের অভ্যুদয়

দক্ষিণ-বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে প্রাচীনকালে মগধ বলিত। বেদ ও মহাকাব্যের যুগ হইতেই এই অঞ্চলে বেশ ক্ষমতাশালী জনগোষ্ঠীপতিদের কথা

শোনা যায়। আর্য বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা এখানে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আমাদের প্রাচীন পুরাণগুলিতে দেখা যায়, শৈশুনাগবংশের রাজারা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বংশের আদিরাজা ছিলেন শিশুনাগ, সেইজন্য এই রাজবংশকে 'শৈশুনাগবংশ' বলা হয়। বৌদ্ধরা বলেন এই রাজবংশ দুইটি শাখায় বিভক্ত—হর্ষঙ্ক ও শৈশুনাগ। এখানে আমরা 'শৈশুনাগ' বলিয়াই পরিচয় দিব।

॥ **বিম্বিসার** ॥ এই বংশের প্রথম রাজা যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন তাঁহার নাম 'শ্রেণিক' বা বিম্বিসার। পনের বছর বয়সে তিনি রাজা হন, বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৬০ বছর আগে। বুদ্ধের পরিনির্বাণ ৪৮৬ বা ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া বর্তমানে গৃহীত। এই হিসাবে বিম্বিসারের অভিষেকের সময় ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি হয়। বিম্বিসারের অদম্য রাজ্যলিপ্সা ছিল এবং ছলে-বলে কৌশলে রাজ্যবিস্তার করিতে তিনি আদৌ বিচলিত হন নাই। শোনা যায়, তাঁহার গজবাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি প্রতিবেশী রাজাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রথমে তিনি অঙ্গরাজ্য বা পূর্ব-বিহার দখল করেন। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা, বর্তমান ভাগলপুরের কাছে। কোশল ও বৈশালীর রাজবংশে বিবাহ করিয়া তিনি নিজের রাজ্যবিস্তারের সুযোগ পান। উত্তরে নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার রাজধানী গিরিব্রজের উত্তরে 'রাজগৃহ' (বর্তমান রাজগীর) নামে তিনি নূতন একটি নগর পত্তন করেন। বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুইজনেই বিম্বিসারের রাজত্বকালে ধর্মপ্রচার করেন।

পারস্যের অভিযান

মগধের অভ্যুত্থানের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে পারস্য ও গ্রীসের রাজাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা এই অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য অভিযান করিতে থাকেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বিশাল আকিমেনীয়া বা পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাস (৫৫৮-৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) তাঁহার সৈন্যদের পাঠাইয়া ভারতসীমান্তে আঘাত করিতেছিলেন এবং কাবুলের উত্তরপূর্বে প্রসিদ্ধ নগর কপিশা ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম ভূভাগ পারস্যের করতলগত হয় এবং কাইরাসের বংশধর ডেরিয়াস (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ)

দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। তিনি স্কাইল্যাক্স নামে একজন নাবিকের অধীনে সিন্ধুনদ দিয়া নৌবহর পাঠান। এই নৌ-অভিযানের ফলে রাজপুতানার মরুপ্রান্ত পর্যন্ত সিন্ধু-উপত্যকা পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পারস্য-সাম্রাজ্য এই সময় বিভিন্ন 'ক্ষত্রপ' বা ক্ষত্রপাবনের অধীনে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ভারতীয় ভূভাগ ছিল বিংশ ক্ষত্রপাধীন প্রদেশ এবং ইহার জনসংখ্যা ও রাজস্ব পারস্যের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ডেরিয়াস-নন্দন জারাক্সিস কিছুদিন তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্যের উপর অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বংশধরেরা ইহার ভার সামলাইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে পারস্যের ভারত-সাম্রাজ্যের দ্রুত ভাঙ্গন ধরিতে থাকে এবং ছোট ছোট ক্ষুদ্র রাজ্যে তাহা ভাগ হইয়া যায়। এই সব ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা কোন কেন্দ্রীয় শাসন না মানিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে ভারত-সীমান্তের রাজনৈতিক ঐক্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাহা বিদেশীদের অভিযানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান – ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ

গ্রীসদেশে মেসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মেসিডনের রাজা হন আলেকজাণ্ডার। শৌর্যবীর্যে তাঁহার সমকক্ষ রাজা দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে তখন আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রাচ্যের লোভনীয় স্বর্ণভূমির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ৩৩৩ ও ৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যে অভিযান করিয়া তিনি ডেরিয়াস-জারাক্সিসের বংশধরকে পরাজিত করেন এবং পরবর্তী বছরে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার সুবিস্তৃত পারস্য-সাম্রাজ্যের সর্বময় অধীশ্বর হন। আরও তিন বছর পরে ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া পারস্যের ভারত-সাম্রাজ্য দখল করিতে অগ্রসর হন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের বা গ্রীক যোদ্ধাদের কিছুই জ্ঞান ছিল না। ভারতের পুণ্যভূমিতে আগে আর কোনদিন কোন ইউরোপীয় আক্রমণকারী বা পর্যটক পদার্পণ করে নাই। সুতরাং কোনখান হইতে ভারত সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিদের প্রচণ্ড শিক্ষা দিয়া তিনি সিন্ধুনদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তখন সিন্ধুনদকেই

আলেকজ . গুারের
ভারত অভিযানের পথ
খাওয়াক গিরিপথ
কাবুল
কাবুল নদী
জালালাবাদ
কুনার নং
সোয়াত নং
সিন্ধু নং
মালাকান্দ গিরিপথ
খাইবার গিরিপথ
পেশোয়ার
ওহিন্দ
আটক
তক্ষশিলা
কুরাম নং
সোহান নং
যুদ্ধক্ষেত্র
ঝিলাম
জম্মু
বিতস্তা নং
সমুদ্রের দিকে
শিয়ালকোট
চন্দ্রভাগা নং
ইরাবতী নং
বিপাশা নং
সিন্ধু নং
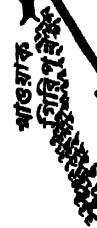
পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা বলিত। নৌকা দিয়া সেতু গড়িয়া ওহিন্দ হইতে তিনি সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলার দিকে যাত্রা করেন। তক্ষশিলার রাজা আম্ভি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজধানীতে ডাকিয়া আনেন এবং প্রায় ৩,০০০ মোটা মোটা ষাঁড, ১০,০০০ হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া উপহার দেন। কেবল গবাদি খাদ্য নহে, শোনা যায় আম্ভি প্রায় ৫,০০০ সৈন্য দিয়া আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা হইতে আলেকজাণ্ডার আরও পূর্বদিকে ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৌরবদের দেশে অভিযান করেন। বৈদিকযুগেই এই পুরুদের কীর্তিকথা আমরা শুনিয়াছি। স্বদেশের গৌরববোধ স্বভাবতঃই তাহাদের গভীর হইবার কথা। তাহাদের রাজার নাম পুরু গ্রীকদের 'পোরস'। পুরু প্রস্তুত হইয়া ছিলেন গ্রীকবীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নহে, সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য। বিদেশীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বা তাহাদের বশ্যতা মানিয়া লইতে পৌরবরাজের পৌরুষে বাধিয়াছিল।

পুরু অবশ্য গ্রীকদের আগে আক্রমণ চালাইবার সুযোগ দিয়া ভুল করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকদের রণদক্ষতা ও বীরত্ব দেখিয়া গ্রীকরা বিস্মিত হইয়াছিলেন। এশিয়ার আর কোন জাতি ভারতের এই অঞ্চলবাসীর মতো রণকুশলী নহে, একথা গ্রীকরা স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়রাজা পুরুর বীরত্ব গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে গ্রীক সৈন্যরা স্থলপথে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত লড়াই করিতে করিতে ফিরিতে থাকে। আলেকজাণ্ডার নিজে একদল সৈন্য লইয়া, বেলুচি-স্তানের ভিতর দিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বাবিলনে পৌছান। সেখানে অল্পদিনের মধ্যে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

বৈদেশিক প্রভাব

অল্পকালের মধ্যে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল হইতে বৈদেশিক অভিযান ও অধীনতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু যাহা বিলুপ্ত করা সম্ভব, অর্থাৎ রাজনৈতিক চিহ্ন, তাহাই তিনি বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। ভারত-সংস্কৃতিতে পারস্য ও মেসিডনের সংঘাত-সংস্পর্শের যে গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা লোপ করা সম্ভব হয় নাই। পারস্যের অধীনে ভারতীয় সৈন্যরা

পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউরোপের মাটিতে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। তাহাদের সান্নিধ্যে আসিয়াই ভারত সম্বন্ধে গ্রীকদের কৌতূহল বাড়িয়াছিল। নূতন খরোষ্ঠীলিপির প্রবর্তন পারসী প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভারতে স্থাপত্যশিল্পে, বিশেষ করিয়া স্তম্ভ (column) ইত্যাদি গঠনে, পারস্যের প্রভাব বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করিয়া থাকেন। পাটলিপুত্রে মৌর্য রাজপ্রাসাদের স্তম্ভের আকার ও গড়ন, অশোকস্তম্ভ ইত্যাদিতে পারসী রীতির প্রভাব যে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৌর্যবংশ

মগধে মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পরে ঐতিহাসিকরা অন্ধকার হইতে আলোর রাজ্যে আসিলেন। এতদিন তাঁহারা কিনারাহীন কালসমুদ্রে একটা কোন দ্বীপের সন্ধান করিতেছিলেন, যেখান হইতে ইতিহাসের দিক ও কালক্রম নির্ণয় করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেরকম কোন দ্বীপের সন্ধান পান নাই। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কালক্রম হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং ভারতের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিও যেন একটা সংহত রূপ ধারণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। রাজাকেও প্রথম চিনিতে পারা গেল প্রকৃত রাজা বলিয়া, এখন আর তিনি নামে মাত্র রাজা নহেন, দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় কর্তা, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিরাট সম্রাট। ভারতে প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় হইল, ভারত-সম্রাট তাঁহার পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতজনের কাছে আত্মপ্রকাশ করিলেন। ভারতের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা দূর হইয়া গেল, বাহির বিশ্বের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। মনে হয় মৌর্যযুগে ভারত যেন তাহার সভ্যতার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত - 320 B.C

পিপ্পলিবনের (নেপালী তরাই ও গোরক্ষপুর জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল) "মোরীয়" জাতির সন্তান চন্দ্রগুপ্ত। "মোরীয়" হইতে "মৌর্য" হইয়াছে। বাল্যকালে চন্দ্রগুপ্ত শিকারী, গো-পালক ও ময়ূর-পালকদের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, কৈশোরে পাঞ্জাবে গিয়া তিনি আলেকজাণ্ডারের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, কিন্তু রূঢ় কথায় তাঁহাকে অপমানিত করার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তারপর কোনরকমে সেখান হইতে আত্মগোপন

করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। পলাতক অবস্থায় তাঁহার সহিত তক্ষশিলার ক্ষুরধারবুদ্ধি এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, এই ব্রাহ্মণ "বিষ্ণুগুপ্ত", ইতিহাসে "চাণক্য" ও "কৌটিল্য" নামে খ্যাত। বিন্ধ্যারণ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে গুপ্ত রত্নভাণ্ডার পাইয়া চাণক্য গোপনে শক্তিশালী একটি সেনাদল গঠন করেন। শেষে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতির সহিত যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব দেখান। ইহা গল্প, কিন্তু এইরকম গল্প ও কিংবদন্তীর মধ্যে ইতিহাসের সত্য কিছুটা গোপন থাকে।

মৌর্যসাম্রাজ্যের সীমা

চন্দ্রগুপ্ত মালব ও কাথিয়াওয়াড় তাঁহার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। অবন্তি বা মালবের পশ্চিমে তিনি সুরাষ্ট্র পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন এবং সেখানে একজন বৈশ্য "রাষ্ট্রীয়" বা অফিসার নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পুষ্যগুপ্ত। তামিলদেশে কথিত আছে যে মৌর্য হঠাৎ-বাজারা দক্ষিণভারতে তিনেভেল্লি জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তবে ইহা প্রথম মৌর্যরাজা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, পরবর্তী মৌর্যদের পক্ষে হইতে পারে। কারণ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে দেখা যায় তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পাণ্ড্য বা তিনেভেল্লি অঞ্চল প্রান্তীয় রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের সুযোগ হয়। এই সুযোগ আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা করিয়া দেন।

সেলুকাস ও অ্যান্টিগোনাস

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার নিজের কোন বংশধর না থাকায়, সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে নূতন প্রাচ্যসাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতে থাকেন। এসিয়াভুক্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লইয়া অ্যান্টিগোনাস ও সেলুকাসের মধ্য বিবাদ হয়। বিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়, শেষে সেলুকাস্ জয়ী হইয়া পশ্চিম-এসিয়ার অধীশ্বর হন। পরে তিনি ভারতীয় প্রদেশগুলিকেও পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং নদী পার হইয়া পূর্বদিকে অভিযানের সংকল্প করেন। এই যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সেনাদলের কাছে সেলুকাসের পরাজয় হয় এবং কঠোর শর্তে মৌর্য-সম্রাটের সহিত সন্ধি

করিতে তিনি বাধ্য হন। কেহ কেহ বলেন, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সেলুকাস কাবুল হীরাট কান্দাহার ও বেলুচিস্তান চন্দ্রগুপ্তকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবর্তে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে ৫০০ হাতী দিয়াছিলেন। কথিত আছে সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত দুই রাজবংশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিয়াছিলেন। চুক্তি ও মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ সেলুকাস পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় একজন রাষ্ট্রদূতও পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম **মেগাস্থেনিস**। রাজসভার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মেগাস্থিনিস এদেশ সম্বন্ধে নানাবিধ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া **ইন্ডিকা** নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র

রোমান ঐতিহাসিক জাষ্টিন লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত রাজসিংহাসনে বসিবার পর প্রজাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উপরে নির্বিচারে অত্যাচার করিতে কুন্ঠিত হন নাই। জাষ্টিনের এই অভিযোগ অতিরঞ্জিত বা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, উদারহৃদয় ও আত্মভোলা সম্রাট হয়ত মানুষ হিসাবে আদর্শ হইতে পারেন, কিন্তু কালভেদে দেশের ও দশের দিক হইতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। খণ্ড ছিন্ন ভারতজনকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত একরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় রাজদণ্ডের অধীনে আনার যখন প্রয়োজন ছিল, তখন সেই রাজদণ্ড দুর্বলের কম্পমান হাতে থাকিলে তাহাতে ভারতের ইতিহাস এক-পাও অগ্রসর হইত কিনা সন্দেহ। সুতরাং মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যদি দৃঢ়হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন, যদি বিচ্ছিন্ন ভারতজনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও সচেতন করিতে তাঁহাকে নির্মমভাবে সেই দণ্ড চালনা করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালের বিচারে ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে তিনি যে একজন আদর্শ সম্রাটের রাজকর্তব্য পালন করিয়াছেন একথা স্বীকার করিতে হইবে।

জৈনরা বলেন চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মপন্থী ছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি নিজে জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়াছিলেন। মগধে নন্দবংশের ও মৌর্যদের রাজত্বকালে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল সন্দেহ নাই। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জৈন প্রচারক ভদ্রবাহু উত্তরভারতীয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী

করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাহা বারো বছর স্থায়ী হইবে। এই কারণে তিনি প্রায় ১২,০০০ জৈন সঙ্গে করিয়া দক্ষিণভারত যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নাকি মনের দুঃখে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভদ্রবাহুর অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহীশূরে শ্রবণবেলগোলায় অবস্থান করেন এবং ভদ্রবাহুর সেখানে মৃত্যু হয়। তারপর আরও বারো বছর চন্দ্রগুপ্ত বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনশনে তিলে তিলে তিনি আত্মশুদ্ধি করিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন, ৩০০ বা ৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বছব এবং তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৫ হইতে ২৭ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতবাং বিন্দুসারের রাজত্বকাল মোটামুটি ৩০০ হইতে ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধরা যাইতে পারে। বিন্দুসার তাঁহার পিতার সাম্রাজ্য রক্ষা তো করিয়াছিলেনই, মনে হয় তাহার সীমানা উত্তরে ও দক্ষিণে কিছু প্রসারিতও করিয়াছিলেন। অশোক যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার পিতামহের নহে, পিতা বিন্দুসারেরও কীর্তি। অশোক নিজে কলিঙ্গ ছাড়া বিশেষ কোন রাজ্য দখল করেন নাই, কাজেই পিতামহ ও পিতা উভয়েরই অর্জিত বিরাট সাম্রাজ্যের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বিন্দুসারও যে চন্দ্রগুপ্তের মতো কীর্তিমান রাজা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত, বিশেষ করিয়া পশ্চিমের গ্রীক সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সদ্‌ভাব ছিল। মেগাস্থেনিসের পর ডিমাকস নামে গ্রীক রাজদূত তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন এবং সিরিয়ার রাজা সেলুকাসের পুত্র অ্যান্টিয়োকাস তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

সম্রাট অশোক

সম্রাট অশোককে বলা হয় 'দেবানং পিয় পিয়দসি,' অর্থাৎ 'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী।' ইহা কাহারও নাম নহে, গুণ মাত্র। সম্রাট অশোকের এই গুণের ভাগটুকু অনেক আগেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, জেমস প্রিন্সেপ গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দেবতাদের প্রিয় ও প্রিয়দর্শী রাজা কে তাঁহার নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই।

অশোকলিপির প্রাপ্তিস্থান
সাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী
মান্‌সেহ্‌রা
সিন্ধু
কাল্‌সী
তোপ্‌রা
মীরাট
দিল্লী
নিগালীসাগর
রুম্মিনদেঈ
বৈরাট
লুম্বিনী
লউড়িয়া নন্দনগড়
ভাব্রু
লউড়িয়া অররাজ
এলাহাবাদ
সাঁচী
পাটলিপুত্র
কৌশাম্বী
সারনাথ
বরাবর
রূপনাথ
সাসারাম
গিরনার
সোপারা
জউগড়
ধউলী
মাস্‌কী
য়েরাগুডি
পাল্‌কীগুণ্ডু
গবীমঠ
ব্রহ্মগিরি
সিদ্দাপুর
জটিংগ-রামেশ্বর
১ শিলানুশাসন
২ ছোট শিলানুশাসন
৩ স্তম্ভানুশাসন ও স্তম্ভলেখ
৪ গুহালেখ
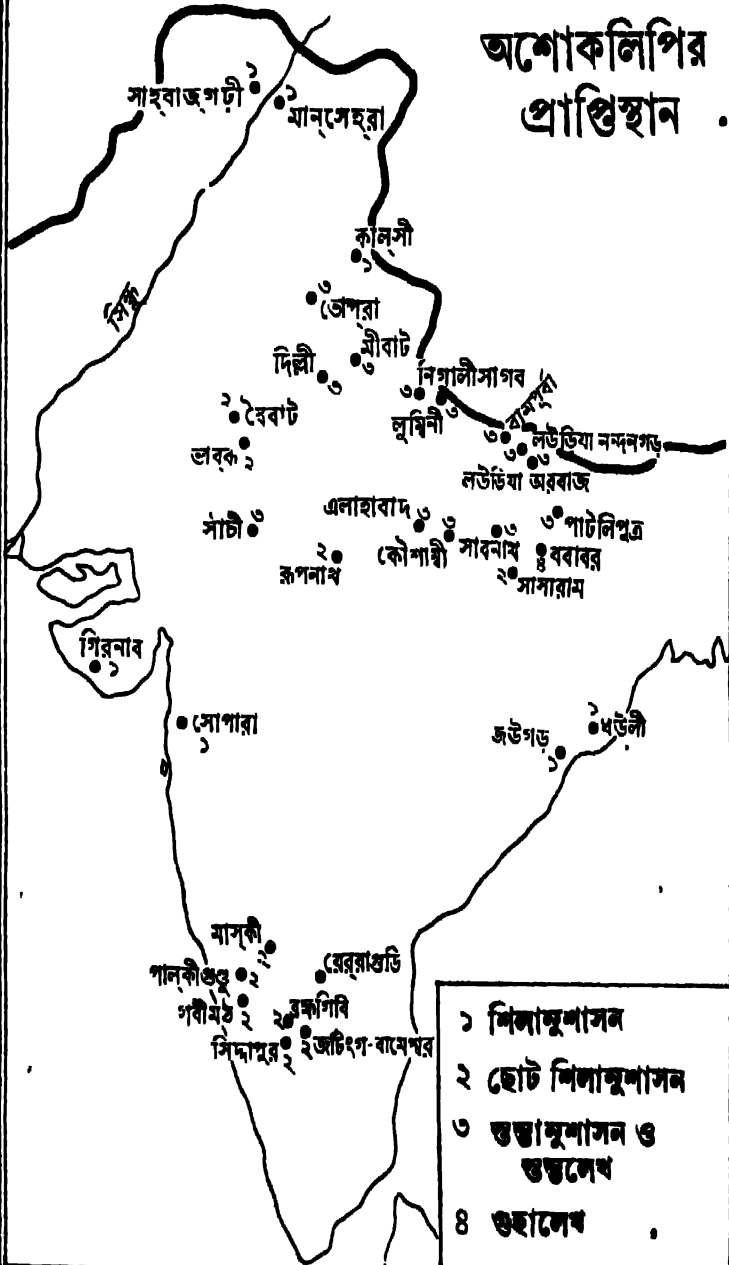
বহুদিন হইতে এবিষয়ে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে ১৯১৫ সনের (এখনও ৫০ বছর পূর্ণ হয় নাই) জানুয়ারি মাসে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত রায়চুর জেলায় মস্‌কি গ্রামে একটি শিলালিপিতে দেখা যায় খোদিত আছে 'দেবানং পিয়স অসোকস', অর্থাৎ 'দেবানাং প্রিয়স্য অশোকস্য।' ইহার পর জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়, বোঝা যায় যে দেবতাদের প্রিয় ও প্রিয়দর্শী রাজার নাম—অশোক।

অশোকের বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। শোনা যায় বাল্যে ও যৌবনে তিনি অত্যন্ত অশান্ত ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির ছিলেন। মনে হয় পিতা বিন্দুসারের রাজত্বকালে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এবং হয়ত তক্ষশিলায়। প্রবাদ আছে, রাজসিংহাসনের অধিকার লইয়া অন্যান্য ভাইদের সহিত তাঁহার বিরোধ হয় এবং সেই বিরোধ বা যুদ্ধের ফলে তাঁহাদের কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। অবশেষে অশোকই মগধের রাজা হন। সিংহাসন অধিকারের চারবছর পরে অশোকের অভিষেক হইবার যে প্রবাদ আছে তাহা হইতে অনেকে মনে করেন উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ ও বিরোধের কাহিনী সত্য হইতে পারে। যাই হোক, একথা আজ সত্য বলিয়া স্বীকৃত যে, আনুমানিক ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোক মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং অভিষিক্ত হন চারবছর পরে ২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অশোক সম্বন্ধে পুরাণে ও বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু তাহা ইতিহাসে নহে। অশোক নিজে তাঁহার রাজত্বের কথা শিলালিপিতে ও স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। সেই বিবরণই নির্ভরযোগ্য।

অশোকলিপি

অশোকের লিপিগুলি পাওয়া গিয়াছে গিরিগাত্রে, শিলাফলকে, শিলাস্তম্ভে ও গুহাগাত্রে। উত্তরে পেশোয়ার হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে শাহবাজগঢ়ী গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া কালসী, কৌশাম্বী, তোপ্‌রা, মীরাট, দিল্লী, বৈরাট, ভাবরু, নিগালীসাগর, লুম্বিনী, রামপূর্বা, লউড়িয়া-অররাজ, লউড়িয়া-নন্দনগড়, সাঁচী, রূপনাথ, এলাহাবাদ, সারনাথ, পাটলিপুত্র, বরাবর, সাসারাম, গিরনার এবং দক্ষিণভারতে সোপারা, ধৌলি, জৌগড়, মস্‌কী, পালকিগুণ্ডু, গবীমঠ, সিদ্দাপুর, যেরাগুড়ি, ব্রহ্মগিরি, জটিঙ্গ-রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র অশোকলিপির

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোনদিক বাদ নাই। অশোকলিপি যে ভাষায় রচিত তাহা প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রাকৃতের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার সহিত ইহাব পার্থক্য আছে। পণ্ডিতেবা তাই এই ভাষাকে **অশোক প্রাকৃত** নাম দিয়াছেন। মনে হয় এই প্রাকৃত ভাষাই অশোকের কালে মগধেব রাজকর্মে ব্যবহার করা হইত। মূল লিপিগুলি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইত, তারপর সেখানকার সরকারী দফ্তরে সেই সেই প্রদেশ প্রচলিত প্রাকৃতে অনূদিত হইয়া লিপিকরদের দ্বারা পাথরে খোদিত হইত।

অশোকের সাম্রাজ্য – 273 ৪।

অশোকলিপিগুলিব সাহায্যেই অশোকেব সাম্রাজ্যসীমা মোটামুটি অনুমান করা যায়। উত্তবে দেরাদুন জেলা ও নেপালের তরাই হইতে দক্ষিণে নিজামরাজ্য ও মহীশূরের চিতলদুর্গ জেলা পর্যন্ত, পশ্চিমে গিরনাব ও সোপারা হইতে পূবে কলিঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত, এবং উত্তর পশ্চিমে পেশোয়ার ও হাজারা জেলা পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গিরিলেখমালার দ্বিতীয় অনুশাসনে অশোক 'প্রত্যন্ত' দেশ হিসাবে আতাম্রপর্ণী চোড, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও আন্তিযোক নামে 'যোন' বা যখন রাজার রাজ্য এবং তাহার কাছাকাছি অন্যান্য বাজ্যের কথা উল্লেখ কবিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তাম্রপর্ণী (সিংহলের প্রাচীন নাম, আবাব তিনেভেল্লি জেলার একটি নদীর নাম) পর্যন্ত বিস্তৃত চোল, চের, পাণ্ড্য-রাজ্য, মালাবার উপকূল, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আন্তিয়োকের যবন বা গ্রীকরাজ্য অশোকের সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। এতবড় সাম্রাজ্যের কতটুকু তিনি নিজে জয় করিয়াছিলেন ?

গিরিলেখমালার ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোক তাঁহার কলিঙ্গ বিজয়ের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অভিষেকের অষ্টম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। কাজেই কলিঙ্গ ছাড়া মনে হয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ তিনি পিতা ও পিতামহের কাছ হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন।

অশোকের শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করিয়া এক-একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর শাসনের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। এই প্রাদেশিক শাসকরা কেহ **কুমার** কেহ **আর্যপুত্র** নামে পরিচিত ছিলেন। বোধহয় ইহাদের মধ্যে পদমর্যাদার কিছু পার্থক্য ছিল। কুমারেরা অশোকের পুত্র বা ভাই হইতে পারেন, এবং আর্যপুত্রেরা হয়ত তাঁহার জ্ঞাতি বা আত্মীয় হইতে পারেন। এই কুমার ও আর্যপুত্ররা ছাড়া বিভিন্ন অনুশাসনে আরও অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। যেমন—

১। মহামাত্র	৪। যুত
২। রাজুক	৫। পুরুষ
৩। প্রাদেশিক	৬। প্রতিবেদক

মহামাত্রদের স্থান ছিল কুমার ও আর্যপুত্রদের পরে। প্রদেশ-শাসকদের মতো মহামাত্রদেরও পদমর্যাদার তারতম্য ছিল। অনুশাসনে 'স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্র' নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। মনে হয় স্ত্রীজাতির মঙ্গলবিধানের জন্য ইহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইত।

রাজুকেরা রাজস্ববিভাগের কর্মচারী ছিলেন, জমি জরিপ ও বন্দোবস্ত করিতেন। অশোকের সময়ে বহুলক্ষ লোকের শাসনভার রাজুকদের উপরে থাকিত। ইহাদিগকে বিভাগীয় শাসনকর্তা বলা যাইতে পারে। প্রাদেশিকরা মনে হয় ছোটখাট অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। যুত বা যুক্তেরা মহামাত্রদের দফ্‌তরে কাজ করিতেন। পুরুষরা ছিলেন গুপ্তচরদের নামান্তর। সেকালের রাজাদের গুপ্তচর না হইলে চলিত না। বৈদিক যুগেও এই গুপ্তচরদের কথা জানা যায়। প্রতিবেদকরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইজন্য আহার, বিহার ও বিশ্রামের সময় প্রতিবেদকরা বিনাবাধায় সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য রাজার কাছে যাইতে পারিতেন।

পণ্ডিত ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন, অশোকের সাম্রাজ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্য চারভাগে বিভক্ত ছিল—

জনপদ | প্রদেশ | আহার (জেলা) | বিষয় (তালুক)

অশোকের সাম্রাজ্য
২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
কপিলবস্তু
মথুরা
পাটলিপুত্র
মগধ
প্রয়াগ
সাঁচী
তাম্রলিপ্তি
কলিঙ্গ
চোল
পাণ্ড্য
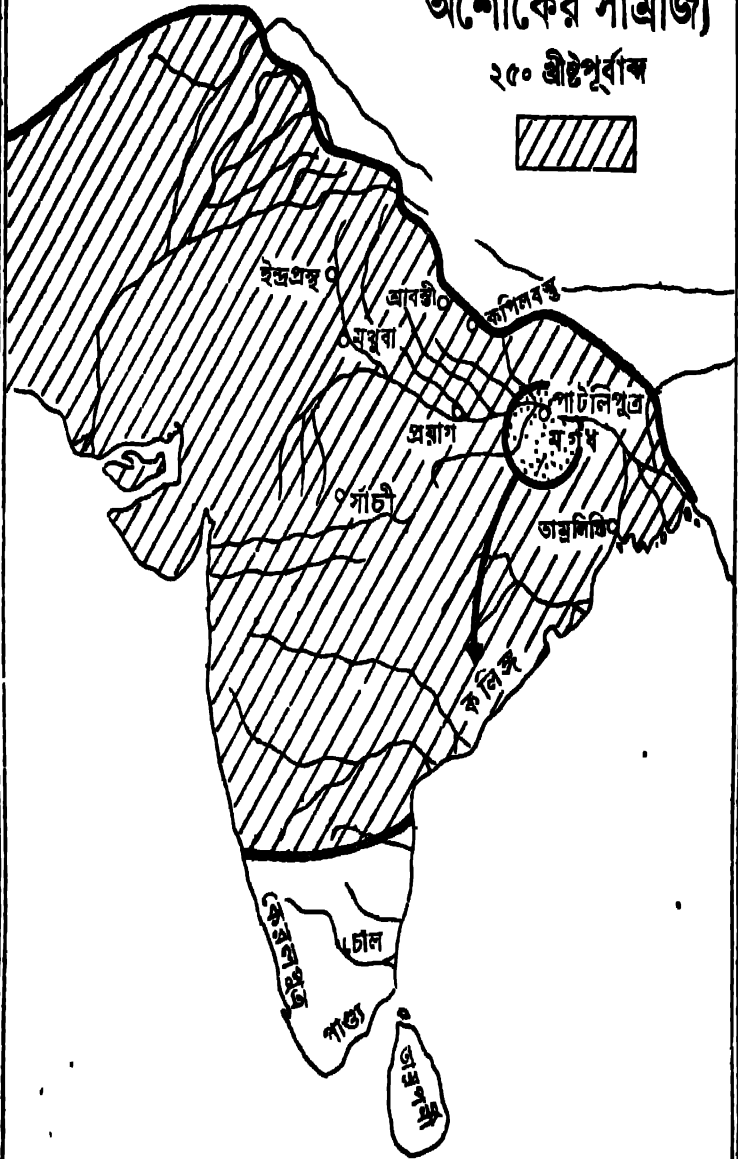
প্রত্যেক তালুকের যে প্রধান নগর তাহাকে 'কোট্ট' বলিত। প্রাদেশিকরা প্রদেশের, রাজুকরা জেলার, এবং পুরুষেরা তালুকের বা মহকুমার শাসক ছিলেন। অশোকের শিলালিপিতে যে 'পরিষদ' কথার উল্লেখ আছে ভাণ্ডারকার তাহাকে 'মন্ত্রি-পরিষদ' বলিয়াছেন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে যে মন্ত্রি-পরিষদের কথা বলিয়াছেন ইহা সেই পরিষদ। রাজার আদেশ-নির্দেশ পরিষদে আলোচনা হইত, তাবপর মহামাত্ররা তাহা জানিতে পারিতেন ও পালন করিতেন। অনেক সময় পরিষদ নিজেদের পরিকল্পনার কথাও রাজাকে জানাইতেন। মহামাত্ররা রাজাজ্ঞা পালন করিতেছেন কি না তাহা পরিষদই দেখাশুনা করিতেন। রাজার নীতি, আদেশ ও নির্দেশ সম্বন্ধে পরিষদ ও মহামাত্রদের মধ্যে কখন কখন মতভেদ হইত, এবং তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা রাজাকে জানাইতে হইত। এই সব খবর রাজাকে দিবার দায়িত্ব থাকিত প্রতিবেদকদের উপর। প্রত্যেক বাজকর্মচারীকে মধ্যে মধ্যে নিজে ঘুরিয়া স্বচক্ষে ও সরজমিনে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানিতে ও বুঝিতে হইত। ইহা ছাড়া রাজার পক্ষ হইতেও মহামাত্ররা রাজ্যমধ্যে ঘুরিয়া রাজকার্যের ও প্রজাদের অবস্থার খোঁজখবর করিতেন। অশোক প্রধানত এই কাজের জন্যই ধর্মমহামাত্র পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের ধর্ম ও নীতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কি না, প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে কি না, অনাথ অসহায় অথর্ব যাহারা তাহাদের ভরণপোষণ করা হইতেছে কি না, এই সব কল্যাণকর কাজকর্ম ধর্মমহামাত্ররা পরিদর্শন করিতেন।

অশোকের ধর্ম

দিগ্বিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বলিয়া, অথবা নিজেও বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া অশোক ইতিহাসে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া আছেন মনে করিলে ভুল হইবে। ধর্মনীতির জন্যই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। কলিঙ্গ অভিযানের পর লোভ, হিংসা ও হানাহানির জন্য অনুতপ্ত হইয়া গভীর বেদনায় অশোক ধর্ম ও শান্তির পথযাত্রী হইয়াছিলেন। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া অশোক মর্মাহত হন। সেইদিন হইতে দিগ্বিজয়ের বাসনা তিনি ত্যাগ করেন, তাঁহার রাজ্যে 'ধর্মঘোষ' ধ্বনিত হইয়া ওঠে, 'ভেরী-

ঘোষ' স্তব্ধ হইয়া যায়। 'ধর্ম' বলিতে অশোক কি বুঝিতেন তাহা বারংবার তিনি শিলালিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন। 'শীল', 'চারিত্র' বা সদ্‌গুণের অনুশীলনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করিতেন। তিনি যে দ্বাদশটি গুণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন তাহা এই :

১। দয়া	৭। অপব্যয়তা ও অপভাণ্ডতা *
২। দানশীলতা	৮। সংযম
৩। সত্যানুরাগ	৯। ভাবশুদ্ধি
৪। শৌচ বা শুচিতা	১০। দৃঢ়ভক্তি
৫। মার্দব বা মৃদুতা	১১। কৃতজ্ঞতা
৬। সাধুতা	১২। ধর্মরতি

ধর্মরতি বা ধর্মকামতার অনুকূল গুণ ও আচরণও অশোক তাঁহার অনুশাসনে নির্দেশ করিযাছেন, যেমন—

১। শুশ্রূষা বা আজ্ঞানুবর্তিতা। কাহার আজ্ঞার অনুবর্তী হইতে হইবে? প্রিয়দর্শী বলিযাছেন—পিতামাতাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের, গুরুর, উচ্চজাতির ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির।

২। অপচিতি বা শ্রদ্ধা। কাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে? গুরুকে ও আচার্যকে বা শিক্ষককে।

৩। 'সংপটিপটি' বা যথোচিত ব্যবহাব। পাত্র কাহারা? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেবা, জ্ঞাতিরা, দাস ও ভৃত্যেরা, দীনদুঃখীরা, সহচরেরা, মিত্র ও পরিচিত জনেরা।

৪। দান।

৫। প্রাণীদের 'অনারংভ' বা অহিংসা। জীবের প্রতি ও সর্বভূতের প্রতি অহিংসা।

এই সব গুণ ও আচরণ ধর্মকামতার অনুকূল, অর্থাৎ মনে ধর্মভাব জাগায়। এগুলি অনুশীলন করিতে হইবে। তেমনি কতকগুলি 'অগুণ' আছে, অশোক 'আসিনব' বা পাপ বলিয়াছেন, যাহা পরিত্যাজ্য। এই অগুণ বা পাপ পাঁচটি :

* অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয়

১। চণ্ডভাব ২। নিষ্ঠুরতা ৩। ক্রোধ ৪। মান বা অহংকার ৫। ঈর্ষা। এই অগুণগুলি বর্জন করিলে মনে ধর্মচেতনা জাগিতে পারে।

এই ধর্মবোধ ও ধর্মচেতনা লোকচিত্তে জাগাইবার জন্য অশোক (১) অন্য মহামাত্রদের মতো ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করেন; (২) বিহারযাত্রার পরিবর্তে নিজে ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন, (৩) সাধারণ মাঙ্গলিক কর্মের বদলে ধর্মমাঙ্গলিকের, এবং রাজাজ্ঞার মতো ধর্মাজ্ঞা বা ধর্মঘোষণার ব্যবস্থা করেন, (৪) রাজমহিমা-জ্ঞাপক শিলালিপির বদলে ধর্মলিপি প্রচার ও ধর্মস্তম্ভ স্থাপন করেন; (৫) সাধারণ দানের বদলে ধর্মদান, এবং রাজ্যজয়ের বদলে ধর্মজয় আরম্ভ করেন।

অশোক যে ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে তাহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই, সকল ধর্মেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু একটু বিচার ও চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অশোকের ধর্মশিক্ষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য হইল তাহার সামাজিক ও মানবিক দিক। তিনি এমন সব গুণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন, যাহার দ্বারা, মানুষের সমাজ-বন্ধন ও প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অশোক অসামান্য উদারতার সহিত তাঁহার অনুশাসনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমার একান্ত কামনা, সকল সম্প্রদায়ের দেবতা ও মানুষ একত্র মিলিত হোক।' অশোকের এই মানবিক উদারতা বর্তমানকালের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার কলুষিত পরিবেশে সর্বদা স্মর্তব্য।

অশোকের চরিত্র ও ঐতিহাসিক মর্যাদা

অশোকের চরিত্র তাঁহার জীবনেই প্রতিফলিত। আসমুদ্র-ক্ষিতীশের রাজপ্রাসাদে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, রাজপুত্রের মতো ভোগবিলাসে তিনি মানুষ হইয়াছেন, কুমার-জীবনে প্রদেশরাজ্য শাসনে এবং সম্রাট হইয়া বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট কঠোরতা দেখাইয়াছেন, কখনও দুর্বলতা, শৈথিল্য অথবা বৈরাগ্যের প্রশ্রয় দেন নাই। সহজেই তিনি আরও অনেক বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অধিকতর ক্ষমতাশালী সম্রাট হইতে পারিতেন, কলিঙ্গ-বিজয়ের পর আরও অনেক দেশ ও মানুষের উপর রাজশক্তির প্রচণ্ডতা দেখাইতে পারিতেন, এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য-বিলাসে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেন। তাহা করিলেও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্রের খ্যাতির কোন ক্ষতি হইত না, ইতিহাসেও

তাঁহার নাম থাকিত, কিন্তু তাঁহার প্রতি কেবল ভারতের নহে, সারা পৃথিবীর মানুষের এরকম গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কখনই থাকিত না। রাজ্যজয় অনেক রাজা করিয়াছেন, করিতে করিতে হয়ত কাহারও মনে বৈরাগ্যেরও উদয় হইয়াছে, কিন্তু কলিঙ্গ-বিজয়ের করুণ কাহিনী অশোক যেভাবে তাঁহার অনুশাসনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর কোন দিগ্বিজয়ী বীর তেমন করিয়া বিজিত দেশের হতাহত, শোকার্ত গৃহহীন, আশ্রয়হীন নরনারীব জন্য অশ্রুপাত করেন নাই, কোন সার্বভৌম নৃপতি সকলেব জ্ঞাতার্থে এমন অকপটে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ কবিয়াছেন বলিযা আমরা জানি না। তাহার পবেও অশোক গৌতমেব মতো সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়া, রাজ্য ও সিংহাসন ছাডিয়া শান্তি ও সত্যজ্ঞানেব সন্ধানে চলিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাও তিনি যান নাই। বুদ্ধপন্থী হইযাও তিনি ধর্মের সহজ সন্ন্যাসের পথ বাছিয়া নেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাজধর্ম ও রাজকর্তব্য পালনের ভিতর দিয়াই মানুষের মধ্যে ইহজগতে সত্যকার ধর্ম সংস্থাপন করিতে হইবে। বুদ্ধ নিজেও ধর্ম-সংস্থাপনের এই পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়াছেন। অশোক সেই শ্রেষ্ঠ ও দুর্গমতম পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

মনীষী এইচ, জি, ওয়েল্‌স বলিয়াছেন: "শত শত, হাজার হাজার রাজাব নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাঁহাদের খেতাবও বড বড়, রাজা মহারাজা মহা-রাজাধীরাজ মহাবিক্রমশালী এবং আরও কত কি। কিন্তু সকলের নাম ও নামের ভূষণের মধ্যে একমাত্র অশোকের নাম উজ্জ্বল তারকার মতো জ্বলিতেছে। ভল্‌গা হইতে জাপান পর্যন্ত অশোক পূজিত ও সম্মানিত। চীন তিব্বত, এমন কি ভারতেও যেখানে তাঁহার বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অস্তিত্ব নাই সেখানেও তাঁহার মহত্বের ঐতিহ্য কেহ ভুলিয়া যায় নাই।"

মেগাস্থেনিসের বিবরণ

মেগাস্থেনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, তবে আরিয়ান স্ট্রাবো ডায়ো-ডোরস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকরা এই গ্রন্থ হইতে অনেক বিবরণ বাছিয়া নিজেদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য বাদ দিয়া এখানে শুধু রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে বিবরণের সার সংগ্রহ করা হইল।

ভারতের অধিবাসিদের মেগাস্থেনিস সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছেন। **পণ্ডিতেরা** হইলেন প্রথম জাতি, অন্যান্য জাতি হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেও মর্যাদায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের কোন রাজকার্য করিতে হয় না, কাহারও প্রভু বা ভৃত্য তাঁহারা নন। তাঁহারা দেবতাদের প্রিয়পাত্র এবং পরলোকদ্রষ্টা বলিয়া যজ্ঞ করেন, শ্রাদ্ধ করেন, অনাবৃষ্টি ব্যাধি ইত্যাদি গণনা করিয়া বলিয়া দেন। গণনায় ভুল হইলে দণ্ডিত হন না, কেবল জনসমাজে নিন্দিত হন এবং সারাজীবন মৌন হইয়া থাকেন। গ্রীকদূত এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথাই বলিয়াছেন।

কৃষকরা দ্বিতীয় জাতি, সংখ্যায় সর্বাধিক। ইহাদের যুদ্ধ বা রাজকর্ম করিতে হয় না সারাক্ষণ কৃষিকাজ করিতে হয়। কৃষক সকলের মঙ্গল করে বলিয়া কেহ তাহাদের ক্ষতি করে না, শত্রুরাও না। মানুষের সুখের জন্য যে শস্য ও ফসল দরকার তাহা প্রচুর পরিমাণে কৃষকেরা উৎপাদন করে। তাহারা কখনও নগরে যায় না, সপরিবারে গ্রামে বাস করে। রাজাকে কর ও উৎপন্ন ফসলের চারভাগের একভাগ তাহাদের দিতে হয়। ভারতে রাজাই ভূসম্পত্তির মালিক, প্রজাদের কোন স্বত্ব নাই। তৃতীয় জাতি **গোপাল ও মেষপাল**। ইহারা গ্রামে বা নগরে বাস করে না, যাযাবরের মতো শিবির স্থাপন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, শিকার ও পশুপালন করে। চতুর্থ জাতি **কারুশিল্পীরা**। ইহারা নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে। কিন্তু কৃষকদের মতো ইহারা কর দেয় না, বরং রাজকোষ হইতে ভরণ-পোষণ পায়। **যোদ্ধারা** পঞ্চম জাতি। সংখ্যার দিক হইতে ইহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুদ্ধের জন্য ইহারা সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত থাকে, কিন্তু শান্তির সময় কেবল আলস্যে ও আমোদ-প্রমোদে দিন কাটায়। সৈন্য, যুদ্ধের হাতী-ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুর ব্যয়ভার রাজা বহন করেন। অমাত্য বা **মহামাত্ররা** ষষ্ঠ জাতি। দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া রাজার কাছে ও শাসকদের কাছে ইহারা নিয়মিত বিবরণ দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রশাসনের কাজে ইহাদের গুরুত্ব আছে। সপ্তম জাতি **মন্ত্রী**। ছোট সভায় মিলিত হইয়া ইহারা রাজাকে মন্ত্রণা দিয়া থাকেন। সংখ্যায় সবচেয়ে কম হইলেও, বংশমর্যাদায় ইহারা সবচেয়ে বেশী সম্মানের যোগ্য।

এই সাতটি জাতিতে ভারতবাসীদের ভাগ করিয়া মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন যে এক জাতি অন্য জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না, অথবা অন্যের পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে না।

মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—ভারতজনেরা সকলেই স্বাধীন, কেহই ক্রীতদাস নহে। একথা এইভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই মনে হয় যে প্রাচীন গ্রীসে যেমন দাসত্বপ্রথা সমাজব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল, প্রাচীন হিন্দুভারতে তাহা ছিল না। ভারতে বিচ্ছিন্ন আকারে যে দাসত্ব ছিল তাহার রূপ একেবারে ভিন্ন। তাহা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার মাত্র, সমাজব্যবস্থার অঙ্গ নহে। মুসলমানযুগের আগে বাহির হইতেও ভারতে ক্রীতদাস আমদানি হইত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কেবল ভারতের ক্রীতদাস নহে, বিদেশী ক্রীতদাসও এদেশে গ্রীকদূত চোখে দেখেন নাই।

মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন ভারতবাসীরা আহার সম্বন্ধে মিতাচারী, এবং কোন বড় জনসংঘ ভালবাসে না বলিয়া জীবনও তাহাদের সুসংযত ও সুশৃঙ্খল। চুরিচামারি খুবই বিরল। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে যাহারা বাস করিতেন (প্রায় চারলক্ষ লোকের বাস ছিল) তাঁহারা বলিয়াছেন যে ত্রিশ মুদ্রার বেশী মূল্যের বস্তু কোনদিনই শিবির হইতে চুরি হয় নাই। মিতাচারী ও সরলচিত্ত বলিয়া ভারতজনেরা খুব সুখী। যজ্ঞের সময় ছাড়া তাহারা কখনও মদ্যপান করে না। যে মদ্য পান করে তাহা যব হইতে প্রস্তুত নহে, অন্ন হইতে প্রস্তুত। প্রধান খাদ্য তাহাদের অন্নব্যঞ্জন। বিধিবিধান বিশেষ তাহারা জানে না ও মানে না, মানিবার দরকারও হয় না। কারণ তাহারা যাহা বলে তাহা করে, কখনও ঝগড়া-বিবাদ করে না, রাজদ্বারে অভিযোগও উপস্থিত করে না। গৃহ তাহাদের সুরক্ষিত নহে। গ্রীকদূত এই সমস্ত আচারের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন, কেবল একটি অভ্যাস তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে ভারতজনেরা আজীবন একা ভোজন করে, দিনে বা রাতে কোন নির্দিষ্ট সময় নাই যখন সকলে মিলিয়া একত্রে ভোজন করিতে পারে। যাহার যখন ইচ্ছা সে তখন আহার করে। গ্রীকদূত ঠিকই লক্ষ্য করিয়াছেন, পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া একত্রে ভোজন করা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা নহে। তাঁহার কাছে তাই ভারতীয়দের একা আহার খুবই বিসদৃশ মনে হইয়াছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাণক্য রচিত **অর্থশাস্ত্র** বলিয়া কিংবদন্তী আছে, কিন্তু ইহা কোন একজন ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দুযুগের ভারতের বহু মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তা ও রচনা ইহাতে এককালে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

কৌটিল্য বলিয়াছেন, ভারতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গ্রাম, সমাজের ভিত্তি পরিবার। ১০০ পরিবার লইয়া একটি গ্রাম হইবে, ৫০০ পরিবারের বেশী একটি গ্রামে বাস করিবে না। গ্রামের সীমা একক্রোশ বা দুই ক্রোশের বেশী হইবে না, সীমানা নির্ধারিত হইবে নদী, পাহাড়, বন, বড় বড় গাছ, সেতুবন্ধ ইত্যাদি দিয়া। ৮০০ গ্রাম লইয়া একটি 'স্থানীয়' দুর্গ, ৪০০ গ্রাম লইয়া 'দ্রোণমুখ', ২০০ গ্রাম লইয়া 'খাবাটিক' এবং ১০টি গ্রাম লইয়া 'সংগ্রহণ' স্থাপিত হইবে। ইহা গ্রামরক্ষা ও গ্রামের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।

রাজার কর্তব্য হইল খনি-খনন, পণ্য-উৎপাদন, বনসম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি, পশুপালন ও বাণিজ্য-প্রসারে সাহায্য করা। তাহার জন্য তিনি স্থলপথ ও জলপথ উভয়েরই ব্যবস্থা করিবেন, 'পণ্য-পত্তন' বা বাণিজ্য-নগর গড়িয়া তুলিবেন। সেতু, জলাশয়, পুণ্যস্থান ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠা করা রাজার কর্তব্য। মৎস, হরিৎপণ্য (শাকসব্‌জী) ইত্যাদি ব্যবসার অধিকার সম্পূর্ণ রাজার থাকিবে। অনাথ, অসহায় ও দুঃখীর ভরণপোষণ করিবেন রাজা। অসহায় সন্তানসম্ভবা নারীকেও রাজা দেখিবেন, সন্তান হইলে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। অর্থের লোভে, বেগার মজুর ধরিবার জন্য, শস্যপণ্য ও পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করিবার জন্য কোন অভিনেতা, নর্তক, বাদক, বাগ্‌জীবী, কবি-গায়ক ও অন্য কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা

মৌর্য শাসনব্যবস্থার (administration) প্রধান স্তম্ভ ছিল তিনটি—রাজস্ব-ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গুপ্তচর বা পুলিসী ব্যবস্থা। কৌটিল্যের

অর্থশাস্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে এবং মেগাস্থেনিসের বিবরণে তাহার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। সম্রাট সর্বময় কর্তা, সর্বশক্তির উৎস ও কেন্দ্র। মন্ত্রী, মহামাত্র বা পরিষদ তাঁহার ছায়া মাত্র। রাষ্ট্রীয় বিধান বা ব্যবস্থাকে রূপ দিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, কার্যক্ষেত্রে সম্রাটের বিধান ও ব্যবস্থা প্রয়োগ করাই তাঁহাদেব কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় শক্তির অর্থনীতিক অবলম্বন রাজস্ব। প্রধান রাজস্ব ভূমি রাজস্ব। তাহা ছাড়া বাণিজ্য, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদির 'শুল্ক' (duty) ও 'কর' (tax) হইতেও রাজার আয় হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ হইল খনি, বন-উপবন, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য, পথঘাট-পত্তন ইত্যাদি। এই সব হইতেও আয় হয়। মৌর্যযুগে এই রাজস্ব-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, আয়বৃদ্ধির দিকে রাজার দৃষ্টি ছিল সজাগ। কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ, এবং বণিকরা লাভের চতুর্থাংশ রাজকোষে দিত। জুয়া, মদ্য ও মাদকদ্রব্য ইত্যাদির লাইসেন্স বা আজ্ঞাপত্র এবং লবণের একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হইতেও প্রচুর আয় হইত। মৌর্যযুগের এই রাজস্ব-ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে মূলত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কেবল তাহার আকার ও বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে মাত্র।

রাজার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক ছিল বলিয়া মৌর্যযুগে তাহা পালন ও বহন করিবার জন্য আমলা-অমাত্যও প্রয়োজন হইয়াছিল অনেক বেশী। অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলে রাজকর্মের বিভাগের অন্ত ছিল না বলিয়া মনে হয়, এবং রাজকর্মচারীর সংখ্যাও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। গ্রাম হইতে নগর পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য অসংখ্য আমলার তালিকা দিয়াছেন কৌটিল্য। এই আমলা-অমাত্যবহুল রাষ্ট্রকে 'আমলাতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলা হয়। মৌর্য-রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic) ছিল, এবং সেই আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার আজও আমরা হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগ পার হইয়া বহন করিয়া চলিয়াছি।

গুপ্তচর বা পুলিসী-ব্যবস্থাও মৌর্য রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ব্যবস্থা যেমন বিস্তৃত, তেমনি পোক্ত ছিল। কৌটিল্য গুপ্তচরদের যে বিবিধ ও বিচিত্র দায়িত্ব পালনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য ছিল। বর্তমান যুগেও ইহা পরিহার করার কথা কোন রাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করিতে পারেন না।

বুদ্ধের জলের উপর হাঁটিবার অলৌকিক কাহিনী
সাঁচী স্তূপ। প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মৌর্যযুগের শিল্পকলা

মৌর্য রাজাদের আমলে শিল্পকলা-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল রাষ্ট্রে ও সমাজে। এই পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে, শিল্পকলার সাধনা বা বিকাশ হয় না। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধি আনিয়া তাঁহারা শিল্প-সাধনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক যাহা করিয়াছিলেন তাহা শিল্পকলার বিকাশের দিক হইতে আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমাজে তাঁহার ধর্ম ও নীতির ভিতর দিয়া সকল শ্রেণীর মানুষের সামনে যে মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল শিল্পকলার প্রাণ। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত বা পিতা বিন্দুসারের আমলে শিল্পকলার চর্চা

মায়াদেবীর স্বপ্ন। ভারহুত স্তূপ
দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

বা বিকাশ যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। চন্দ্রগুপ্তের কালে অন্তত স্থাপত্যের বা গৃহনির্মাণশিল্পের যে বেশ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীক লেখকরা বলেন যে, পাটলিপুত্রে তিনি যে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে পারস্য-সম্রাটের আশ্চর্য প্রাসাদমহিমাকেও ম্লান করিয়া দিয়াছিল। মেগাস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র নগর সর্বশ্রেষ্ঠ, উহা প্রাচ্যরাজ্যে হিরণ্যবাহ নদ ও গঙ্গার সংগম-স্থলে অবস্থিত। নগরের আকার সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো, চারিদিক পরিখা-বেষ্টিত, পরিখার বিস্তার ৬০০ ফুট ও গভীরতা ৩০ হাত। নগরের চারিদিক কাঠের প্রাচীর দিয়া ঘেরা, তাহাতে ৫৭০টি বুরুজ ও ৬৪টি দরজা আছে।

নির্মাণপ্রসঙ্গে গ্রীকদূত আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এত নগর আছে যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না, তবে সমস্ত নগর একরকম নহে। যে-সব নগর নদী বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেগুলি কাঠের তৈরী, কারণ বর্ষা প্রবল বলিয়া ইট সেখানে স্থায়ী হয় না। কিন্তু যেসব নগর উচ্চভূমি বা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত সেগুলি ইট ও কাদা দিয়া তৈরী। ইট-পাথরের কারুকর্মে ও চিত্রাঙ্কনে ভারত-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস মৌর্যযুগে অশোকের কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও ভুল হয় না।

সম্রাট অশোকের হৃদয়ের উদারতা, চিত্তের প্রসারতা এবং চরিত্রের গভীরতা ও কোমলতা মনে হয় যেন তাঁহার যুগে শিল্পকলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারনাথ, সাঁচী প্রভৃতি ভারতের বহু স্থানে অশোক যে শত শত স্তূপ (বৌদ্ধ বিবরণ অনুযায়ী ৮৪ হাজার) স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও আজ সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অশোক-ভাস্কর্যের যে নিদর্শন আজও টিকিয়া আছে তাহা তাঁহার স্থাপিত পাথরের স্তম্ভগুলি। কিন্তু এই স্তম্ভগুলিই পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর কীর্তি বলিয়া বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করিয়াছেন। দীর্ঘাকার স্তম্ভগুলি (কোনটি ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু) প্রত্যেকটি একখণ্ড পাথর কাটিয়া তৈরী, চোখে দেখিলেও বিশ্বাস করা কঠিন। স্তম্ভগুলির গড়ন বেলনাকৃতি (cylindrical), উপরের বেধ বা বেড় ক্রমশ ছোট হইয়াছে, কারুকার্য নাই কিন্তু শান্ত ও সুকোমল। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ প্রভৃতি পশুমূর্তির শিরোভূষণ, তাহার নীচে সিংহ, হাঁস, লতাপুষ্প ইত্যাদি উৎকীর্ণ। এই শিরোভূষণ আলাদা তৈরী করিয়া স্তম্ভের মাথায় বসানো হইত। কিন্তু ইহা স্তম্ভের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গিলগ্ন যে দেখিলে মনে হয় যেন একই পাথর কাটিয়া স্তম্ভ ও শিরোভূষণ তৈরী করা হইয়াছে। শিরোভূষণের অধোদেশের (abacus) নিম্নভাগে অধোমুখী পদ্ম আছে। সমগ্র স্তম্ভটি একটি উঁচু পাথরের বেদীর উপর স্থাপন করা হইত।

QUESTIONS

1. Narrate briefly the campaigns and movements of Alexander in India.
2. What were the direct and indirect consequences of the Persian and Greek invasions in India ?

3. Give an account of the extent of Chandragupta's Empire.
4. Give an estimate of Chandragupta Maurya as an Emperor and Empire-builder.
5. Give a brief account of Mauryan administration.
6. Give a short account of the social and economic life in Mauryan India.
7. What measures did Asoka adopt for the propagation of the ideals of 'Dhamma' within and outside his Empire ? What were the ideals of the 'Dhamma' ?
8. Describe briefly the system of civil administration under Asoka.
9. "Asoka is the greatest king of the world". Discuss the statement.
10. Give an estimate of Asoka as a man and an Emperor.
11. Give a short account of Megasthenes's description of India.
12. Give an account of Mauryan art and architecture.
13. Write short notes on the following ;
    (a) Sixteen Mahajanapadas
    (b) Kautilya's Arthasastra
    (c) Bindusara

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্যদের পতন। বিদেশীদের অভিযান

ইতিহাসের যাত্রাপথে বড় বড সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। উত্থানের মতো পতনেরও ঐতিহাসিক কারণ থাকে, দৈবক্রমে ইতিহাসের ঘটনা ঘটে না। সম্রাট অশোকের পর মৌর্য রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা কেহই রাজদণ্ড ধারণে পূর্বপুরুষদের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সমান তো দূরের কথা, তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণতার জন্য সামান্য শাসকের স্তরে নামিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মৌর্য রাজমুকুটের মহিমা ধূলায় লুটাইয়াছিলেন, নিজেদের দ্রুত অধঃপতনের পথও প্রশস্ত করিয়াছিলেন। বিশাল আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট করিয়া এই সুযোগে চারিদিকে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে, কলিঙ্গে, বিদর্ভে (বর্তমান বেরার প্রদেশ), কাবুল উপত্যকায় স্বাধীন রাজারা কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস পাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হইলে অমাত্যরা চক্রান্ত করিতে প্রলুব্ধ হন। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করেন। মৌর্যবংশের শেষ দীপশিখা নিবিয়া যায়, তাহার সহিত জৈনবৌদ্ধধর্মের রাজপোষকতাও লোপ পায়। কয়েক শতাব্দী পর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার বেশ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। ভারতের ইতিহাস বাঁক ফিরিয়া নূতন পথে চলিতে থাকে।

CHAPTER VII : Fall of the Maurya empire—the Sungas and Kanvas in the North and the Satahavanas in Central and South India.

Foreign invaders—Bactrian Greeks—the new cultural impact—The Parthians—the Sakas—the Kushanas.

শুঙ্গ রাজবংশ

মৌর্যদের পরে উত্তরভারতে শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজবংশ, এবং মধ্য ও দক্ষিণভারতে সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আনুমানিক ১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে **পুষ্যমিত্র** মগধের সিংহাসন দখল করিয়া শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন অশোক ও অন্যান্য মৌর্য রাজারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণদেব মধ্যে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল এবং তাহার জন্য পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য রাজাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইযাছিলেন। এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। মৌর্য-বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই পুষ্যমিত্র বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাজ্য উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর ও শিয়ালকোট হইতে দক্ষিণে নর্মদানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী পাটলিপুত্রতেই ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছিল বিদিশা (বর্তমানে বেসনগর, মালবের পূবে)। এই বিদিশা হইতে পুষ্যমিত্রেব পুত্র অগ্নিমিত্র "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতার প্রতিনিধিরূপে শাসন চালাইতেন।

যুবরাজ অগ্নিমিত্র বিদর্ভের (বেবাব) রাজাকে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে শুঙ্গদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও গ্রীকদের পুনরাক্রমণের বিপদ ঘনাইয়া ওঠে। তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষে সিরিয়াব গ্রীকবাজা অ্যান্টিওকস কাবুল উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ভারতীয় রাজা সুভাগসেনকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি হাতী উপঢৌকন দিতে বাধ্য হন। অ্যান্টিওকসেব জামাতা ডিমিত্রিয়স বক্ত্রিয়ার রাজা ছিলেন, সেখান হইতে তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকার নিম্নভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইবাব চেষ্টা করেন। পরবর্তী গ্রীকরাজা মিনাণ্ডারও এই রাজ্যপ্রসারে কৃতিত্ব দেখান। গ্রীকরা এই সময অযোধ্যা, চিতোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পাটলিপুত্রকেও বিপন্ন করিয়া তোলে। পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় ও তাহার পরেও গ্রীকদের অভিযান চলিতে থাকে। অবশ্য অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র সিন্ধুতীরে গ্রীকদের অভিযান প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। পুষ্যমিত্র তখন জীবিত ছিলেন, পৌত্রের কীর্তিতে খুশী হইয়া তিনি বিজয়োৎসবেব জন্য দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞের গুরুত্ব দুইদিক হইতে বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম দিক হইতেছে, মৌর্যদের ধ্বংসাবশেষেব উপর নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, যে-রাজবংশ

(সুঙ্গ) আর্যাবর্তকে বিদেশী যবনদের কবল হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিক হইতেছে, এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতে রাজধর্মের পরিবর্তন হইল এবং এই নূতন রাজধর্ম হইল হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম। সুঙ্গদের সময় হইতে ভারতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যে সূচনা হয় গুপ্তসম্রাটদের সময় তাহা প্রতিষ্ঠার চরম সীমায় পৌঁছায়।

কাণ্ব রাজবংশ

পুরাণমতে পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন (আঃ ১৮৭-১৫১ খ্রীঃ পূঃ)। তাহার উত্তরাধিকারী হন পুত্র অগ্নিমিত্র। মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকের নায়ক এই অগ্নিমিত্র। তাঁহার পরে সুঙ্গরা রাষ্ট্রমঞ্চ হইতে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যান। তাঁহার বংশধরদের দুর্বলতার জন্য আবার রাজশক্তির বদল হয়, রাজারা অমাত্যদের খেলার পুতুল হইয়া ওঠেন। অবশেষে প্রায় ৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুঙ্গবংশের দশম রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী বসুদেব সিংহাসন দখল করেন। সুঙ্গদের এই মন্ত্রীবংশ "কাণ্ব" বলিয়া তাই বসুদেবপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে কাণ্ববংশ বলা হয়। এই বংশের রাজত্ব পঞ্চাশ বছরও স্থায়ী হয় নাই। ৪০-৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সুঙ্গ ও কাণ্ব উভয় রাজবংশই দক্ষিণভারতের সাতবাহনদের অগ্রগতির সামনে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়।

সাতবাহন রাজবংশ

সুঙ্গ ও কাণ্বদের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া যাঁহারা নূতন রাজশক্তির অধিকারী হন তাঁহারা পুরাণে "আন্ধ্র" বলিয়া পরিচিত। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল হইল তেলুগুভাষী আন্ধ্রদের বাসস্থান। কিন্তু শিলালিপি ইত্যাদিতে ইঁহাদের "সাতবাহন" বলা হইয়াছে। ভারতীয় লোককথায় যে শালিবাহন রাজার কাহিনী শোনা যায় তাহা এই সাতবাহনদেরই স্মৃতি বহন করে।

'এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিমুক, কিন্তু তাঁহার পুত্র শাতকর্ণি বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজমহিমা বৃদ্ধি করেন। এই রাজ্যবিস্তারে তিনি পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের মারাঠা দলপতিদের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া উৎসব
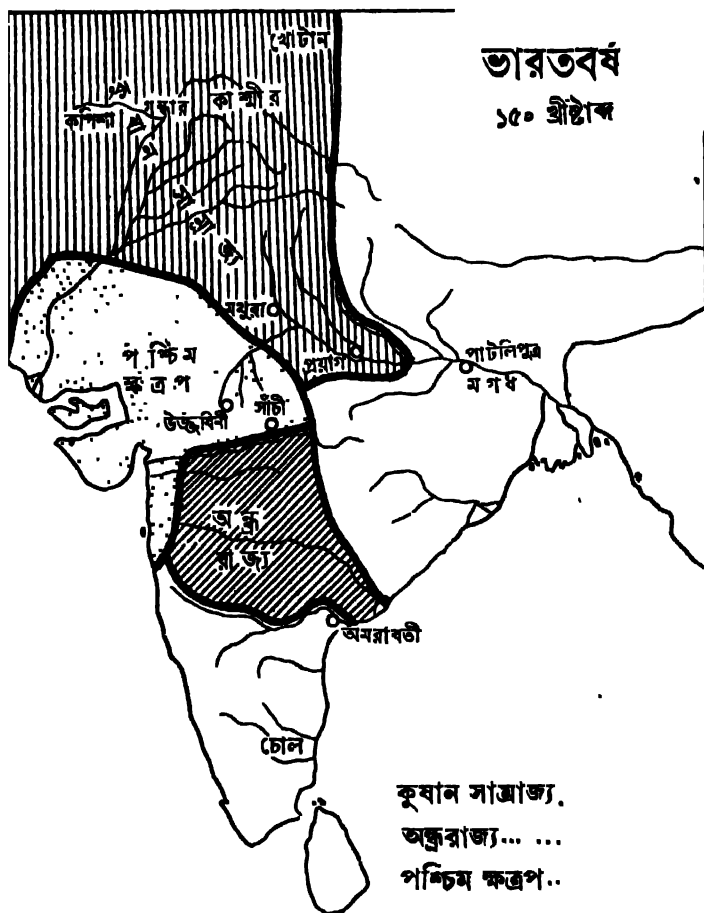
করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাতবাহনদের গৌরব শকদের আক্রমণের ফলে কিছুকাল ম্লান হইয়া যায়। পরে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি শক, যবন ও পহ্লবদের (পার্থিয়ান) দমন করিয়া সাতবাহনবংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির পুত্র পুলমায়ী পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগর (এখন ঔরঙ্গবাদ জেলায়) হইতে রাজ্যশাসন করিতেন। পৈঠান ছাড়া আরও দুইটি নগর—বৈজয়ন্তী ও অমরাবতী (গুন্টুর

জেলায়)—সাতবাহনদের আমলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি নামে একজন রাজা, বোধ হয় পুলমায়ীর ভাই, শক-ক্ষত্রপ (Satrap বা Governor) রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আত্মীয়তার জন্য রুদ্রদামন তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির আমলে সাতবাহনদের রাজগৌরব আবার উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, শক-ক্ষত্রপদের কবল হইতে উত্তর-কোঙ্কন পুনরধিকৃত হয়। কিন্তু শ্রীযজ্ঞের মৃত্যুর পর সাতবাহনদের ভাগ্যরবি অস্ত যায়। সাতবাহন-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, আভীর পল্লব বাকাটক ইক্ষ্বাকু শালঙ্কয়ন প্রভৃতিরা সেই সব খণ্ডরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসেন।

ভারতের ইতিহাসে সাতবাহনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উত্তরভারতের আর্যসংস্কৃতি এবং দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যবন্ধনের জন্য তাঁহারা যেন একটি সেতু রচনা করিয়াছিলেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর যে-সেতু একরকম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহারাই আবার মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কিছুকালের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিদেশী আক্রমণ

॥ বক্ত্রিয়ান গ্রীক ॥ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সম্রাট অশোক যখন রাজশক্তির উচ্চতম শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত তখন সেলুকাসের সাম্রাজ্য হইতে বক্ত্রিয়া ও পথিয়া নামে দুইটি প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইযা যায় এবং স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসকের অধীন হয়। হিন্দুকুশ ও অক্ষু বা অক্সাস নদীর মধ্যবর্তী বক্ত্রিয়া প্রদেশ ডিয়োডোটস নামে এক বিদ্রোহী বাজক্ষমতা দখল কবেন। কিন্তু অশোকের রাজত্বকাল পযন্ত এই গ্রীকদের দৃষ্টি ভারতের দিকে আর নিবদ্ধ হয় নাই। তাহার পরে সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিয়োকস কাবুল উপত্যকায় ভারতীয় রাজা সুভাগসেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। এই অভিযান স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরে বক্ত্রিয়ার চতুর্থ রাজা ডিমিট্রিয়স এত শক্তিশালী হইয়া ওঠেন যে সমগ্র আফগানিস্তান, এমন কি পাঞ্জাব ও পশ্চিমভারতের অনেকটা অংশ পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। ঐতিহাসিকরা কেহ কেহ বলেন যে, ডিমিট্রিয়স নামে দুইজন রাজা ছিলেন, প্রথম রাজা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, দ্বিতীয় রাজাই উক্ত রাজ্য দখল করিয়াছিলেন। হয় এই ডিমিট্রিয়স, না হয় পরবর্তী রাজা মিনাণ্ডার সুঙ্গদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন।

বক্ত্রিয়ান গ্রীক রাজাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন **মিনাণ্ডার**। ইনি ১৬০ হইতে প্রায় ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পোষক ছিলেন। নাগসেন-কৃত 'মিলিন্দ-পন্‌হো' নামে বৌদ্ধগ্রন্থে মিলিন্দের (মিনাণ্ডারের) প্রশ্ন ও উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে এবিষয়ে, তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও কৌতুহলের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ের বিচিত্র সব মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, কাবুল হইতে যমুনার দক্ষিণ অঞ্চলে পর্যন্ত। শোনা যায় মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া রাজ্যের বিভিন্ন নগবের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। বিদেশী গ্রীক রাজা ভারতীয় বৌদ্ধ হইয়া যে ভারতজনের বেশ প্রিয় হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তক্ষশিলাব এক গ্রীক রাজার দূত হইযা **হেলিয়োডোরস** মধ্যভারতে ভিলসার কাছে বেসনগরের রাজসভায় আসেন। সেখানে তিনি একটি বাসুদেব-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গরুড়ধ্বজ বাসুদেব-স্তম্ভ তাঁহার বিষ্ণুভক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

সংস্কৃতি-সংঘাত

এই সময় গ্রীক-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফলে গন্ধার-শিল্পের, বিশেষ করিয়া ভাস্কর্যেব আশ্চর্য বিকাশ হয। পেশোয়ার, কাবুল উপত্যকা এবং সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী পাঞ্জাবেব পশ্চিমাংশ হইতে এই সব ভাস্কর্যের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সবই বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত, জৈন বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কোন নিদর্শন নাই। অ্যাপোলো বা অন্যান্য গ্রীকদেবতার মতো বুদ্ধের মূর্তি হইলেও, ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু, ঘটনা ও চরিত্র সবই সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভাস্কর্য ছাড়া গ্রীক স্থাপত্যের কোন নিদর্শন ভাবতের এই অঞ্চলে পাওয়া যায় নাই।

বক্ত্রিয়ার গ্রীক রাজারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজশক্তিব প্রতীকস্বরূপ প্রতিকৃতি-অঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন। এই 'টাইপ' বা আকারের মুদ্রা গ্রীক রীতি অনুযায়ী ভারতে প্রবর্তিত হয়। বক্ত্রিয়ান রাজা ডিমিট্রিয়স প্রথমে এই ধরনের চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা ভারতে প্রচলন করেন, তাহার এক-দিকে গ্রীক, অন্যদিকে খরোষ্ঠীলিপিতে লেখা। এই দ্বিভাষী মুদ্রা পরবর্তী

গ্রীক রাজাদের আমলেও প্রচুর প্রচলিত হয়। এই সব মুদ্রা প্রধানত তামার, পরে রূপারও কিছু প্রচলন হয়। পরিকল্পনা গ্রীক, খোদাইয়ের কাজও গ্রীকশিল্পীরা অথবা তাঁহাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় শিল্পীরা করিয়াছেন। মুদ্রায় হেরাক্লিস, জীউস প্রভৃতি গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি একদিকে খোদিত, অন্যদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজা, ভারতীয় হাতী, বৃষ প্রভৃতি জন্তু অঙ্কিত। এই সব মুদ্রার মধ্যে মিনাণ্ডারের মুদ্রার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশী।

পার্থিয়ানদের অভিযান

বক্ত্রিয়ার গ্রীক রাজারা এক শতাব্দীর কিছু বেশী রাজত্ব করিয়া ১৪০ হইতে ১৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন। পার্থিয়ার রাজা মিথ্রিডেটিস তক্ষশিলা রাজ্য অধিকার করেন। এই অধিকার তাঁহারা বেশীদিন বজায় রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ভারতের সহিত পার্থিয়ার বা পারস্য রাজ্যের সম্পর্কের নিদর্শন-স্বরূপ 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' রাজ-উপাধিটি দীর্ঘকাল রহিয়া যায়।

এই পার্থিয়ান বা পহ্লব রাজাদের মধ্যে একজন ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহার নাম **গণ্ডোফার্নিস**। তাঁহার রাজত্বকাল ২০ হইতে ৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া অনুমান করা হয়। কান্দাহার, কাবুল, তক্ষশিলা জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইউরোপীয়দের কাছে এই ইন্দো-পার্থিয়ান রাজার উদ্ভট নামটি পরিচিত, কারণ তাঁহার রাজত্বকালে ও রাজ্যে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন শোনা যায় এবং এদেশেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণভারতে মায়লাপুরে (মাদ্রাজের কাছে) তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ইহার কোনটাই সত্য না হইতে পারে। তবে এই কাহিনীর ভিতরের তাৎপর্যটুকুর গুরুত্ব আছে। খ্রীষ্টধর্মের শৈশবকালে ভারতে তাহার প্রচার হওয়া অস্বাভাবিক নহে, এবং ধর্ম-বিষয়ে ভারতীয় শাসকদের উদারতার জন্য তাহার আদি প্রতিষ্ঠাও এদেশে সম্ভব।

শক অভিযান

পার্থিয়ান বা পহ্লবদের সহিত শকরা এইসময়ে ভারতে অভিযান করেন। ইতিহাসে অনেক সময় ইঁহাদের 'শক-পহ্লব' রাজা বলা হয়। শকরা

মধ্যএসিয়ার অধিবাসী। সেখান হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউ-চি বা অন্য কোন জাতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা দক্ষিণ-আফগানিস্তানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। তাহাদেব এই উপনিবেশের নাম শকস্তান, আধুনিক 'শিস্তান'। গ্রীক নাবিক ও ভৌগোলিকরা এই শকদের সিদীয়ান (Scythian) বলিতেন। সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিমভাবত পর্যন্ত ক্রমে ইহাদেব দখলে আসে, সেই জন্য এই অঞ্চলকেও গ্রীকবা 'সিদীয়া' বলিতেন। কয়েকজন শকরাজার নাম পাওয়া যায় ইতিহাসে, যেমন মোয়েজ, আজেস ইত্যাদি, কিন্তু মনে রাখিবার মতো নহে। তবে শক-পহ্লব রাজারা তাঁহাদেব সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ কবিয়া ক্ষত্রপ-অধীনে শাসন করিতেন। একটি ক্ষত্রপাধীন রাজ্য ছিল আফগানিস্তানে, একটি তক্ষশিলায়, একটি মথুরায়, একটি উত্তর-দাক্ষিণাত্যে এবং একটি উজ্জয়িনীতে। উত্তর-দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমভারতের ক্ষত্রপরা 'ক্ষহরাত'-জাতিভুক্ত ছিলেন। এই ক্ষহরাতরা শকদেরই একটি শাখা। ইহাবা সাতবাহনদের সাম্রাজ্যের একটি অংশ অধিকার করেন এবং ক্ষত্রপ নহপানের অধীনে ইহাদের রাজত্বগৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গৌতমীপুত্র শতকর্ণি কিভাবে ইহাদের পদচ্যুত কবিয়া সাতবাহনদের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধাব করেন তাহা আমবা আগে বলিয়াছি। উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদের প্রতিষ্ঠাতার নাম চস্তান। এই চস্তানের পৌত্র **মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন** (১৩০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শকরাজা বলিযা খ্যাত।

কুষানজাতির আগমন

পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম ভারতে শক-পহ্লব ক্ষত্রপদের ক্ষত্রতেজ ও ক্ষত্রবীর্য ম্লান হইতে না হইতে মধ্যএসিয়ার আর-একটি দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি ভারতে অভিযান করিতে আরম্ভ করে। **ইউ-চি** এই জাতির নাম। ইউ-চিদের একটি কৌম, গোত্র বা গোষ্ঠী হইল **কুষান**। কোন প্রতিকূল অবস্থাব চাপে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইহারা অক্সাস বা অক্ষুনদীর তীরে আসিয়া বসবাস করে। কুজুল কদফাইসেস নামে কুষানগোষ্ঠীর এক দলপতি প্রথমে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের পহ্লব ক্ষত্রপদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতসীমান্ত পর্যন্ত তিনি সহজেই অধিকার করেন। এই প্রথম-কদফাইসেসের উত্তরাধিকারী হন দ্বিতীয়-কদফাইসেস, ইনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

কুজুল কদফাইসেসের মুদ্রা

তাঁহার সময়ে মনে হয় মধ্যএসিয়ার কুষানজাতির ভারতীযকরণও (Indianisation) কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় কদফাইসেস শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রায় নিজেকে তিনি 'মহেশ্বর' বলিয়া প্রচার করিতেন।

ভারতগৌরব কনিষ্ক

দ্বিতীয় কদফাইসেসের উত্তরাধিকারী **কনিষ্ক** হইলেন কুষানবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিমান রাজা। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাব্দ গণনা কনিষ্ক প্রবর্তন করেন। ভারতীয় কালগণনায এই একটিমাত্র অব্দই শকদের স্মৃতিজড়িত এবং কনিষ্ক ছাড়া আর'কোন বিদেশী রাজা এইসময় কালগণনা প্রবর্তন করেন নাই। কনিষ্ক যদিও ঠিক শকবাজা নহেন, ইউ-চি জাতির কুষানগোষ্ঠীব রাজা, তাহা হইলেও পরবর্তীকালে মধ্যএসিয়া হইতে আগত সকল জাতিকেই ভাবতে 'শক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই কারণে কনিষ্ক প্রবর্তিত কালগণনা **শকাব্দ** নামে পরিচিত হইয়াছে। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাব্দের শুরু, অর্থাৎ শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ হইবে। শকাব্দের প্রবর্তন হইতে মনে হয় কনিষ্ক প্রথম শকাব্দের শেষে রাজা হইযাছিলেন।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন, কনিষ্ক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার হইতে। বৌদ্ধধর্মের পোষক ছিলেন বলিয়া এই পুরুষপুরে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে। কনিষ্কের সাম্রাজ্যের বিশালতা অনুমান করা যায় তাহার বিস্তার হইতে। গন্ধার হইতে অযোধ্যা ও বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভূস্বর্গ কাশ্মীরেরও রাজা ছিলেন তিনি। পূর্বভারতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত

তিনি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চীনের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া চীনা তুর্কীস্থানও তিনি রাজ্যভুক্ত করেন। খোটান, ইয়ারকন্দ, কাশগড প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া যায়। যুদ্ধযাত্রার সময় তিনি বাশিষ্ক ও হুবিষ্কের উপর (বোধ হয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র) রাজ্যভার দিয়া যাইতেন। দক্ষিণে নর্মদানদীর তীর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে শক-ক্ষত্রপরাজ্য মালব পর্যন্ত কনিষ্ক তাঁহার শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে কনিষ্ক স্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহার সাংস্কৃতিক কীর্তির জন্য, রাজনৈতিক কৃতিত্বের জন্য নহে।

বহির্বাণিজ্যের বিস্তার

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যেব যোগাযোগ হয় এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে চীন, গ্রীকরাজ্য, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রীকদের লেখায় ভারতীয় নাবিকদের দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার অনেক বিবরণ আছে। বৌদ্ধ জাতকেও ভারতীয় বণিকদের বিদেশে বাণিজ্যযাত্রার কাহিনীর অনেক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির স্মৃতিই এই সব রচনা ও কাহিনী বহন করিতেছে।

পশ্চিমএসিয়ার সহিত স্থলপথে ভারতের বাণিজ্য চলিত পারস্য, মেসোপোতামিয়া ও এসিয়া-মাইনরের ভিতর দিয়া। এপথ বহুকালের প্রাচীন পথ, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার কাল পর্যন্ত টানা যায়। চীনের সিল্ক বা রেশমের বাণিজ্যও এই পথ ধরিয়া চলিত। মধ্যে রোমের সহিত পার্থিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বাণিজ্যপণ্য ভারতের পশ্চিম-উপকূলস্থ বন্দরে চালান দেওয়া হইত, সেখান হইতে সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগর বা লোহিতসাগর অভিমুখে পাঠানো হইত। উপদ্বীপভারত বা দক্ষিণভারতের বাণিজ্য চলিত সমুদ্রপথে। পশ্চিম-উপকূলের বন্দর হইতে মিশরের ভিতর দিয়া ইউরোপ পর্যন্ত, পূর্ব-উপকূলের বন্দর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায়। অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের রচনা 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথি্রয়ান সি' (লোহিত বা লালসাগর) হইতে

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। 'পেরিপ্লাসে' ভারতের পশ্চিম-উপকূলস্থ যে সব বন্দর ও গঞ্জের নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে 'বারিগাজা' বা ভৃগুকচ্ছ (আধুনিক 'ভরোচ'—Broach) প্রধান, ইহা এখন ক্যাম্বে অঞ্চলে অবস্থিত। অভ্যন্তরে 'ওজেনী' বা উজ্জয়িনী ছিল বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। আরও দক্ষিণের দিকে পশ্চিম-উপকূলের বন্দর ছিল 'মুজিরিস' বা ক্র্যাঙ্গানোর (মালাবার কূলে)। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপণ্যের আদান-প্রদান চলিত এই সব বন্দর হইতে। আরব-বন্দর হইতে বণিকরা বাণিজ্যপোতে যাত্রা করিয়া মালাবার উপকূলে মুজিরিস বন্দরে ৪০ দিনে পৌঁছাইতে পারিতেন, অবশ্য বর্ষাকালে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। তারপর বাণিজ্যকর্ম চুকাইয়া তাঁহারা শীতকালে পৌষ-মাঘ মাসে আবার ফিরিয়া যাইতেন। রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যে এই অঞ্চলে বসবাসও করিতেন তাহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমান স্বর্ণমুদ্রায় ভারতের পণ্যের মূল্য শোধ করা হইত, এবং সেই মুদ্রা এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেডু (Arikamedu) বাণিজ্যকেন্দ্রে মাটি খুঁড়িয়া রোমান মুদ্রার সহিত রোমান মৃৎশিল্পের নিদর্শনও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব-উপকূলস্থ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরের মধ্যে প্রধান ছিল মসলিপত্তন ও 'পডুচা' বা পণ্ডিচেরী। পেরিপ্লাসে 'তাম্রপর্ণী' বা সিংহলেরও উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত পশ্চিমে সূক্ষ্ম মসলিন, সুতির কাপড়, হাতীর দাঁতের জিনিস, মসলাপাতি, রেশম ইত্যাদি। পশ্চিম হইতে আমদানি হইত তামা, টিন, কাচের জিনিস, প্রবাল, রূপার জিনিস, এমন কি রাজা-মহারাজাদের জন্য সুন্দরী বিদেশী গায়িকা ও নর্তকী পর্যন্ত। এককথায় বলা যায় যে, রোম ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশে এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্যসূত্রে যেসব পণ্যের বিনিময় হইত তাহা প্রধানত বিলাসের সামগ্রী, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্য তাহার তুলনায় নগণ্য। রাজা-রাজড়ার বিলাসের জন্য ভারত হইতে বিদেশে এবং বিদেশ হইতে ভারতে শৌখিন সব পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইত।

কনিষ্ক ও ভারতসংস্কৃতি

সম্রাট অশোকের পর কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মকে রাজপোষকতায় সম্মানিত করিলেন। তাঁহার এই পক্ষপাত ও পোষকতার কারণ কি, বা প্রেরণা কোথা হইতে তিনি

পাইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার সময়ে কুষানরা অনেকটা ভারতীয় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে গণ্ডোফার্নিস, মিনাণ্ডার, কদফাইসেস প্রভৃতি বিদেশী বংশজাত রাজারা বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অশোকের কাল হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে গন্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে। গ্রীকদের হাতে তাহার রূপান্তরও ঘটিতে থাকে ধীরে ধীরে।

বৌদ্ধ মহাসংগীতি (Buddhist Council)

বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ তাঁহার তিরোধানের পর, কনিষ্কের পূর্বে, তিনদফায় সংকলিত হইয়াছিল। ইহার সূত্রপাত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্পকাল পরে রাজগৃহের মহাসংগীতিতে (আঃ ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ)। এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যসম্প্রদায়। তখনই নানাবিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। আরও একশত বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহা-সংগীতি আহ্বান করা হয়। তৃতীয় মহাসংগীতি আহূত হয় প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে (২৪৭ খ্রীঃ পূঃ)। কনিষ্ক যে বৌদ্ধ মহাসংগীতি আহ্বান করেন কাশ্মীরে তাহা চতুর্থ। কনিষ্কের পোষকতায় মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। মহাযানীরা কালের উপযোগী করিয়া বৌদ্ধধর্মকে ঢালিয়া সাজিলেন, বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ আঁকড়াইয়া রহিলেন না। বুদ্ধের নানা রকমের মূর্তি গড়া, এবং সেই মূর্তি ধ্যান ও পূজা করা ধর্মসম্মত বলিয়া মহাযানীরা মানিয়া লইলেন।

কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মের পোষকতা করিলেও, সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা সমান ছিল। তাঁহার প্রবর্তিত মুদ্রা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক, ইরানী বা পারসী, হিন্দু প্রভৃতি কোন ধর্মের দেবদেবীকে তিনি অবহেলা করেন নাই, সকলে তাঁহার মুদ্রায় স্থান পাইয়াছেন। এই দেবদেবীর প্রতি কনিষ্কের শ্রদ্ধা হইতে বোঝা যায় কেন তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। ধর্মোৎসাহের সহিত কনিষ্কের বিদ্যোৎসাহও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন তক্ষশিলা নগরে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কনিষ্কের আমলে তাহার খ্যাতি ও প্রাধান্য অনেক বাড়িয়া যায়। বেদ-বেদান্ত, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসাবিদ্যা, ইত্যাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল তক্ষশিলা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গন্ধার-রাজ্যে অবস্থিত বলিয়া গ্রীস, পারস্য, চীন প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার জন্য আসিতেন।

QUESTIONS

1. What were the causes of the decline of the Maurya Empire ?

2. Who were the Bactrian Greeks ? What were the cultural effects of their contacts with India ?

3. Who were the Kushans ? Who was the greatest Kushan king and why ?

4. Give a brief account of the new developments of Buddhism during Kanishka's reign.

5. Give a short account of trade and commerce in post Maurya period.

এই প্রশ্নের আলোচনাপ্রসঙ্গে রোমের সহিত বাণিজ্যের বিষয় এবং সেকালের বাণিজ্য-পথ ও বন্দরের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

6. Give an account of India's contacts with outside world during the post-Maurya period.

চীন ও মধ্যএসিয়ার সহিত সম্পর্ক, শিল্পকলা-সংস্কৃতির বিস্তার এবং প্রসঙ্গত রোমের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের বিষয়ও আলোচনা করিতে হইবে।

7. Write notes on :

(a) The Parthians ; (b) Gandhara art ; (c) The Saka Kshatrapas of Ujjaini , (d) The Sungas.

অষ্টম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ

মৌর্য রাজগৌরবের অবসানের পর প্রায় পাঁচশত বছর ভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। গুপ্তবংশের সঠিক উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু একটুকু জানা যায় যে, **চন্দ্রগুপ্ত** নামে এই বংশের তৃতীয় বংশধর প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজশক্তি ধারণ করেন। বিম্বিসারের মতো তিনিও বৈশালীর লিচ্ছবীবংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। লিচ্ছবীরা তখন বিহার ও নেপালের কতকটা অংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। পুরাণকাররা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর আগে তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণবিহার হইতে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজারা যে নূতন গুপ্তাব্দ প্রবর্তন করেন তাহা ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ। এই ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভার গ্রহণের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ধরা হয়। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁহার সভাসদ ও পরিবারের আত্মীয়জনদের ডাকিয়া কুমার সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

সমুদ্রগুপ্ত

গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যবংশের চন্দ্রগুপ্তের মতো প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। মৌর্যবংশের গৌরব ছিলেন যেমন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক, তেমনি গুপ্তবংশের গৌরব ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত।

CHAPTER VIII—The Guptas—Samudra Gupta, Chandra Gupta II, Kumara Gupta, Skanda Gupta and the Hunas—Fa Hien's account. Political disintegration after t[illegible]

আনুমানিক ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা হন এবং ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুদিন আগে মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোকের পর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এতবড় রাজপুরুষ আর কেহ রাজসিংহাসনে বসেন নাই।

পুরাণে এলাহাবাদ, অযোধ্যা পর্যন্ত গুপ্তরাজ্যের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের আমলে এই রাজ্যের যে বিস্তার হইয়াছিল তাহাতে রোহিলখণ্ড, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, পূর্ব-মালবের কতকাংশ, তাহার পাশাপাশি কয়েকটি অঞ্চল ও বাংলাদেশের কতকগুলি জেলা গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব অঞ্চল গুপ্তরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু ইহার বাহিরেও বিস্তৃত অঞ্চল গুপ্তরাজাদের শাসন-কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে মানিয়া চলিত। এই সব অঞ্চল গুপ্তরাজাদের প্রত্যক্ষ অধিকারে বা শাসনে ছিল না—সমতট (পূর্ববঙ্গ), ডবাক (আসামের নওগাঁ অঞ্চল), কামরূপ (পশ্চিম-আসাম), নেপাল, কর্ত্রীপুর (গাঢ়ওয়াল ও জলন্ধর), পূর্ব ও মধ্য-পাঞ্জাবের মালব ও পশ্চিম-ভারতের বহু উপজাতি-রাষ্ট্র—মালব, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর ইত্যাদি। সমুদ্র-গুপ্তের এই প্রতাপে ভয় পাইয়া কুষানদের বংশধররা, শক-ক্ষত্রপরা, সিংহল ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজারা তাঁহাকে নানারকমের উপঢৌকন, ভেট ইত্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এই দিগ্বিজয়ের পরেই সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অধিকার বাস্তবিকই সমুদ্রগুপ্ত নিজের বীর্য ও বুদ্ধি-বলে অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা', অর্থাৎ সকল রাজার উচ্ছেদকারী বলা হইয়াছে। তাঁহার 'প্রচণ্ডশাসনে' উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র ভারত নাকি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী প্রতিবেশী রাজারাও ভয়ে তাঁহাকে ভেট পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার কাছে উপঢৌকনসহ দূত পাঠাইয়াছিলেন, এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের পাশে সিংহলের যাত্রীদের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের যে কেবল ক্ষাত্রতেজই ছিল তাহা নহে, তাঁহার মতো প্রতিভাবান রাজা সেকালে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সভাকবি হরিসেন বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ ও

গুপ্ত সাম্রাজ্য
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে
মদ্রক
যোধেয়
সিন্ধু
কনৌজ
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
কর্ণসুবর্ণ
কামরূপ
সমতট
মহাকোশল
বাকাটক
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সমুদ্রগুপ্তের
দক্ষিণ অভিযান
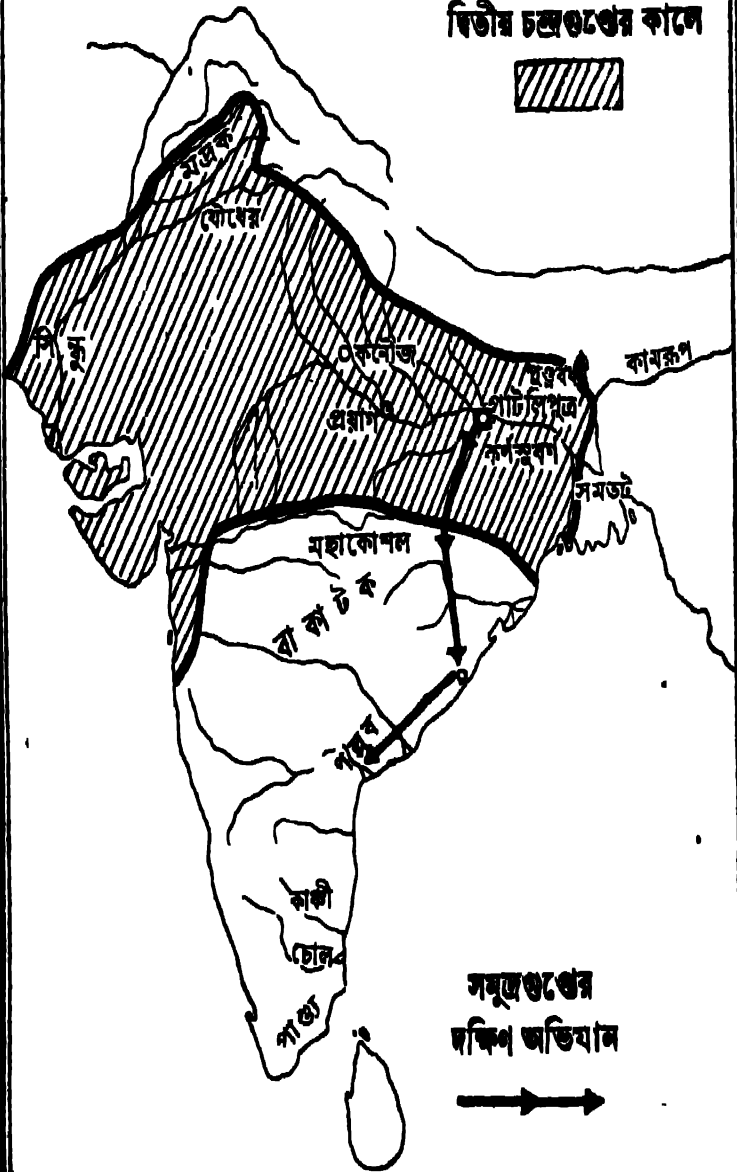
পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। কাব্য-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল, প্রশস্তিতে তাঁহাকে 'কবিরাজ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রশস্তির 'স্ফুট বহু কবিতা' কথা হইতে মনে হয় তিনি নিজেও উত্তম কাব্যবচনা করিতেন।

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা : বীণাবাদনরত। লক্ষ্মীমূর্তি

তাঁহার বাজসভায় কবি, শিল্পী ও বিদ্বৎজনেরা সমাদৃত হইতেন। তিনি যে শুধু সংগীতরসিক ছিলেন তাহা নহে, নিজেও বোধ হয় সংগীতচর্চা করিতেন। তাঁহার পৌরুষ ও বীরত্বের নিদর্শন-স্বরূপ যেমন তাঁহাকে বিভিন্ন মুদ্রায় ধনুর্বাণধারী, পরশুধারী ও ব্যাঘ্রহন্তারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তেমনি তাঁহার শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষরও রহিযাছে মুদ্রাব বীণাবাদক-মূর্তিতে।

ধর্মের দিক হইতে তিনি নিজে ছিলেন পরম হিন্দু, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক ও পোষক, কিন্তু অন্য কোন ধর্মেব প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। হিন্দুধর্মের যে প্রধান গুণ উদারতা ও সহনশীলতা, তাহা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও নূতন সমন্বয় যে গুপ্তরাজত্বকালে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সমুদ্রগুপ্তের চরিত্রে বহুবিধ গুণের সমন্বয়ের জন্য। রাজশক্তির সহিত তীক্ষ্ণ মনীষার এবং বিদ্যাচর্চার ও শিল্পসাধনার, কঠোর রাজকর্তব্যবোধের সহিত সুকোমল মানবিক বৃত্তির এরকম আশ্চর্য সমন্বয় আর-কোন সম্রাটের চরিত্রে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত

প্রথম-চন্দ্রগুপ্তের মতো সমুদ্রগুপ্তও তাঁহার পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তকে যোগ্যতম মনে করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আনুমানিক ৩৮০ হইতে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন।

তাঁহার অনেক মুদ্রাতে তিনি বিক্রমাদিত্য বলিয়াও পরিচিত। কথিত আছে, কোন এক চরিত্রহীন স্বেচ্ছাচারী শক-ক্ষত্রপকে তিনি এমন প্রচণ্ড শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, তাহার জন্য লোকে তাঁহাকে 'শকারি' (শক+অরি, শকদের শত্রু) বলিয়া সম্ভ্রম করিত। এই ঘটনা হইতে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে, পৌরুষ ও সাহসের দিক হইতে তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারিয়াছিলেন। রাজদণ্ড তাঁহার হাতে দিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভুল করেন নাই।

দিগ্বিজয়ের নীতি পিতার মতো তিনিও অনুসরণ করেন। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে, যখন যাহার দ্বারা সুবিধা, তিনিও তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজনৈতিক বিবাহ তখনকার দিনে রাজবংশে প্রচলিত ছিল, ভিন্ন রাজ্যের সহিত কূটনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাতবাহনরা পর্যন্ত বিদেশী রাজবংশের সহিত এই উদ্দেশ্যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। গুপ্তবংশের প্রথমচন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত কুমারী উপঢৌকন লইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কাজেই দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত পূর্বপুরুষদের নীতি অনুযায়ী উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের নাগপতিদের শান্ত করেন তাঁহাদের কন্যা কুমারী কুবেরনাগাকে বিবাহ করিয়া, এবং দাক্ষিণাত্যের দুর্ধর্ষ বাকাটক রাজবংশের সহিত বন্ধুত্ব করেন নিজের কন্যা প্রভাবতীকে রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ দিয়া। এইভাবে প্রবল রাজবংশগুলির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া এবং চারিদিকের বন্ধন দৃঢ় করিয়া দ্বিতীয়-

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা। রাজমূর্তি। লক্ষ্মীমূর্তি

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার মন্ত্রী বীরসেন ও সেনাপতি আম্রকার্দবের সহিত সসৈন্যে পূর্ব-মালবে অভিযান করিলেন। সেখান হইতে তিনি পশ্চিম-মালব ও কাথিয়া-

ওয়াড়ের শক-ক্ষত্রপ রাজত্বের শেষ অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা করেন। তাঁহার পবিকল্পনা যে সফল হইয়াছিল বাণ-রচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে যে বিখ্যাত নবরত্নসভা কি এই বিক্রমাদিত্যের? দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঐতিহাসিক দলিলে দেখা যায় পাটলিপুত্র ছাডাও দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তেব শাসনকেন্দ্র উজ্জয়িনীতেও ছিল। নবরত্ন-সভায় মহাকবি কালিদাস ও আচার্য বরাহমিহির ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা একসময়ের লোক বলিয়া মনে হয় না। ববাহমিহির ছিলেন আর্যভট্টের পরবর্তীকালের লোক, এবং আর্যভট্ট খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। টীকাকাব মল্লিনাথের কথা বিশ্বাস করিলে কালি-দাসকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিযা ধরিতে হয়। কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, তাঁহার রাজসভায় নবরত্ন শোভাবর্ধন করিতেন।

প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত

দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য ৪১৫ হইতে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উত্তরবঙ্গ হইতে কাথিয়াওয়াড, এবং হিমালয় হইতে নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য তাঁহার আমলে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি পূর্বপুরুষদেব মতো অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু নর্মদা-উপত্যকার পুষ্যমিত্র নামে এক পরাক্রান্ত জাতির লোকেরা তাঁহার রাজ্যে ঘোব উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদেব দমন করিয়াছেন রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত। পিতার মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্তই সিংহাসনের অধিকারী হন। ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। গুপ্তবংশের তিনিই শেষ বিখ্যাত রাজা। যদিও তাঁহার পরে গুপ্তবংশের রাজত্ব বিচ্ছিন্নভাবে আরও কিছুকাল চলিয়াছিল, তাহা হইলেও পূর্বপুরুষদের বা প্রধান শাখার মতো গৌরব কেহই অর্জন করিতে পারে নাই।

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে মধ্যএসিয়ার দুর্ধর্ষ হূনজাতি ভারতে হানা দিতে আরম্ভ করে। ভারত-সীমান্তে আবার দুর্যোগ ঘনাইয়া ওঠে। স্কন্দগুপ্ত অমিতবিক্রমে এই বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, এবং তাহার জন্য 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিও গ্রহণ করেন। এই উপাধির যে যোগ্য তিনি, তাহাতে

সন্দেহ নাই। মহেন্দ্রাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিত্যের যে কাহিনী 'কথাসরিৎসাগরে' বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই বিক্রমাদিত্য স্কন্দগুপ্তের স্মৃতি বহন করিতেছে।

কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতিক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও আদর্শ হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের এই আনুগত্য ও পোষকতার জন্য হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ধারা গুপ্তযুগে প্রায় অব্যাহত ছিল বলা চলে।

হূন-জাতির অভিযান

মধ্যএসিয়ার অর্ধ-বর্বর ও যাযাবর জাতিগুলি একাধিকবার ভারতে অভিযান করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আরও অনেক বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়াছে। এইবার হূনদের পালা। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূনরা প্রথম যে হানা দিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয়। কিন্তু গুপ্তসম্রাটের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষদিকে এবং ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় তাহাদের দুর্ধর্ষ অভিযান পুনরায় আরম্ভ হয়। মধ্যএসিয়া হইতে দলে দলে প্রপাতের মতো তাহারা পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলিতে এবং পূর্বে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নগর, রাজধানী ধ্বংস করিয়া, ধনসম্পদ লুট করিয়া, নরহত্যা করিয়া তাহাদের অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। তোড়মান ও মিহিরগুল নামে দুইজন দুঃসাহসী দলপতির নেতৃত্বে ভারতের কিছুটা অংশ তাহারা ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হয়। গুপ্তবংশের প্রধান শাখার শেষ নরপতি বুধগুপ্তের (৪৭৬-৭৭ হইতে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) মৃত্যুর পরে হূনরা শিয়ালকোট ও পূর্ব-মালব অঞ্চলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। হূনদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করেন দশাপুরের প্রতাপশালী হিন্দুরাজা যশোধর্মন। তাহা সত্ত্বেও উত্তরপশ্চিমে ও মালবতে হূন দলপতিদের অত্যাচার-উপদ্রব কিছুকাল চলিতে থাকে। ক্রমে তাহারা রাজপুতদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া যায়।

পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ

ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাল ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ভারতের বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ও বৌদ্ধশাস্ত্রের ('পিটক'-গ্রন্থের) সন্ধানে ফা-হিয়েন

চীনদেশ হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। পদব্রজে অধিকাংশ পথ তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। পশ্চিম-চীন হইতে যাত্রা করিয়া তাকলামাকান বা গোবী মরুভূমির দক্ষিণ দিয়া, সা-চাউ ও লব-নোরের ভিতর দিয়া তিনি খোটানে আসেন। এই খোটান কুষান আমল হইতে বৌদ্ধধর্মের (মহাযান) অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। খোটান হইতে পামির অতিক্রম করিয়া তিনি সোয়াট এবং ক্রমে তক্ষশিলা ও পুরুষপুরে (পেশোয়ার) আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর পূর্বভারতে পাটলিপুত্রে (পাটনা) আসিয়া তিন বছব এবং তাম্রলিপ্তিতে (পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার তমলুক) দুই বছব অবস্থান করেন। তমলুক তখন সমুদ্রকূলে প্রধান বন্দর ছিল। ভারতে তাঁহার সঠিক অবস্থানকাল ৪০১ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এবং এই সময়টি ছিল গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তেব রাজত্বকাল।

ফা-হিয়েনের বিবরণে জানা যায় যে, মগধ বা দক্ষিণ-বিহারের নগরগুলি বেশ বড ছিল, লোকজনের ধনসম্পদেরও প্রাচুর্য ছিল। দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল অনেক, বড বড রাজপথের উপব পর্যটকদের জন্য সরাই ও বিশ্রামাগার থাকিত। রাজধানীব মধ্যে চমৎকার একটি হাসপাতাল ছিল চিকিৎসার জন্য, বিনা পয়সায় সেখানে চিকিৎসা করা হইত। উদারহৃদয়, সুশিক্ষিত নাগরিকেরা অর্থ দান করিয়া হাসপাতালটি চালাইতেন। পাটলিপুত্র নগরের শ্রী ও সমৃদ্ধি তখনও ম্লান হয় নাই। এই পাটলিপুত্রে ফা-হিয়েন দুইটি বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন, একটি হীনযানীদের, আর একটি মহাযানীদের। প্রায় ৬০০-৭০০ বৌদ্ধ শ্রমণ এই বিহারে থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ আচার্যও ছিলেন। বহুদূর হইতে শিক্ষার্থীবা তাঁহাদের কাছে বিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিতেন। ফা-হিয়েন নিজে এই প্রাচীন রাজধানীতে তিন বছর থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করেন।

সিন্ধু অঞ্চল হইতে মথুরা যাইবার প্রায় ৫০০ মাইল পথের উপর, যমুনার তীরে, ফা-হিয়েন বহু বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। এই সব বিহারে হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। এদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও উদার শাসনব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় খুশী হইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে লোকজনেরা স্বাধীনভাবে চলাচল করিতে পারিত, তাহার জন্য কোন ছাড়পত্র

বা অনুমতির প্রয়োজন হইত না। অপরাধের জন্য দণ্ড হইত জরিমানা, প্রাণদণ্ড সাধারণত দেওয়া হইত না। সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্মের জন্য অপরাধীকে বিকলাঙ্গ করা হইত। রাজার আয় হইত প্রধানত ভূমি-রাজস্ব হইতে। রাজার রক্ষী ও কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাইতেন।

ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে সারা দেশব্যাপী লোকজন অহিংসার আদর্শ মানিয়া চলিত, জীবহত্যা করিত না। সুরা, পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদিও তাহারা খাইত না। কাহাকেও তিনি শূয়োর বা মুরগি পালন করিতেও দেখেন নাই, বাজারে গোমাংসের দোকান বা মদের ভাটিখানাও তাঁহার নজের পড়ে নাই। ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি যাহারা এই শুদ্ধাচার পালন করিত না তাহাদের সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য করা হইত।

রাজনীতিক অবনতি। গুপ্তযুগের অবসান

অর্ধবর্বর দুর্ধর্ষ হূনদের ঘন ঘন আক্রমণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের দ্রুত ভাঙ্গন ধরিতে থাকে। মূল রাজবংশে বিভেদের ফলে তাহার আগেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়াছিল। হূনরা তাহাতে আঘাত হানিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। গুপ্তসম্রাটদের বংশধররা ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে, মালব ও মগধের গুপ্তরাজারা থানেশ্বরের নূতন পুষ্যভূতিবংশের রাজশক্তির সম্মুখীন হইতেছেন। গুপ্ত রাজশক্তির অবনতির সুযোগ লইয়া মন্দাশোরের যশোবর্মণ, মৌখরী ও পুষ্যভূতিবংশের রাজারা স্বাধীনভাবে মাথা তুলিবার চেষ্টা করেন। এদিকে পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের গৌড়ের অধিপতি জনৈক 'শশাঙ্ক' প্রবল হইয়া উঠিতে থাকেন। তবে মৌর্যযুগের অবসানের পর যেমন বিদেশীদের প্রভুত্ব কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুপ্তযুগের অবসানের পর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হূনরা ঠিক করিতে পারে নাই। তোড়মান, মিহিরগুলের দর্প দশপুর বা মন্দাশোরের বীর রাজারা চূর্ণ করিয়াছিলেন। হূনরা আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, কিছুদিন উপদ্রব করিয়াছে, স্থানীয় সামন্ত শাসকদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে উত্তর-পশ্চিমে ও মালবতে, অবশেষে রাজপুত জনগোষ্ঠীর সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

সম্রাট যে ঐশ্বরিক শক্তিরই মানবিক প্রকাশ, এই ধারণা গুপ্তযুগে বদ্ধমূল হইয়া ওঠে। এলাহাবাদের স্তম্ভপ্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও যম এই চারজন দিকপালের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের সবময় কর্তা ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান হইলেও সকলের বুদ্ধির অগোচর। ঈশ্বর হইয়াও তিনি যে সম্রাটরূপে মর্ত্য-লোকে বাস করিতেছেন তাহার কারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি জাগতিক কাজ তাঁহার করা প্রয়োজন। তদানীন্তন সাহিত্যে সম্রাটকে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার বলা হইয়াছে, এবং বিষ্ণুর মতোই তাঁহাকে 'শ্রী পৃথ্বীবল্লভ' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। রাজাকে ঈশ্বরেব সহিত তুলনা করার কারণ রাজশক্তির প্রচণ্ডতা ও একাধিপত্য।

শাসনকার্যের জন্য দেশ ভাগ করা হইয়াছিল বিভিন্ন ভুক্তি বা প্রদেশে। প্রদেশগুলি কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল, এবং 'বিষয়' গঠিত হইত কয়েকটি বীথী বা মণ্ডল বা মহকুমা লইয়া। বীথীর অন্তর্গত ছিল কয়েকটি চতুরক বা চৌকী। দেশবিভাগ এইভাবে কবা হইত :

ভুক্তি—বিষয়—বীথী—চতুরক

ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলিত **উপরিক**, ইনি ছিলেন প্রতিবাজ বা রাজপ্রতিনিধি। ইহাদের অধীনে থাকিতেন বিষয়পতি বা বিষযের প্রধান বাজকর্মচারী, **নিযুক্তক** বা আযুক্তকও বলা হইত। বীথী বা চতুরকের প্রধান কর্মচাবীকে কি বলা হইত তাহা জানা যায় নাই। কেন্দ্রীয শাসন শিথিল হইলে উপরিকেরা মধ্যে মধ্যে স্বাধীন হইয়া 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ কবিতেন, কখনও বা 'মহাসামন্ত' বলিয়া তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিতেন।

ভুক্তিপতি (উপরিক), **বিষয়পতি** (নিযুক্তক বা আযুক্তক) **বীথীপতি** সকলেই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে ভিতরের শাসনকার্য চালাইতেন। উপরিকের এই শাসনপরিষদের নাম ছিল **অধিষ্ঠানাধিকরণ**। চারজন প্রতিনিধি ইহার সভ্য হইতেন—

নগরশ্রেষ্ঠী বা শেঠদের (ব্যাঙ্কার) প্রতিনিধি
প্রথম-সার্থবাহ বা বণিক-সমাজের প্রতিনিধি

প্রথম-কুলিক বা উৎপাদকশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং
প্রথম-কায়স্থ বা 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' বা রাষ্ট্রের চীফ সেক্রেটারি।

বিষয়পতির শাসনপরিষদেব নাম ছিল **বিষয়াধিকরণ**, বীথীর শাসনপরিষদের নাম ছিল **বীথ্যধিকরণ**। বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বীথীব এবং বীথীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইত। পবিষদের গঠনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত, ব্যাঙ্কার বা মহাজনশ্রেণী (capitalists), বণিকশ্রেণী (merchants), উৎপাদকশ্রেণী (producers) কেহই বাদ যাইত না। গুপ্তযুগে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (local administration) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না হইলেও এই গণতান্ত্রিক আদর্শ অনেকটা মানিয়া চলা হইত।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় (central administration) গণতান্ত্রিক নীতি বিশেষ মানিয়া চলা হইত না। তবে একচাকায় ভব দিয়া যেমন চলা যায় না, তেমনি শুধু একজন রাজার উপর নিভব করিয়াও শাসন চলে না। রাজাদেব মন্ত্রণা দিবার জন্য মন্ত্রীদের প্রয়োজন হইত। গুপ্তসম্রাটরাও মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের উপর বিভিন্নবিভাগের কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হইত। এই সব বিভাগের মন্ত্রীদের মধ্যে **সন্ধিবিগ্রহিক** (যুদ্ধ, শান্তি ও সন্ধি বিষয়ের মন্ত্রী), **অক্ষপটলাধিকৃত** (দলিলপত্রের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজকর্মচারীরা প্রধানত সামবিক বিভাগের অধীন ছিলেন। অবশ্য সামরিক (military) ও বেসামরিক (civil) বিভাগের কর্মচারীদের কর্তব্যেব মধ্যে তখন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এই সামরিক অধিনায়কের মধ্যে **মহাবলাধিকৃত** ও **মহাদণ্ডনায়ক** প্রধান, ইঁহারা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচারও করিতেন। সচিব বা মন্ত্রীর পদ সাধারণত বংশানুক্রমিক ছিল। **কুমারামাত্য** নামে একশ্রেণীর অমাত্য ছিলেন, মনে হয় তাঁহারা রাজবংশজাত। প্রাদেশিক বা স্থানীয় শাসনের জন্য ভুক্তি ও বিষয়াদির অধিপতি যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা কোন প্রদেশের বা বিশেষ অঞ্চলের ব্যক্তি ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাজার মনোনীত ব্যক্তিও হইতেন।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থার কাঠামোটিকে গ্রহণ করিয়া গুপ্তযুগে তাহার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয়

শাসন, প্রাদেশিক শাসন, আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসন একটি বিশাল আমলা-অমাত্যগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হইত। আমলারা তখন বিভাগীয় বৃত্তি বংশানুক্রমে পালন করিতে করিতে প্রায় স্বতন্ত্র জাতিতে বর্ণে (caste) পরিণত হইয়াছেন। প্রায় দুইশত বছর গুপ্তসম্রাটদের অধীনে কাজ করিয়া তাঁহাদের রাজানুগত্যও বর্ণানুগত্যের মতো অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পানিক্কর তাই বলিয়াছেন, "The two hundred years of Gupta rule may be said to mark the climax of Hindu imperial tradition"

সমাজ ও অর্থনীতি

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে তাহার অর্থনীতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না, যদি অবশ্য দেশের লোক সে সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেশের লোক যে সমাজকল্যাণকর কাজকর্মে কতদূর উৎসাহী হইয়াছিল গুপ্তযুগে তাহা ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে বোঝা যায়। পাটলিপুত্রের দাতব্য-চিকিৎসালয় তাহার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। বড় বড় রাজপথের মধ্যে মধ্যে পথিকদের জন্য বিশ্রামাগার ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা আর একটি দৃষ্টান্ত। এগুলি কেবল সমাজচেতনার নহে, বৈষয়িক সমৃদ্ধিরও পরিচায়ক।

গুপ্তযুগে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌরাষ্ট্র প্রদেশ ও আরবসাগরের বন্দরগুলি গুপ্তসম্রাটদের অধিকারভুক্ত হওয়ার জন্য পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদ এই সর্বপ্রথম উত্তরভারতে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহার ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে ভারতের সহিত ইউরোপের যে বাণিজ্যের লেনদেন হইত সমুদ্রপথে, তাহা দক্ষিণভারতের বন্দরে ও নগরে। সমৃদ্ধিশালী বন্দর ও বাণিজ্যনগর তাহার ফলে দক্ষিণভারতের উপকূলে বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে। মৌর্যযুগেও সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত কলিঙ্গদেশের বন্দর হইতে এবং তাহা প্রধানত পূর্ব-দেশের সহিত, পশ্চিমের সহিত নহে। গুপ্তসম্রাটরা সমুদ্রপথে পশ্চিমের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ সর্বপ্রথম স্থাপন করেন, কারণ সৌরাষ্ট্র প্রদেশ ও ভরোচ বন্দর তাঁহাদের শাসনাধীনে ছিল। দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের ও অন্যান্য গুপ্তসম্রাটদের

পশ্চিমের সহিত ভারতের
'প্রাচীন বাণিজ্যপথ'
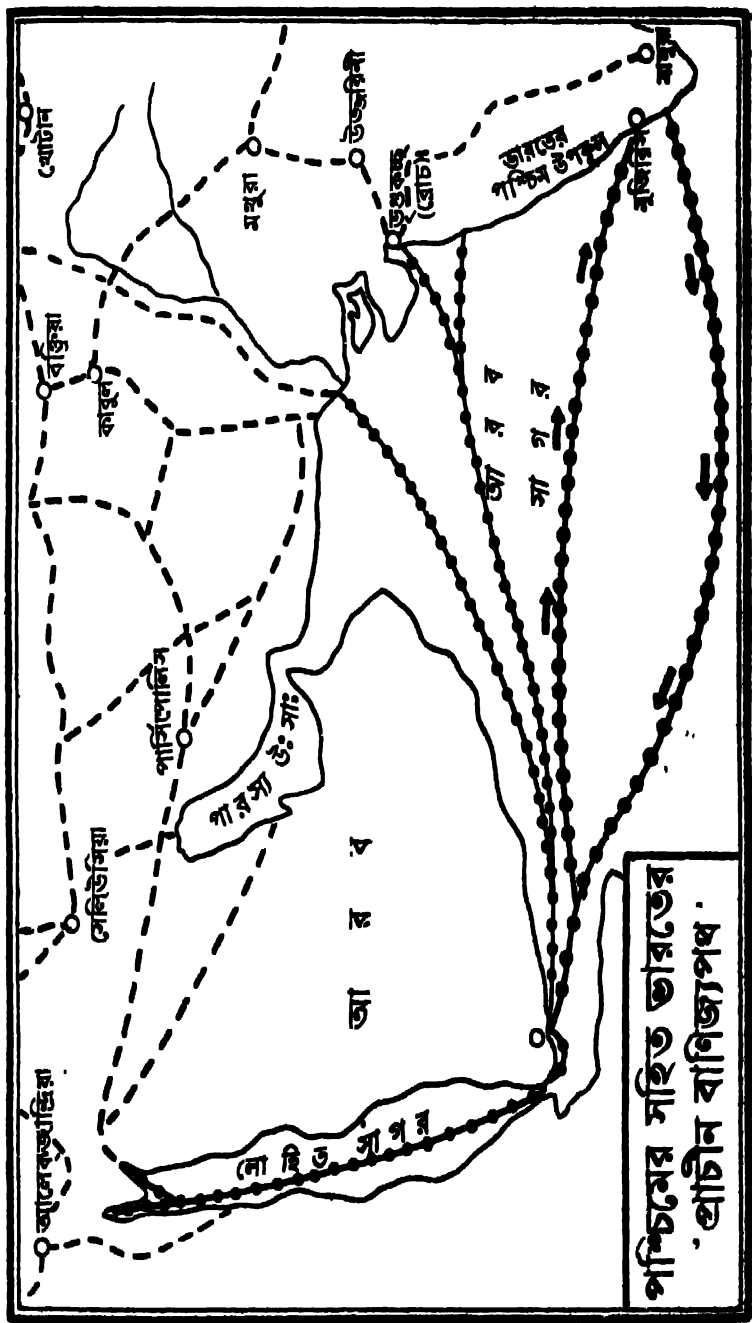
মুদ্রা-সংস্কার এবং বিনিময়োপযোগী স্ট্যাণ্ডার্ড স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন বাণিজ্যের লেনদেনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ

গুপ্তসম্রাটরা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিলেও তাঁহারা যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মেরও যে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল, চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের পাটলিপুত্র ও যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহারের বিবরণ হইতে তাহা বোঝা যায়। গুপ্তসম্রাটরা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক বলিয়া যদি বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী হইতেন তাহা হইলে ফা-হিয়েন এদৃশ্য হয়ত দেখিতেই পাইতেন না, এবং তাঁহার পরে হিউয়েন-সাঙ্ বা আই-সিঙও দেখিতেন না। রাজপোষকতায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা সুঙ্গ, কাণ্ব ও সাতবাহনদের আমল হইতেই হইয়াছিল, গুপ্তযুগে তাহার পরিপূর্ণ বিচিত্র প্রকাশ হয়। হিন্দুধর্মের ধারাটিই প্রবল হইয়া ওঠে। হিন্দুধর্মের পুনর্জীবনে সাধারণ লোক-চিত্তের গভীরে যে সাড়া জাগিয়াছিল, ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবধর্মের জয়যাত্রায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগে শৈবধর্মেরও বিকাশ হইয়াছিল। গুপ্ত-রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেবতা শিবের বেশ আধিপত্য ছিল। পাশুপত বা শৈব আচার্যদের কথা গুপ্ত-যুগের লিপিতে বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। বরাহমিহির, বাণভট্ট—ইঁহাদের রচনাতেও শৈবদের উল্লেখ আছে। উত্তরপশ্চিমের বিদেশাগত রাজাদের মধ্যেও শৈবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দুই ধর্মেরই বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। তবে বিষ্ণুপূজা ও বৈষ্ণবধর্মের যেরকম স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হইয়াছিল সেরকম শিব, ব্রহ্মা বা আর কোন দেবতার হয় নাই।

সাহিত্যচর্চা

গুপ্তযুগকে সংস্কৃত-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পাণিনির পরে প্রাচীন সংস্কৃতভাষার প্রায় পাঁচশত বছর ধরিয়া ক্রমবিকাশ হয়, এবং গুপ্তযুগে ইহা সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। গুপ্তরাজসভায় কবিদের যে সমাদর ছিল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তখন সভাকবিরা অন্তত রাজা ও তাঁহার

পারিষদদের উৎসাহে রীতিমত কাব্যচর্চা করিতেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন তাঁহার প্রশস্তিলেখক কবি হরিসেন। দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত পিতার মতো কাব্যানুরাগী ছিলেন এবং কবি বীরসেনকে তিনি সচিবের সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহাকবি কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ তাঁহার কালেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কাব্যগৌরব যদি গুপ্তসম্রাটদের প্রাপ্য নাও হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের সাহিত্য-কীর্তির মহিমা বিশেষ ম্লান হয় না।

সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল রামায়ণ মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদির সংস্কার-সাধন, সম্পাদন ও সংযোজন। গুপ্তযুগে পণ্ডিতেরা এই বিরাট কাজটি সম্পূর্ণ করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অধিকাংশ বড় বড় পুরাণ আজ আমরা যে রূপে দেখিতেছি, প্রায় দেড়হাজার বছর আগে গুপ্তযুগে এইভাবে সেগুলিকে রূপায়িত করা হইয়াছিল। ভারতের এই প্রাচীনতম জাতীয় মহাকাব্য ও পুরাণাদির নবরূপায়ণ না হইলে গুপ্তযুগে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতির যে পুনরুজ্জীবনের সূচনা হইয়াছিল তাহা কখনই সার্থক হইত না।

মুদ্রারাক্ষসম্, মৃচ্ছকটিকম্, নৈষধবধকাব্য, উত্তররামচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের বিকাশ হইয়াছিল গুপ্তযুগে। বিশাখদত্ত, শূদ্রক, ভারবী, ভবভূতি প্রমুখ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল এই সময়। সংস্কৃতভাষায় কাব্য, নাটক, শিল্পকলা, শাস্ত্র ইত্যাদির নিয়মিত চর্চা ও রাজপোষকতার ফলে সংস্কৃত সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল।

বিজ্ঞানচর্চা

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আদিযুগ বলিয়াও গুপ্তযুগ স্মরণীয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগের দ্বিপ্রহরকালে ভারতের এই বিজ্ঞানযুগের শুভসূচনা। গণিত-শাস্ত্রে শূন্যতত্ত্ব (theory of zero) এই যুগের একটি মহাবিষ্কার বলা চলে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যুগের অগ্রগতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আর্যভট্ট (পাটলিপুত্রে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী তাহার নিজের মেরুরেখার (axis) চারিদিকে ঘুরিতেছে, এবং দিনের সময় গণনাও তিনি যাহা করেন তাহা একেবারে নির্ভুল না হইলেও, ভুল সামান্যই ছিল। সেদিনের এই গণনা জ্যোতির্বিদের কাছে মহাবিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল। আর্যভট্ট সূর্যচন্দ্র-গ্রহণাদিরও

পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং তিনিই প্রথম গণিতবিদ যিনি দশমিক-প্রথা (decimal system) প্রয়োগের কথা বলেন, যদিও এই প্রথা তাঁহার আগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বরাহমিহিরও বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। হিন্দুসমাজে নবজীবনের স্পন্দন হইতেই গুপ্তযুগে বিজ্ঞানসাধনার এই প্রেরণা আসিয়াছিল।

শিল্পকলা

সমাজ ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির এই উন্নতি ও সমৃদ্ধি যে শিল্পকলাতেও প্রতিফলিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সর্বক্ষেত্রেই শিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্য ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্পানুরাগ সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন বৌদ্ধশিল্পের, তেমনি হিন্দুশিল্পের বিকাশ হইয়াছিল। শিল্পীদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফূর্তি সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সারনাথে, বুদ্ধগয়ায়, অজন্তা ও ইলোরায় তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন আজও সংরক্ষিত রহিয়াছে। ভূমরার শিবমন্দির, ঝাঁসীর অন্তর্গত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির গুপ্তযুগের বিশিষ্ট স্থাপত্যকীর্তি। দেবালয়, স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণে, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির ভাস্কর্যে, গুহাগাত্রের চিত্রকলায় ভারতীয় শিল্পের যে সবল ও সাবলীল প্রকাশ দেখা যায়, তাহা গুপ্তযুগে সামাজিক নবজাগরণের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য ও আদর্শ শিল্পীরা পুনরাবিষ্কার করিয়া তাহার উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগ কেন স্বর্ণযুগ?

একজন বিচক্ষণ ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—"the Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean age is in the history of Greece"—প্রাচীন ভারতে গুপ্তযুগ গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিয়ান যুগের সহিত তুলনীয়। গ্রীসে যেমন পেরিক্লিয়ান যুগে শিল্পকলা দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার ফলে গ্রীকসংস্কৃতি

নবজীবন লাভ করিয়াছিল, গুপ্তযুগেও ভারতে তাহাই হইয়াছিল। সমাজে, ব্যবসাবাণিজ্যে, রাষ্ট্রশাসনে, ধর্মজীবনে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় গুপ্তযুগে যে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কথা আগে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গৌরব ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস, ঐতিহ্যবোধ ও জাতীয় চেতনার দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে 'প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে থানেশ্বর নগরে (দিল্লীর কাছে) পুষ্যভূতি-রাজবংশের উদ্‌ভব হয়। এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন গুর্জর ও হূনদের পরাজিত করিয়া গুজরাট ও মালব পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের সহিত কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়া তিনি রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র—রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজা হন। এই সময় মালবরাজ দেবগুপ্ত যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণকে হত্যা করিয়া রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। ভগিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ে অধীর হইয়া রাজ্যবর্ধন কনৌজ অভিযানে মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। শেষকালে গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অগ্রজের মৃত্যুর পরে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। ভগিনী রাজ্যশ্রীকে তিনি বিন্ধ্যাঞ্চল হইতে উদ্ধার করেন এবং ভগিনীপতি গ্রহবর্মণের মৃত্যুতে কনৌজের শূন্য রাজসিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত হন। থানেশ্বর ও কনৌজ একই রাজার অধীনে আসে, আবার মধ্যদেশে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সম্ভাবনার সহিত আবার এক নূতন সমৃদ্ধিশালী যুগের অভ্যুদয়েরও আভাস পাওয়া যায়।

QUESTIONS

1. Give an estimate of Samudragupta as a man and a ruler.

2. Discuss the role of Samudragupta and Chandragupta II as empire-builders.

3. Give a brief sketch of the administrative system under the Guptas.

4. Give a short account of the social and economic conditions of India under the Guptas.

5. "The Gupta Age was an Age of Hindu Renaissance" or "The Gupta Age was a Golden Age in Ancient India." Discuss.

গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের রূপান্তর (বৈষ্ণবধর্ম, ভাগবত), সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পকলার অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমে সংক্ষেপে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কথা বলিয়া পরে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা সংগত।

নবম অধ্যায়

হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল বহু গৌরবময় কীর্তিতে মুখর। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে তাঁহার অগ্রজের হত্যাকারী গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া ওঠেন। সুতরাং হর্ষবর্ধনের কীর্তি-কলাপের বিবরণ দিবার আগে গৌড়বঙ্গের অবস্থা কি ছিল, শশাঙ্কের পরিচয় কি, এবং বাংলার প্রতিবেশী কামরূপ (আসাম) ও উড়িষ্যার রাজনীতিক অবস্থা কি ছিল তাহা জানা দরকার। কারণ উত্তরভারতের সহিত পূর্বভারতের রাজনীতিক প্রতিযোগিতায় এই সময় গৌড় বা বাংলাদেশ, কামরূপ, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাধীন রাজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

পশ্চিমভারতে বলভীর রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। উত্তরভারতে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য হন। দাক্ষিণাত্য জয় করিবার ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণভারতে প্রতাপশালী একাধিক রাজবংশের আবির্ভাব হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে চালুক্যবংশের কীর্তিমান রাজা দ্বিতীয়-পুলকেশী নর্মদার তীরে হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য-অভিযান প্রতিরোধ করেন। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। কাজেই হর্ষের সাম্রাজ্যসীমা উত্তরভারতের

CHAPTER IX—(a) Harshavardhana, Harsha's empire.
(b) Cultural life, Universities, Taxila, Nalanda,
(c) Hiuen Tsang, Banabhatta.
(d) Bengal—Sasanka.
(e) Assam and Orissa.

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁহাকে যে "সকলোত্তরাপথেশ্বর" (সমস্ত উত্তরাপথের অধীশ্বর) বলা হয় তাহা ঠিক কিনা বলা যায় না। তবে উত্তরভারতের বৃহত্তম অঞ্চল জুড়িয়া তিনি গুপ্তসম্রাটদের পরে একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের কতকাংশ, মথুরা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র, গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যার কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল মনে হয়।

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে, হর্ষবর্ধন ভারতের পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত অবাধ্য ও বিরোধী রাজাদের দমন করিতে প্রায় সারাজীবন ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার গজারোহী ও অন্যান্য সৈন্যরা সাজসজ্জা ছাড়িবার সময় পায় নাই। ৫,০০০ গজারোহী, ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া তিনি অভিযান আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার গজারোহীর সংখ্যা ৬০,০০০ এবং অশ্বারোহীর সংখ্যা এক লক্ষ হয়। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার উত্তর ভারত বিজয় একরকম শেষ হইয়া যায়, তারপর তাঁহার অভিষেক-উৎসব হয়, যদিও ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শেষ যুদ্ধাভিযানের কথা জানা যায় গঞ্জামে। ৬৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজধানী কনৌজ। প্রাচীন কান্যকুব্জে বা কনৌজে হর্ষ তাঁহার রাজধানী গড়িয়া তোলেন। প্রায় চার মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া এই রাজধানীটি বড় বড় অট্টালিকা, বৌদ্ধবিহার ও হিন্দুমন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। পঞ্চম শতকে যে কনৌজে দুইটি মাত্র বৌদ্ধবিহার ছিল, সেই কনৌজে হর্ষের রাজত্বকালে শতাধিক বৌদ্ধবিহার এবং তাহারও অধিক হিন্দু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কনৌজ-বাসীদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংখ্যার মধ্যে খুব বেশী তারতম্য ছিল না। উত্তরভারতে পাটলিপুত্রের পরে এতবড় সমৃদ্ধিশালী রাজধানী আর গড়িয়া ওঠে নাই। ষোড়শ শতকে শেরশাহের আমলে কনৌজ ধ্বংস হয়। বর্তমানে কনৌজ বা তাহার আশেপাশে কোথাও হর্ষের আমলের কোন অট্টালিকা, বিহার বা মন্দিরের নিদর্শন নাই।

বাণভট্ট। হর্ষবর্ধন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। ভারতের বড় বড় রাজাদের প্রায় সকলেরই এই সদ্‌গুণ ছিল দেখা যায়। সমুদ্রগুপ্ত যেমন নিজে
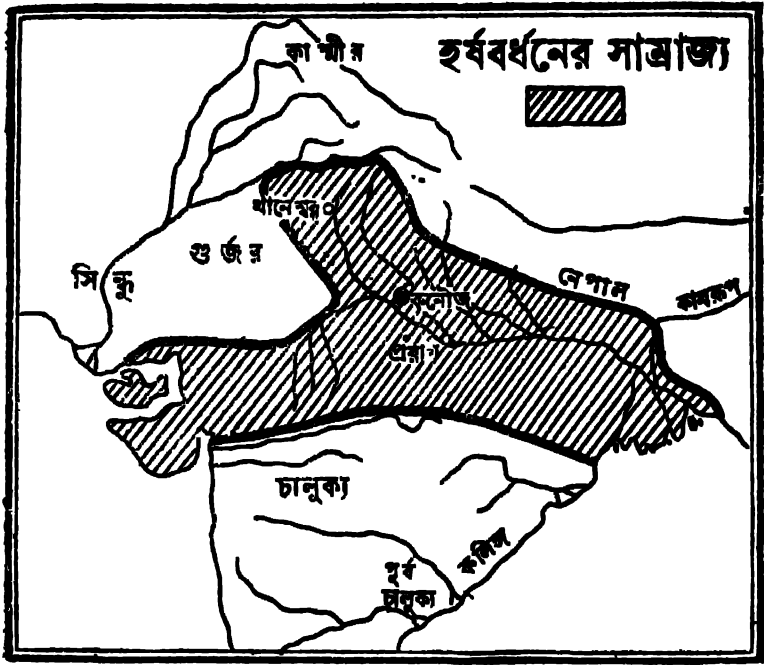
কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন, হর্ষবর্ধনও তেমনি নিজে সাহিত্যচর্চা করিতেন। তাঁহার রচিত 'রত্নাবলী, 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক সুধীসমাজে আজও সমাদৃত হয়। 'নাগানন্দ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ পর্যন্ত হইয়াছে। বাণভট্ট ছিলেন তাঁহার সভাপণ্ডিত। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' রচনা করিয়া তিনি অমর হইয়া আছেন। 'কাদম্বরী' গদ্যভাষায় রচনার অনবদ্য নিদর্শন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় কীর্তির মধ্যে অন্যতম। 'হর্ষচরিতের' ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্রাট হর্ষবর্ধন বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিহারে রাজগৃহের (রাজগীর) মাইল ছয়-সাত উত্তরে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হয়। ভারতের ও ভারতের বাহিরের রাজাদের পোষকতায় এবং বিত্তবানদের অর্থসাহায্যে ক্রমে নালন্দা একটি বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ-ছয়শত বছর ধরিয়া ইহার গৌরব ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। নালন্দা অঞ্চল

খুঁড়িয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই বিদ্যালয়ের যেসব ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা দেখিবার মতো। দেখিলে আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেব অবাক হইতে হইবে।

নালন্দায় অন্তত আটটি কলেজ দেশ-বিদেশের রাজাদেব সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নালন্দার ভগ্নচিহ্ন দেখিয়া বোঝা যায় যে, কলেজগুলি সারিবদ্ধ-ভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল, সুন্দব চতুষ্কোণ আকারে, এবং একটি অন্তত চারতলাবিশিষ্ট ছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্যা অনুশীলনের অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল নালন্দায়। 'রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' ও 'রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি পাঠাগার বা পুথিশালা ছিল (মুদ্রিত বইয়ের পাঠাগার নহে)। রত্নের সাগর, রত্নের মহাসাগর, রত্নের সংগ্রহ—এই নাম হইতে বোঝা যায় যে, বই বা পুথিকে রত্নতুল্য মনে করা হইত। দশহাজাবের বেশী ছাত্র ও শিক্ষক নালন্দায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কবিতেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতে, মধ্যএসিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, চীন, কোবিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা এখানে আসিতেন। কেবল যে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের চর্চা হইত নালন্দায় তাহা নহে। হিন্দুধর্ম, দর্শন, ব্যাকবণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র ও বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকরা মধ্যে মধ্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত বিতর্ক করিতেন এবং বিতর্কের ভিতর দিয়া জটিল বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হইত।

নালন্দার উদার শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যক্ষেব নির্বাচন হইতে। অধ্যক্ষ ধর্মপাল দক্ষিণভাবতের কাঞ্চীবাসী ছিলেন। হিউয়েন সাঙের গুরু নালন্দার বিখ্যাত অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন বাঙালী, বাংলাদেশের সমতট অঞ্চলের রাজপুত্র। আর একজন বিখ্যাত আচার্য জীনমিত্র ছিলেন অন্ধ্রবাসী।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে ভারতবাসী ও বিদেশী আচার্য যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই নালন্দায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিব্বতে, জাভায়, সুমাত্রায়, চীনে, কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বাণী নালন্দার শিষ্যরা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। হিউয়েন সাঙের পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দিবেন না, তখন

আচার্য শীলভদ্র তাঁহাদের ডাকিয়া বলেন, "চীন একটা মহাদেশ, হিউয়েন সাঙ সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবেন, তাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।" হিউয়েন সাঙের শিষ্য-প্রশিষ্যরা একসময় কোরিয়া জাপান মোঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক বিকিরণকেন্দ্র হইয়াছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

তক্ষশিলা। প্রাচীন তক্ষশিলা নগরেও এইরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বেদ-বেদান্ত, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল সেখানে। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গন্ধার-রাজ্যে অবস্থিত বলিয়া তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীস পারস্য চীন প্রভৃতি দেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা অধ্যয়ন করিতে আসিত। প্রাচীন ভারতের অনেক রাজা ও রাজকুমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকাহিনী ও জীবনচরিত হইতে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের ভারতের চমৎকার একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া যায়। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিউয়েন সাঙ গন্ধার অঞ্চলে পৌছান এবং সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চীনে ফিরিয়া যান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর যান, এবং শিয়ালকোট ও জলন্ধর হইয়া কনৌজে আসেন। নেপালের বৌদ্ধতীর্থ ঘুরিয়া গঙ্গায় নৌকায় করিয়া প্রয়াগ ও বারাণসী আসেন, বুদ্ধগয়ায় যান। নালন্দায় দুইবার অবস্থান করিয়া, বাংলাদেশ ও আসাম ঘুরিয়া তিনি দক্ষিণে উড়িষ্যার ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে আসেন, এবং সেখানে পল্লবদের কাঞ্চী ও চালুক্যদের বাতাপী নগর ভ্রমণ করিয়া মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলে যান। সেখান হইতে আবার নালন্দায় ফিরিয়া আসেন। আচার্য শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কামরূপে ভাস্করবর্মণের রাজসভায় কিছুদিন এবং হর্ষবর্ধনের রাজধানীতে অবস্থান করেন। তাঁহার মতো এরকম ভারতদর্শন করা আর কোন চীনা পরিব্রাজকের ভাগ্যে ঘটে নাই।

ভারতের অনেক প্রাচীন নগর ও রাজধানী হিউয়েন সাঙ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তক্ষশিলা ও পুরুষপুর (পেশোয়াব) তখন হূন মিহিরগুলেব অভিযানে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রবরপুর (বর্তমান শ্রীনগর) তখন সমৃদ্ধিশালী নগর, কিন্তু জলন্ধর ও মথুরার শ্রী ম্রিয়মাণ। হর্ষেব রাজধানী কনৌজ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের শিখরে প্রতিষ্ঠিত (পূর্বে তাহাব যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হিউয়েন সাঙের)। প্রয়াগ (এলাহাবাদ) বেশ বড নগর, হিন্দুসভ্যতাব প্রধান কেন্দ্র, একমাত্র বারাণসী তাহার সহিত তুলনীয়। এইখানে হিন্দু সন্ন্যাসীদের কঠোর আত্ম-নিগ্রহের রূপ দেখিয়া চীনা পর্যটক বিস্মিত হইযাছিলেন। বারাণসীর শ্রীসম্পদ তাঁহাকে আরও মুগ্ধ করিয়াছিল। এত দেবালয়ের বিচিত্র সমাবেশ তিনি আর কোন নগরে দেখেন নাই। বিশাল বড় বড দেবালয়, কয়েকতলা বাডির মতো উঁচু, তাহার গায়ে ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন।

সম্রাট হর্ষবর্ধন ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন। কিন্তু ভারতেব অন্যান্য সম্রাটদের মতো তাঁহারও কোন ধর্মগোঁড়ামি ছিল না, হিন্দু দেবদেবীর পোষকতা ও উপাসনা করিতে তিনি সমান উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি শিবের উপাসনা কবিয়াছেন। প্রতিদিন তিনি শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভোজনে তৃপ্ত করিতেন। প্রত্যেক রাজ-উৎসবে বুদ্ধের সহিত শিব ও বিষ্ণুকেও সমান মর্যাদা দেওয়া হইত। তিনি মহাযান বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং হিউয়েন সাঙকে সঙ্গে লইয়া নিজে তাহাতে যোগ দেন। এই সভায় চীনা পরিব্রাজক মহাযান বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া সুনাম অর্জন করেন।

কনৌজের সম্মেলনের পর হর্ষ প্রয়াগে উপস্থিত হন, চীনা শ্রমণকে সঙ্গে লইয়া। পাঁচ বছর অন্তর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে 'মহামোক্ষ' উৎসব করা হইত। হর্ষের রাজত্বকালে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত পাঁচবার এইরকম উৎসব হইয়াছিল। প্রথম দিন বুদ্ধ, দ্বিতীয় দিন সূর্য, তৃতীয় দিন শিবের উপাসনা করিয়া হর্ষবর্ধন জাতিধর্মনির্বিশেষে সাধুসন্ন্যাসী ও গরীবদুঃখীকে ধনসম্পদ বিতরণ করিতেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ 'মহামোক্ষ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ৭৫ দিনব্যাপী। পাঁচলক্ষ নরনারী এবং হর্ষের করদ-রাজারা এই উৎসবে যোগদান করেন।

উত্তরভারতের ঐক্য ও সংহতির অবসান

৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ ৪১ বৎসর রাজত্ব করার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বহু সুকীর্তির জন্য কনৌজরাজ অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। হর্ষবর্ধনেব জাদুকরী ব্যক্তিত্ব, তাঁহার উদাব চরিত্র ও গভীর পাণ্ডিত্য সকলকে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পযন্ত যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের সৌধ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বন্ধনে দাঁড়াইয়া ছিল, কোন মজবুত রাষ্ট্রশক্তির ভিতের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। কামরূপ, গৌড়বঙ্গ হইতে মগধ, বলভী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা নামে মাত্র হর্ষের আনুগত্য স্বীকার করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাহাবা কেহ কোনদিন হর্ষের কেন্দ্রীয় রাজশক্তিতে আস্থা স্থাপন কবিতে পারেন নাই। পূর্বগামী গুপ্তসম্রাট বা মৌর্যসম্রাটদের মতো মর্যাদা ও প্রভুত্বশক্তি কোনটাই হর্ষ দাবী করিতে পারেন না। তিনি বালুচরের উপব জোড়াতালি দিয়া তাঁহাব সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সংহতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তরভারতের সর্বত্র স্থানীয় রাজারা আত্মপ্রাধান্যের বিরোধে মত্ত হইলেন, তাসের ঘরেব মতো সাম্রাজ্যসৌধ ভাঙিয়া পড়িল, সংহতি ও ঐক্য নষ্ট হইল।

শশাঙ্ক ও গৌড়বঙ্গ

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর মন্দাশোরের যশোধর্মণ নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সুদূর ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার জয়যাত্রার খবর পাওয়া যায়। ইহা সত্য হইলেও তাঁহার রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। এই ব্যর্থতার সুযোগে উত্তরভারতে ছোট ছোট রাজ্যের স্বাধীন রাজারা মাথা চাড়া দিয়া ওঠেন। তাঁহাদের মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতিরা, কোশল বা অযোধ্যার মৌখরীরা এবং মগধ ও মালবের পরবর্তী গুপ্তরাজারা (মূল গুপ্তরাজবংশের বিচ্ছিন্ন শাখা) প্রধান। উত্তরভারতের এই স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তে বাংলাদেশও উৎসাহিত হয়। এই সময় (ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে) 'বঙ্গ' (পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) ও 'গৌড়' (উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ) নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশে। ধর্মাদিত্য,

গোপচন্দ্র, সমাচারদেব—ইহারা ছিলেন বঙ্গ-রাজ্যের স্বাধীন রাজা। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়রাজ্যের রাজা।

কিন্তু শশাঙ্ক কি কারণে মালবরাজ দেবগুপ্তের পক্ষে যোগদান করিয়া শেষ পর্যন্ত থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী হইয়াছিলেন? 'বঙ্গ' অঞ্চলে যতটা নহে, গৌড় বা উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুপ্তরাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। মগধ ও গৌড়ের আধিপত্য লইয়া গুপ্তশাখার রাজাদের সহিত মৌখরীদের অনবরত বিরোধ ও যুদ্ধ হইত।

শশাঙ্কের মুদ্রা। বৃষপৃষ্ঠে শিব। লক্ষ্মীদেবী

ঐতিহাসিকরা কেহ কেহ মনে করেন যে, গুপ্তশাখার (পরবর্তী-গুপ্ত—Later Guptas) অধীনে শশাঙ্ক গৌড়রাজ্যের শাসক ছিলেন, কেহ বলেন যে তিনি গুপ্তবংশজাতও হইতে পারেন। এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

হর্ষবর্ধনের চরিতকার বাণভট্ট রাজা শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম', 'দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ' ইত্যাদি কটুবাক্যবিদ্ধ করিয়াছেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু দুরাত্মা শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন।" শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্যাতনের কথা চীনা পরিব্রাজক বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাণভট্টের নিন্দনীয় বিশেষণ এবং হিউয়েন সাঙের অভিযোগ হর্ষবর্ধনের প্রতি অন্ধ রাজানুগত্যের প্রকাশ এবং গৌড়বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্কের প্রতি ক্রুদ্ধ আক্রোশ ছাড়া আর কিছু নহে। চীনা পরিব্রাজকের অভিযোগ সত্য হইলে তিনি শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পদিন পরে গৌড়ে, রাঢ়দেশে (পশ্চিমবঙ্গে) ও মগধে সুসমৃদ্ধ জনপূর্ণ সংঘারাম ও বিহার দেখিতে পাইতেন না।

বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেব বলিয়া তিনি নিজের পরিচয়

দিতেন। চীনা শ্রমণ তাঁহাকে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বলিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি, ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। হর্ষচরিতকারের মতে শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি। এই সব উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, শশাঙ্ক মগধ গৌড ও রাঢ়দেশ (পশ্চিমবঙ্গ) নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া নাকি শপথ করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না তিনি তাঁহার অগ্রজের শত্রুদের শায়েস্তা করিতে পারিবেন ততদিন ডানহাতে কোন খাদ্য মুখে দিবেন না। হর্ষবর্ধন গৌড়বঙ্গে যুদ্ধযাত্রাকালে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন। সুদূর প্রান্তের কামরূপ হইতে থানেশ্বরের কথা চিন্তা করিয়া ভাস্করবর্মা যে হর্ষের দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, সোনার দেশ গৌড়বঙ্গের দিকে তাঁহার লুব্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন যখন রাজা হন শশাঙ্ক তখন কামরূপ ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ভাস্করবর্মা ভাবিয়াছিলেন যে, হর্ষের সহিত হাত মিলাইয়া শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারিলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। ৬১৯ হইতে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনসময় শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে গৌড়রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধন অধিকার করেন।

শশাঙ্কের নামে যেসব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহার একদিকে নন্দীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি, অন্যদিকে পদ্মাসীনা লক্ষ্মীমূর্তি। শশাঙ্ক যে শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন তাহা তাঁহার মুদ্রায় বৃষভবাহন মহাদেব দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ধর্মমতের জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করেন নাই। হর্ষের অনুচর বৌদ্ধরা সোৎসাহে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি 'গৌড়ভুজঙ্গ' বা "দুরাত্মা" ছিলেন না, গৌড়জনপ্রিয় স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। স্বাধীনচেতা প্রতাপশালী নৃপতিরূপে বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন এবং থাকিবেন।

উড়িষ্যার ইতিহাস

উড়িষ্যার ইতিহাস এইখানে ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ প্রতিবেশী কামরূপ ও গৌড়ের কথা যখন বলিতে

হইতেছে তখন উড়িষ্যার কথা কিছুটা জানা দরকার। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দক্ষিণে কোঙ্গোদ-মণ্ডল (গঞ্জাম) মাধববর্মা নামে শশাঙ্কের এক সামন্তরাজের অধীনে ছিল। সাধারণভাবে উড়িষ্যা ছিল শশাঙ্কের সাম্রাজ্যাধীন। কিন্তু উড়িষ্যার স্বাতন্ত্র্যেরও ইতিহাস আছে এবং তাহা আরও প্রাচীন।

উড়িষ্যা প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরে গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে উৎকল (গঞ্জাম) ও গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত ছিল প্রাচীন কলিঙ্গের সীমানা। ওড্র-দেশ, উৎকল—এগুলিও উড়িষ্যার প্রাচীন নাম। মনে হয়, ওড্র কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বাসভূমি হইতে রাজ্যের নাম হইয়াছে, যেমন বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র ইত্যাদি জনগোষ্ঠী হইতে প্রাচীন জনপদের নাম হইয়াছিল বাংলাদেশে।

সম্রাট অশোকের কলিঙ্গরাজ্য জয়ের কথা আমরা জানি। কলিঙ্গ যে সহজে তাঁহার পক্ষে জয় করা সম্ভব হয় নাই, কলিঙ্গপতি ও তাঁহার প্রজারা যে অশোকের অভিযান প্রাণপণে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধে বিপুল হতাহতের সংখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়। কলিঙ্গপতি কাহারা ছিলেন?

খণ্ডগিরি-উদয়গিরি

ভুবনেশ্বর হইতে মাইল তিন পশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে দুইটি বেলেপাথরের পাহাড় বা টিলা আছে। এই পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি 'গুম্ফা' বা গুহাবাস আছে। গুম্ফা বা গুহাগুলির নামও আছে, যেমন হাতিগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, সর্পগুম্ফা, গণেশগুম্ফা, রানীগুম্ফা ইত্যাদি। হাতিগুম্ফার মধ্যে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহা উড়িষ্যার বা কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান উৎস বলা চলে। এই হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গে খারবেল অথবা ভিক্ষুরাজ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি 'চেত' (বা চেদী?) বংশজাত। এই চেতবংশের উদ্ভব হয় আনুমানিক ২২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। চেত-রাজবংশের তৃতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন খারবেল। ২৪ বছর বয়সে আনুমানিক ১৮৫-৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে খারবেল কলিঙ্গের রাজা হন। এই হিসাব হইতে মনে হয় খারবেল-এর পিতামহের রাজত্বকালে অশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হয়ত স্বাধীনচেতা রাজাকে মৌর্যরাজের অধীন করিবার জন্য।

রাজা খারবেল

খারবেল অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইবার বাসনা তাঁহারও হইয়াছিল। হাতিগুম্ফা লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বের একাদশ বর্ষে, আনুমানিক ১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি তামিলদেশের একটি রাষ্ট্র-জোট আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। লিপিতে 'ত্রমিরদেশসংঘাতম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাণ্ড্যদেশ হইতে তিনি কলিঙ্গে মণিমুক্তা, হাতিঘোড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন (নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী: *A History of South India*—সপ্তম অধ্যায়)। রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে খারবেল মগধে অভিযান করেন এবং মগধের রাজাকে (বোধ হয় শুঙ্গ রাজা কেহ) সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদেব বিরুদ্ধেও তাঁহার যুদ্ধাভিযানের কথা জানা যায়। খারবেল-এর সময়ে কলিঙ্গের রাজধানীতে প্রায় ৩৫০,০০০ লোকের বাস ছিল এবং পাটলিপুত্রের পরে পূর্বভারতে **কলিঙ্গ** ছিল অন্যতম রাজধানী।

খারবেল ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। জৈন শ্রমণদের বসবাসের জন্য তিনি খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে কতকগুলি গুহাবাস নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গুহাবাসগুলি 'গুম্ফা' নামে পরিচিত। কয়েকটি গুম্ফা দোতলা-গৃহের মতো—যেমন রানীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী। গুম্ফাগুলি প্রাচীন স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। ব্যাঘ্রগুম্ফার প্রবেশপথে পাহাড় কাটিয়া হিংস্র ব্যাঘ্রের নখদন্ত বাহির করা হইয়াছে। গুহাগৃহ সারবন্দী করিয়া সাজানো ও স্তম্ভবিশিষ্ট, সামনে বারান্দাও আছে। গুহাগাত্রে যে খোদিত ভাস্কর্য আছে তাহাতে হিন্দু দেবদেবীর চিত্রই বেশী। খারবেল-এর পরে বিভিন্ন সময়ে এগুলি খোদাই করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন চিত্রও ইহার সহিত মিশিয়া আছে। গুহাস্থাপত্য প্রাচীন, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকের, কিন্তু গুহাভাস্কর্য আরও পরবর্তীকালে, প্রায় সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, খোদিত হইয়াছে মনে হয়। প্রায় ছয়-সাতশত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি মিউজিয়াম উদয়গিরি-খণ্ডগিরি।

অন্যান্য লিপিতে খারবেল রাজার পরে বক্রদেব ও বাড়ুখ নামে একজন রাজা ও রাজকুমারের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় খারবেল-এর রাজত্বের পর চেতবংশের দ্রুত পতন হয়। তারপর কলিঙ্গের বা উড়িয়্যার দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ প্রায় ছয়-সাতশত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে উড়িয়্যা কিছুকাল গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের অধীন ছিল।

আসাম

গৌড়বঙ্গের স্বাধীন শক্তিশালী রাজা শশাঙ্ককে শাসনাধীনে আনিবার জন্য থানেশ্বরপতি হর্ষবর্ধন কামরূপের শাসক ভাস্করবর্মণের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন। একথা আগে বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, ভাস্করবর্মণ কে, এবং কামরূপের (আসামের প্রাচীন নাম 'কামরূপ') ইতিহাস কি ? হঠাৎ কামরূপ কোথা হইতে ভাস্করবর্মণের অধীনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ? কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর'। মহাভারতের কাল হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও তাহার রাজা ভগদত্তের নাম পাওয়া যায়। নরক রাজার পুত্র ভগদত্ত, ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত ইত্যাদি। ভাস্করবর্মণ এই নরক রাজার বংশধর।

কামরূপের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত শশাঙ্ক তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। ভাস্করবর্মণ (৬০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তাই প্রতিশোধ লইবার জন্য শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের বিরোধের সময়। কর্ণসুবর্ণ তিনি দখল করিতে সমর্থ হন। 'হর্ষচরিত' ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে ভাস্করবর্মণ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। ভাস্করবর্মণের পর বর্মণবংশের দ্রুত পতন হয় এবং শালস্তম্ভ, ব্রহ্মপাল প্রভৃতি রাজবংশ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন।

QUESTIONS

1. Give an estimate of Harshavardhana as a man and a ruler.

2. Give a short account of Sasanka of Bengal, with reference to his conflicts with Kanauj and Kamrup.

3. Write notes on :

   (a) Hiuen-Tsang's account
   (b) Kharavela of Kalinga
   (c) Banabhatta
   (d) Bhaskarvarman of Kamrupa

দশম অধ্যায়

দক্ষিণভারত

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয়-পুলকেশীর সহিত হর্ষবর্ধনের বিরোধ ও যুদ্ধের কথা আমরা জানি। সাতবাহনদের পর দাক্ষিণাত্যে বাকাটক রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করেন, তারপর যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে চালুক্য রাজারা প্রধান। চালুক্যরা ছাড়া অল্পকালের মধ্যে রাষ্ট্রকূটরা, এবং আরও দক্ষিণাংশে তামিলদেশে কাঞ্চীর পল্লব, মাদুরার পাণ্ড্য ও চোল রাজারা প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। উত্তরভারতে গুপ্তযুগের অবসানের পর যখন বিভিন্ন রাজ্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং থানেশ্বর-কনৌজের উত্থান ও পতন হইল, তখন দক্ষিণভারতেও দেখা গেল বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে আত্মপ্রাধান্যের সংগ্রাম চলিতেছে।

চালুক্য রাজবংশ

চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম-পুলকেশী ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদামীর কাছে পাহাড়টিকে একটি দুর্গে পরিণত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পুত্র প্রথম-কীর্তিবর্মন (৫৬৬-৭) বনবাসীর কদম্ব, কোঙ্কনের মৌর্য ও বাস্তার নলদের পরাজিত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়-পুলকেশীর বয়স অল্প ছিল বলিয়া তাঁহার ভাই মঙ্গলেশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু মঙ্গলেশ তাঁহার নিজের পুত্রকে রাজা করিবার সংকল্প করিলে খুড়া-ভাইপোতে বিরোধ ও যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে মঙ্গলেশ নিহত হন। ৬০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়-পুলকেশী রাজা হন। 'পুলকেশী' কথার অর্থ তেজস্বী সিংহ। দ্বিতীয়-পুলকেশী তাঁহার কর্মজীবনে এই নাম সার্থক করিয়াছিলেন। কদম্ব, দক্ষিণ-

CHAPTER X—The Chalukyas, the Rashtrakutas, the Pallavas, the Cholas—Chola administration—the Pandyas. Life and culture in the South.

দক্ষিণভারতের মন্দির
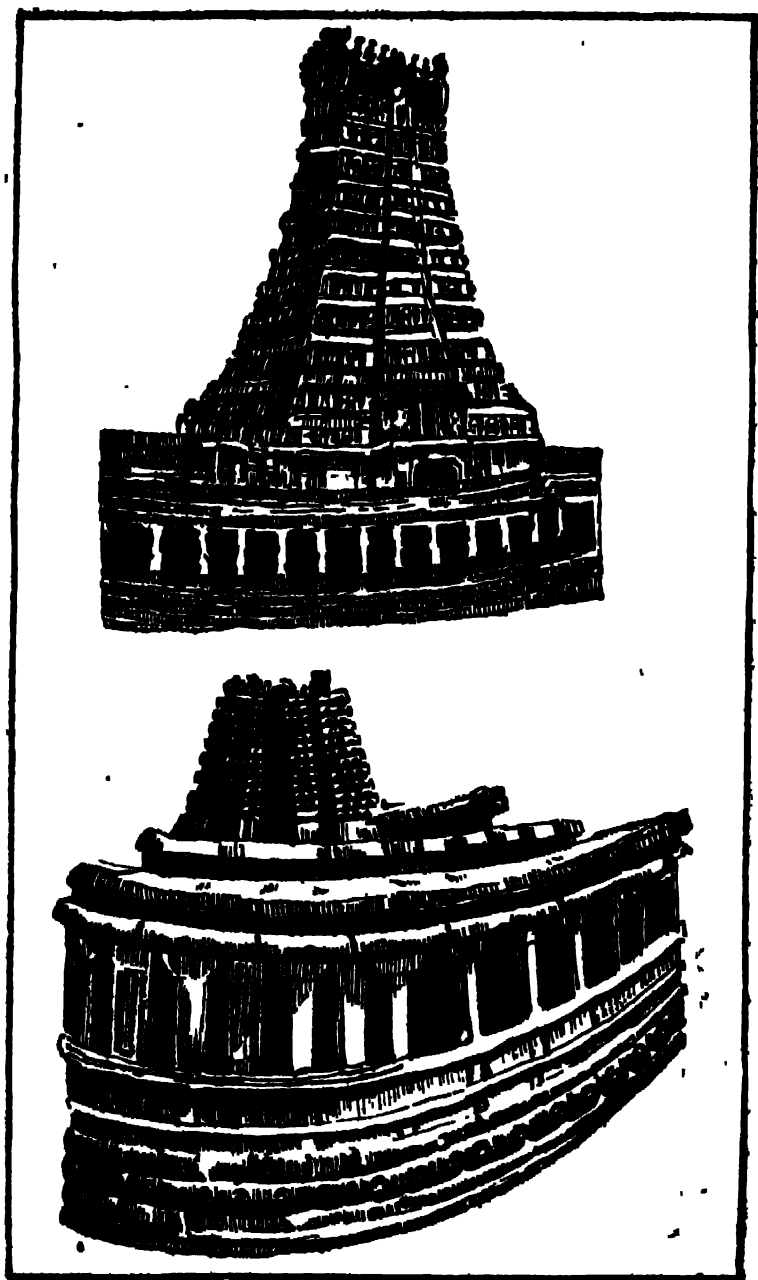
কানাডার আলুপ, মহীশূরের গঙ্গ প্রভৃতি রাজবংশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তর হইতে হর্ষবর্ধনের অভিযানও তিনি নর্মদার তীরে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

পল্লব রাজবংশ

তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে সাতবাহন-রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে পল্লবরা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্বে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০) কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চল দখল করিয়া পাণ্ড্য ও সিংহলের শাসকদের সহিত বিরোধ বাধাইলেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল 'অবনীসিংহ'। মামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরমের বরাহগুহার গায়ে সিংহবিষ্ণু ও তাঁহার পুত্র প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণ ৬০০-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার জন্য তিনি 'মত্তবিলাস', 'বিচিত্রচিত্ত', 'গুণভর' প্রভৃতি বহু কীর্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীর সহিত প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণের যে সংঘর্ষ হয় তাহাই দীর্ঘস্থায়ী চালুক্য-পল্লব বিরোধের সূচনা করে।

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র প্রথম-নরসিংহবর্মণও (৬৩০-৬৮) পুলকেশীর আক্রমণের সম্মুখীন হন, কিন্তু একাধিক যুদ্ধে তিনি পুলকেশীর সৈন্যদের পরাজিত করেন। কাঞ্চীপুরমের ২০ মাইল পূর্বে মণিমঙ্গলের যুদ্ধে পুলকেশীর প্রচণ্ড পরাজয় হয়। পরাজয়ের পর পল্লবরা তাঁহাদের পূর্বের অমর্যাদার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। চালুক্য-রাজধানী বাদামী ও তাহার দুর্গ নরসিংহ অধিকার করেন। ইহার পর বাদামী বা বাতাপিজয়ী বলিয়া নরসিংহ 'বাতাপিকোণ্ড' উপাধি পান।

৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়-মহেন্দ্রবর্মণ রাজা হন এবং তাঁহার সহিত চালুক্যরাজ প্রথম-বিক্রমাদিত্যের সংঘর্ষ হয়। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রবর্মণের রাজত্বকালে বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন। চালুক্য-পল্লব বিরোধ কিছুদিনের জন্য শান্ত হয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্যের রাজত্বকালে (৬৮১-৯৬)। বিনয়াদিত্য উত্তরভারত অভিযান করেন এবং তাহাতে তাঁহার পুত্র বিজয়াদিত্য যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান।

উত্তরভারতের মন্দির
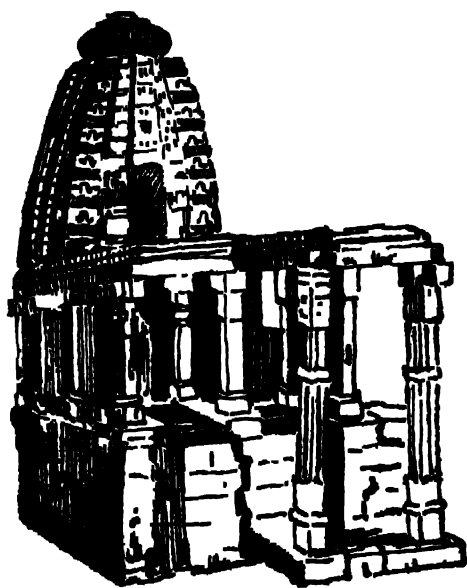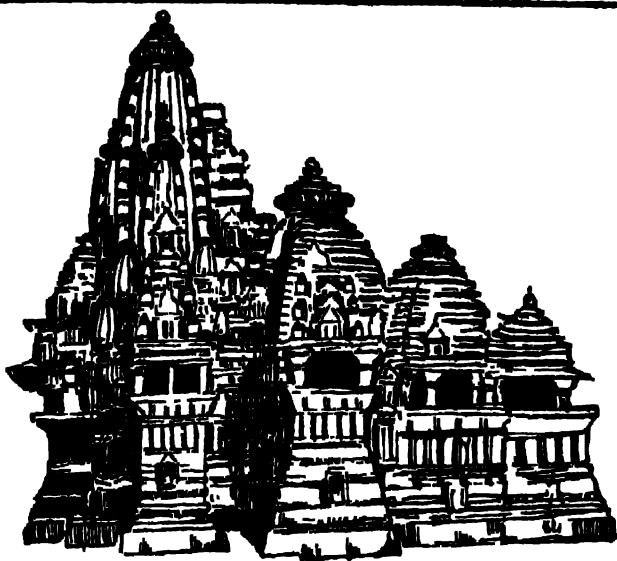
বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় (৬৯৬-৭৩৩)। তাঁহার শাসনকাল শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খ্যাত। এই সময় চালুক্যদের দেবালয় নির্মাণের স্বর্ণযুগ। বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য বহুবার পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন এবং কাঞ্চীপুরম পর্যন্ত অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়-কীর্তিবর্মণ বাদামির চালুক্যবংশের শেষ রাজা। রাষ্ট্রকূটবংশের অভ্যুদয়ে এই সময় চালুক্যবংশের পতন হয়।

রাষ্ট্রকূট রাজবংশ

রাষ্ট্রকূটবংশ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন বাদামির শেষ চালুক্যরাজ দ্বিতীয়-কীর্তিবর্মণের রাজত্বকালে। রাষ্ট্রকূটরা জাতিতে রাজপুত। দন্তিদুর্গ ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দেই ইলোরা দখল করিয়াছিলেন, এবং ৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিবর্মণকে শেষ আঘাত হানিয়া নিজেকে দাক্ষিণাত্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দন্তিদুর্গের দাপটে চালুক্যদের রাজ্যশ্রী ম্লান হইয়া যায়। মালবের গুর্জরদের, কোশল ও কলিঙ্গের শাসকদের দমন করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে দুর্ধর্ষ হইয়া ওঠেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পিতৃব্য প্রথম-কৃষ্ণ ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। চালুক্যদের নির্মূল করিয়া, দক্ষিণ-কোঙ্কন দখল করিয়া তিনি মহীশূরের গঙ্গারাজাদের মাথা হেঁট করেন। এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কৃষ্ণ ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরের নির্মাতা। কৃষ্ণের পর গোবিন্দ এবং গোবিন্দের পর তাঁহার ভাই ধ্রুব রাজা হন। ধ্রুব খুব যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। মালব জয় করিয়া তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব পর্যন্ত অভিযান করেন এবং সেখানে বাংলা-দেশের পাল রাজা ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। উত্তরভারত ও কনৌজের আধিপত্য লইয়া এই সময় হইতে রাজস্থানের প্রতিহার (বা পরিহার), বাংলার পালরাজারা ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। ইহাকে দক্ষিণভারতের চালুক্য-পল্লব-পাণ্ড্যদের বিরোধের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

চোল রাজবংশ

নবম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত (৮৫০-১২০০) প্রায় ৩৫০ বছরের দক্ষিণভারতের ইতিহাসকে চোলরাজশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলা যায়। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চল একরাজ্যভুক্ত করিয়া

প্রায় দুই শতাব্দীরও অধিককাল তাহা সুসংহত একটি কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অধীনে রাখার অতুলনীয় কৃতিত্ব চোলদের প্রাপ্য।

৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে বিজয়ালয় তাঞ্জোর অধিকার করিয়া এবং সেখানে 'নিশুম্ভসূদনী' দুর্গার মন্দির স্থাপন করিয়া চোল-রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘোষণা করেন। সম্ভবত বিজয়ালয় পল্লবদের একজন সামন্ত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র পরান্তক (৯০৭-৯৫৫) রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হন এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়কৃষ্ণ) কাঞ্চী ও তাঞ্জোর পর্যন্ত দখল করেন। পরান্তকের মৃত্যুর পর আরও ত্রিশ বছর (৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) চোল-রাজ্য সংকীর্ণ ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে এবং চোলরাজশক্তি মাথা তুলিতে পারে না।

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল। চোল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত গৌরবময় যুগের সূচনা হয় ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজরাজ চোলের সিংহাসন লাভের পর। ত্রিশবছরব্যাপী তাঁহার রাজত্বকাল (৯৮৫-১০১৫) চোলসাম্রাজ্যের গঠনের যুগ। রাজরাজের মৃত্যুর পর যুবরাজ **রাজেন্দ্র চোল** রাজা হন (১০১৪-৪৪)। রাজ্য-পরিচালনায় তিনি পিতার কীর্তিধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সিংহল আক্রমণ করিয়া তিনি দ্বীপটিকে সম্পূর্ণ দখল করেন এবং সিংহলরাজ পঞ্চমমহিন্দকে বন্দী করিয়া চোলদেশে পাঠাইয়া দেন। পাণ্ড্য ও কেরল সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া তিনি তাঁহার এক পুত্রকে 'চোল-পাণ্ড্য' উপাধি দিয়া 'প্রদেশ-শাসক' নিয়োগ করেন, তাহার শাসনকেন্দ্র হয় মাদুরা। তারপর চালুক্যদের ও পশ্চিম-

রাজেন্দ্র চোলরাজের মুদ্রা। বাঘ ও মাছ

গঙ্গরাজাদের আধিপত্য খর্ব করিয়া তিনি উত্তরপূর্বভারতে অভিযানের পরিকল্পনা করেন। চালুক্যরাজ জয়সিংহের সহিত হাত মিলাইবার জন্য তিনি পূর্ব-গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) অভিযান করেন। সেখান হইতে তাঁহার বিপুল সেনাবাহিনী বাংলাদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায়

দিকে অগ্রসর হয়। বাংলার পালরাজা মহীপাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়দেশ) শূররাজ রণশূর তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া রাজেন্দ্র **গঙ্গইকোণ্ড** উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিন-পল্লীর কাছে 'গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরম' নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

চোলদের শাসনব্যবস্থা

চোলরাজাদের শাসনব্যবস্থা যে খুব সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত ছিল তাহা চোলসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক সংহতি ও দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। উত্তরভারতে মৌর্য ও গুপ্ত যুগে যে বিরাট আমলা-প্রধান শাসনব্যবস্থার বিকাশ হইয়াছিল, দক্ষিণভারতে কেবল চোলযুগের শাসন-ব্যবস্থার সহিত তাহা তুলনীয়। সরকারী আমলারা এই সময় সমাজে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে (class) পরিণত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণী উচ্চ ও নিম্ন দুই স্তরে বিভক্ত ছিল। উচ্চস্তরকে বলিত **পেরুন্দনম্**, নিম্নস্তরকে বলিত **শিরুদনম্**। রাজকর্ম করিবার অধিকার কতকটা বংশগত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সামরিক ও অসামরিক কাজকর্মের মধ্যে পরিষ্কার কোন ব্যবধান ছিল না। রাজকর্মচারীদের অনেক সময় পদমর্যাদা অনুসারে ভূমিদান ('জীবিতম্' বলিত) করা হইত।

শাসনের সুবিধার জন্য এক-একটি বড় অঞ্চলকে **বলনাডু** বা 'মণ্ডলম্', **নাডু** ও **কুর্রম**—এইভাবে ভাগ করা হইত। বড় বড় নগরগুলিকে একটি 'কুর্রম্' বলিয়া গণ্য করা হইত, তবে তাহাকে বলা হইত 'তনিয়ুর' বা 'তঙ্কুরম্'। ভূমিরাজস্বই ছিল রাজকীয় আয়ের প্রধান উৎস। সেইজন্য খুব যত্ন করিয়া জমির মালিকানা, রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদির দলিলপত্র রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। নিষ্কর ও করদ জমির আলাদা হিসাব রাখা হইত। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে বসতির অংশ ('উর নত্তম'), দেবালয়, জলাশয়, খাল-নালা, পারিয়াদের বসতি ('পরচ্চেরি'), কারুশিল্পীদের বসতি ('কম্মানচ্চেরি') ও শবদাহের শ্মশান ('শুডুগাডু') নিষ্কর ছিল। এইগুলির জন্য ব্যবহৃত ভূমির অংশ গ্রামের বা নগরের মোট জমি হইতে বাদ দিয়া করদ জমির পরিমাণ ঠিক করা হইত। 'কর' বা ট্যাক্স ধার্য করা হইত জমির উর্বরাশক্তি ও ফসল দেখিয়া। রাজার বিচারালয় ছিল, গ্রামেও আদালত ছিল, কিন্তু প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের পঞ্চায়েতের কাছে বিচার হইত বেশী। চোলদের শাসনব্যবস্থা যে খুব সক্রিয় ও জীবন্ত ছিল তাহার

কারণ গ্রাম্যসমাজের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় শাসকরা সাধারণত হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইহা অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমভারতের সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, গ্রাম্য সমাজে কোন কেন্দ্রীয় শাসকই কোন বাধার সৃষ্টি করিতেন না। চোলরা এই ভারতীয় রীতিই মানিয়া চলিতেন, তবে তাঁহাদের আমলে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের যে প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল তাহা হইতে সমাজে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাণ্ড্য রাজবংশ

দক্ষিণভারতে মাদুরায় পাণ্ড্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সুন্দরপাণ্ড্য ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। পাণ্ড্যরাও নৌবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন এবং জাহাজ নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দক্ষিণভারতের সংস্কৃতি

পল্লবযুগে দক্ষিণভারতের আর্যীকরণও (Aryanisation) সম্পূর্ণ হয় এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চা দক্ষিণে সর্বত্র বিপুল উৎসাহে আরম্ভ হয়। সংস্কৃত উত্তর-ভারতের মতো দক্ষিণেরও রাজভাষা ও পণ্ডিতের ভাষা হইয়া ওঠে। পানিক্কর বলিয়াছেন: "In fact it can legitimately be claimed that Kanchi of the Pallavas was the great centre from which the Sanskritisation of the South as well as the Indian colonies in the Far East proceeded." পল্লব-রাজধানী কাঞ্চীপুরম দক্ষিণভারতের এবং সেখান হইতে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে।

দক্ষিণভারতের দেবালয়-স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। ইহাকে দ্রাবিড়রীতি (Dravidian style) বলা হয়। উত্তরভারতের দেবালয়ের সহিত ইহার পার্থক্য দেখা মাত্রই নজরে পড়ে। দক্ষিণের দেবালয়ের 'শিখর' পিরামিডাকৃতি ও স্তরবিন্যস্ত, তাহার উপর অর্ধগোলাকার আবরণ বা গম্বুজ। দেবালয়ের প্রথম যুগে হয়ত শুধু দেবালয় ছাড়া সংলগ্ন আর কিছু থাকিত না। পরে প্রাচীরবেষ্টিত চতুষ্কোণাকার বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে আরও বহু মন্দির, জলাশয়, হলঘর ও আরাধনা-কক্ষসহ প্রধান দেবালয় নির্মাণ করা হইয়াছে। এই

শিল্পরীতির বিকাশ হয় সপ্তম শতকে পল্লবযুগ হইতে। মাদ্রাজের ৩৫ মাইল দক্ষিণে মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরমের ধর্মরাজ-রথ, গণেশ-রথ প্রভৃতি সাতটি পাহাড়খোদিত দেবালয় পল্লবরাজাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্থাপত্যকীর্তি। এই শিল্পরীতির বিকাশের পরবর্তী স্তর পল্লব-রাজধানীর কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ-পেরুমল, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত দেবালয়ের গড়নে লক্ষ্য করা যায়। ইহার পর চোল-রাজাদের পোষকতায় এই স্থাপত্যরীতির চরম বিকাশ হয় দেবালয় নির্মাণে।

চালুক্য শিল্পরীতি

উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্য অঞ্চল শিল্পরীতির দিক দিয়াও উত্তর-দক্ষিণ বা আর্য-দ্রাবিড়রীতির মধ্যবর্তী একটি রীতিব বা স্টাইলের প্রবর্তক। দাক্ষিণাত্যের এই শিল্পরীতিকে ফার্গুসন 'চালুক্যরীতি' বলিয়াছেন। চালুক্যদের রাজত্বকালে আইহোল, বাদামি, পট্টদকল প্রভৃতি স্থানে বড়বড় বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। আইহোলে প্রায় ৭০টি দেবালয় আছে এবং এইজন্য ইহাকে বলা হয় 'town of temples'—দেবালয়-নগর। দেবালয়ের গর্ভগৃহের উপরে যে শিখর থাকে উত্তরভারতে তাহা বক্রিমাকৃতি (curvilinear) অথবা 'ফ্ল্যাট', এবং দক্ষিণভারতে চতুষ্কোণ পিরামিডাকৃতি।

ভক্তিসাহিত্যের বিকাশ

পল্লবরাজারা সাহিত্যেরও গুণগ্রাহী ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ 'মত্ত বিলাস প্রহসন' নামে একটি সামাজিক নাটক রচনা করেন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার বলিয়াছেন যে, ভারবী ও দণ্ডী পল্লব-রাজসভা অলংকৃত করিতেন। এই পল্লব-রাজসভা হইতেই দক্ষিণভারতের যুগান্তকারী ধর্মসংস্কারআন্দোলনের উৎপত্তি হয়। এই আন্দোলন ভক্তির প্রশস্ত পথে বন্যার বেগে নামিয়া আসে এবং এক বিচিত্র ভক্তিসাহিত্যের বিকাশ হয়। পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের এই ভক্তির বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়া যায়। দেবতা বিষ্ণু ছিলেন ভক্তির উৎস, কিন্তু দক্ষিণভারতে শিবও তাহার উৎস হইলেন। শিবের গম্ভীর রুদ্রমূর্তি ভক্তিরসে নবরূপ ধারণ করিল। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব আলওয়ারদের মতো শিবশক্তি শৈব নায়নাররা ভক্তির গান গাহিয়া, জনসমাজে প্রেম ও ভক্তির আদর্শ প্রচার করিয়া কেবল দক্ষিণভারত নহে, সমগ্র ভারত মাতাইয়া তুলিলেন।

পল্লবযুগে দক্ষিণভারতের আর্যীকরণও (Aryanisation) সম্পূর্ণ হয় এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চা দক্ষিণে সর্বত্র বিপুল উৎসাহে আরম্ভ হয়। সংস্কৃত উত্তর-ভারতের মতো দক্ষিণেরও রাজভাষা ও পণ্ডিতের ভাষা হইয়া ওঠে। পল্লব-রাজধানী কাঞ্চীপুরম দক্ষিণভারতে এবং সেখান হইতে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে।

চোলদের শিল্পকীর্তি

চোলরা দেবালয়স্থাপত্যে পল্লবদের শিল্পরীতি গ্রহণ করিয়া তাহারই সমৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। বিজয়ালয়ের কালে চোলরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সমগ্র চোলরাজ্য জুড়িয়া অসীম উৎসাহে পাথরের দেবালয় নির্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত খুব বড় মন্দির তাঁহারা নির্মাণ করান নাই। তাঞ্জোর ও গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরমের দুইটি বৃহৎ মন্দির চোল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ ও সুপরিণত নিদর্শন। ইহার মধ্যে তাঞ্জোরের শিবমন্দির একটি বিস্ময়কর কীর্তি।

QUESTIONS

1. Give a short account of the Chalukyas of Vatapi.

2. Wiite an account of the Pallavas of Kanchi with special reference to their contribution to Art and Architecture.

3. Give an account of the Cholas of South India with special reference to their system of administration.

4. Write notes on :

(i) Vaisnava Alwars and Saiva Nayanars

(ii) Rajendra Chola I

(iii) The Rastrakutas

(iv) Chola Art and Architecture

একাদশ অধ্যায়

পাল ও সেনরাজবংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উত্তর ও দক্ষিণভারতের গৌড-বঙ্গলোভী রাজাদের উপদ্রবে বঙ্গজনেরা অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। শশাঙ্কের মতো শক্তিমান কোন রাজপুরুষ রাজদণ্ড ধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তরের গুর্জর-প্রতিহার রাজপুত ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজপুত রাজারা বাংলাদেশে বারংবার অভিযান করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করেন। সুযোগ বুঝিয়া দক্ষিণের প্রবল-পরাক্রান্ত চালুক্য ও চোল রাজারাও হানা দিতে থাকেন। গৌডবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত-রাজারা তখন আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন, জাতীয় সংকটের সামনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। বাংলা দেশের এই অরাজকতাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হইয়াছে। বড মাছ ছোট মাছকে নির্বিচারে খাইয়া ফেলে, ইহাই জলাশয়ে মৎস্য-রাজ্যের ন্যায়বিচার। এতবড অন্যায় ও অবিচার আর হইতে পারে না, অথচ মৎস্যদের কাছে ইহাই ন্যায় ও স্বাভাবিক। তাই দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার সমাজে দেখা দিলে তাহাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়। বাংলাদেশে এই ধরনের অরাজকতা সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিয়াছিল। পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর এই অরাজকতার অবসান হয়।

পালরাজাদের পরিচয়

অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কোনসময় প্রথম পালরাজা **গোপাল** প্রজাদের সাহায্যে রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'বঙ্গপতি' ও 'গৌড়েশ্বর' বলা হইয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্তরাজাদের দমন করিয়া তিনি বঙ্গপতি হইয়াছিলেন।

CHAPTER XI—(a) Growth and development of Pala Power, Popular rising—Rampal, Uddandapura, Vikramasila.

(b) Senas, Ballala Sena, Lakshmana Sena, Joydeva.

রাজা ধর্মপাল

৭৫২ হইতে ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনসময় গোপালের পুত্র ধর্মপাল রাজা হইয়াছিলেন। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল প্রায় ৩২ বছর রাজত্ব করিয়া সমগ্র উত্তরভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন পাটলিপুত্রের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ (নাম 'তারানাথ' নহে) তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসগ্রন্থে, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে এবং ঘনরাম 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে পালরাজবংশ ও ধর্মপালের কথা বলিয়াছেন। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' আছে—

ধার্মিক ধরণীতলে ধর্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥

ধর্মপালের কার্যকলাপ বিচার করিলে মনে হয় যে ভারতের রাজনীতিক ভাবকেন্দ্র পুনরায় তিনি মৌর্য ও গুপ্তবংশের কর্মকেন্দ্র পূর্বভারতে স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কনৌজ জয় করিয়া তিনি চক্রায়ুধকে শাসনভার দিয়াছিলেন। মুঙ্গের-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে উত্তরে হিমালয় অঞ্চল হইতে দক্ষিণে গোকর্ণ ও পূর্বদিকে গঙ্গাসাগরসংগম পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকার তিনি বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। ৭৯৪ হইতে ৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনসময় ধর্মপালের মৃত্যু হয় বলিয়া অনুমান করা হয়।

রাজা দেবপাল

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজা হন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি উত্তরের গুর্জর-প্রতিহার এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট ও অন্যান্য রাজবংশের সহিত রাজ্য-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা ও আসাম জয় করিয়াছিল এবং উত্তরে হূনদের আক্রমণও প্রতিরোধ করিয়াছিল। রাজপ্রশস্তিতে তাঁহার সভাকবি তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিজয়ের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন।

প্রথম-বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয়-গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে প্রায় দশম শতকের শেষ পর্যন্ত

রাজত্ব করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে মহীপালের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিপিতে তাঁহাকে 'গৌড়াধিপতি' বলা হইয়াছে। মহীপালের পরে তাঁহার পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয়-বিগ্রহ-পাল রাজত্ব করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল ভীরু ও সন্দিগ্ধচিত্ত রাজা ছিলেন। পালরাজবংশের উত্তরাধিকার বহনের যোগ্যতা তাঁহার ছিল কি না সন্দেহ।

এই সময় বরেন্দ্রভূমির (উত্তরবঙ্গে) কৈবর্তজাতির দলপতি **দিব্ব** বা **দিব্বোক** পালরাজাদের অধীন অন্যতম সামন্ত বা আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের কাপুরুষতা ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হন। ইহাকেই 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' বলা হয়। দ্বিতীয়-মহীপাল দুই ভাইকে কারাবন্দী করিয়া কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া কৈবর্তবিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া যুদ্ধে নিহত হন।

রামপাল ও কৈবর্তবিদ্রোহ

এইসময় দ্বিতীয়-মহীপালের ছোটভাই রামপাল পালরাজ্য রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার অন্য ভাই সুরপালও কিছুদিন রাজা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রামপালই শেষে রাজদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর বিখ্যাত 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্তবিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রামপালের যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করা হইয়াছে। 'রামচরিতে' দিব্ব নাম 'দিব্বোক' আছে। বরেন্দ্রের দক্ষিণপশ্চিমাংশে কোন স্থানে কৈবর্তরাজের সৈন্যদের সহিত রামপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্তরাজ ভীম জীবিতাবস্থায় বন্দী হইয়াছিলেন। ভীম ও তাঁহার সেনানায়ক হরি যুদ্ধান্তে নিহত হন। রামপাল কৈবর্তসেনাদের নিজ সৈন্যদলে নিযুক্ত করেন এবং উত্তরবঙ্গ বিজয়ের পর গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে 'রামাবতী' নামে নূতন নগর নির্মাণ করেন। এই নগরে জগদ্দল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। রামাবতী পালরাজাদের শেষ রাজধানী। ষোড়শ শতাব্দীতেও **রামাবতী** নগরের অস্তিত্ব ছিল, কারণ আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে 'রমৌতি' নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।

রামাবতী স্থাপন করিয়া রামপাল উৎকল ও কলিঙ্গ জয় করেন এবং উৎকলরাজ্য নাগবংশীয় রাজাদেব প্রত্যর্পণ করেন। রামপালের জনৈক সামন্ত কামরূপ জয় করেন এবং পূর্ববঙ্গের বর্মণবংশীয় ভোজবর্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের কাছে নতি স্বীকার কবেন। রামপালের পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ও মদনপাল রাজা হন বটে, কিন্তু বাংলাদেশে এই সময় কর্ণাট-প্রদেশের সেনবাজবংশীয়দের পদধ্বনি শোনা যায়। পালরাজাবা বিদায় নেন, সেনবংশীয় রাজারা বাংলাব রাষ্ট্রমঞ্চে প্রবেশ কবেন।

পালরাজাদের সাংস্কৃতিক-দান

পালবাজাবা অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে যে-সময় বাংলাদেশেব বাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনবভ্যুত্থানেব ফলে উত্তব ও দক্ষিণভাবত হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রায লোপ পাইতে বসিযাছিল। পালবাজবংশেব পোষকতায বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে ও পূর্বভাবতে নবজীবন লাভ কবিয়া বিচিত্র পথে বিচিত্র বেশে প্রসারিত হয এবং ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধকেন্দ্রেও নূতন প্রাণসঞ্চার কবে।

পালরাজ দেবপাল সুবর্ণদ্বীপের শৈলেন্দ্রবাজকে নালন্দায বৌদ্ধবিহার নির্মাণ ও শ্রমণ-পালনেব জন্য পাঁচখানি গ্রামদান কবিয়াছিলেন, একথা মুঙ্গের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। নালন্দার কাছে উদ্দণ্ডপুর-মহাবিহার পাল-রাজত্বকালে স্থাপিত হয়। এই বিহারটি প্রধানত মহাযান বৌদ্ধধর্মেব অনু-শীলনকেন্দ্র হইয়া ওঠে। প্রসিদ্ধ আচার্য শীলরক্ষিত ছিলেন এখানকার অধ্যক্ষ। **দীপঙ্কর** শ্রীজ্ঞান বা অতীশ আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন।

বিক্রমশীল বিহার স্থাপিত হয় মগধে ধর্মপালের রাজত্বকালে। প্রায় তিন হাজার ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এই বিহারে। ১১৪ জন আচার্য বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা দিতেন। এখানে একটি বড় মন্দির এবং ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। নালন্দার মতো এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষার জন্য আসিতেন।

উদ্দণ্ডপুর মহাবিহারে মহাচার্য **শীলরক্ষিতের** কাছে উনিশ বছর বয়সে দীপঙ্কর (অতীশ) দীক্ষা গ্রহণ করেন। শীলরক্ষিত তাঁহাকে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'

উপাধি দেন। বিক্রমশীল বিহারে তিনি 'ভিক্ষু' হইয়া আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বিহারের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে পাঠান এবং সেখানে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও সংস্কার করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। বিক্রমশীলের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন অত্যধিক। তাহার অধ্যক্ষ হওয়া কম সম্মানের কথা নহে। বাংলাদেশের পরম গৌরব ছিলেন দীপঙ্কর।

এই সময় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে এবং আদিম ধর্মাচার, দৈত্য-দানবপূজা ইত্যাদি প্রবল হইয়া ওঠে। তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে বহু লোকজন দিয়া সসম্মানে তিব্বতে লইয়া যান। যাইবার সময় দীপঙ্কর নেপালে স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে বাস করেন, সেখান হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিব্বতে উপস্থিত হন। তখন তিনি অতিবৃদ্ধ, বয়স প্রায় ৭০ বছর। এই অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য যে তিব্বতে গিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার ধর্মপ্রবর্তনের অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বতীদের উপযোগী করিয়া তিনি মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন তিব্বতে। তিব্বতের বহু লোককে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন এবং তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তিব্বতে যে-সব বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন আজও তাহা তিব্বতীদের কাছে মহাপবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মের সহিত দীপঙ্করের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তিব্বতে।

চক্রপাণি

পালরাজারা যেমন বৌদ্ধধর্মের, তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও অন্যান্য শাস্ত্রের পোষকতা করিতেন। চক্রপাণি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত, পালরাজাদের উৎসাহে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়নে ব্রতী হন। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য চরকের গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়া চক্রপাণি খ্যাতিলাভ করেন। এই টীকাগ্রন্থের নাম 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' বা 'চরক-তাৎপর্য-দীপিকা'। সুশ্রুতের একটি টীকাও তিনি রচনা করেন, নাম 'ভানুমতী'। ইহা ছাড়া তাঁহার

রচিত 'শব্দচন্দ্রিকা' গ্রন্থে ভেষজ গাছপালাদির বিবরণ এবং 'দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ' গ্রন্থে আহার্য ও পথ্যের গুণাদির বিবরণ আছে।

সন্ধ্যাকরনন্দী

রাজা রামপাল প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকরনন্দীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিখ্যাত 'রামচরিত' কাব্য রচনা করিয়া তিনি ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। প্রধানত পালরাজা রামপালের কৈবর্তবিদ্রোহ দমন ও দেশজয়ের কীর্তি অবলম্বনে 'রামচরিত' কাব্য রচিত। কিন্তু কাব্যটি এমন অভিনব ও উদ্ভট রীতিতে রচিত যে প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ দুইরকমের হয়—একটি অর্থে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের অভিযান বোঝায়, অন্য অর্থে পালরাজ রামপালকে বোঝায়। প্রাচীন সংস্কৃত-কবিরা কাব্যরচনায় এই রকম রীতি আয়ত্ত করিতে পারিলে সুধীসমাজে ও জনসমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতেন, কৃতী কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। সন্ধ্যাকরনন্দী ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী এবং তাঁহার পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন পালরাজা রামপালের 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক'।

ধীমান ও বীতপাল

ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল পালযুগের বিখ্যাত শিল্পী। লামা তারনাথ ('তারানাথ' নহে) তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বরেন্দ্রভূমির এই দুইজন বিখ্যাত শিল্পীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পালযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি ও ধাতুমূর্তি অসংখ্য নির্মিত হইয়াছিল। বিহার ও দেবালয়ও বহু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই স্থপতি, ভাস্কর ও শিল্পীরা তাঁহাদের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যা অনুশীলনের অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন পালযুগে। শিল্পকলার বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল। এই পুনরুজ্জীবনে শক্তিধর শিল্পী ধীমান ও বীতপালের দান অসামান্য। তাঁহারা এক নূতন শিল্পরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সেই শিল্পরীতি ভারতের বাহিরে তিব্বতে, নেপালে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ। বৌদ্ধধর্মের আদিকালে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না, নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধ নিজে ইহার বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের

পরে ধীরে ধীরে তাঁহার মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। মহাযানী বৌদ্ধরা এই বুদ্ধমূর্তিপূজা প্রবর্তন করেন। আরও কিছুকাল পরে হিন্দুধর্মের নানা দেবদেবীর মূর্তিপূজার মতো মহাযানী বৌদ্ধরাও দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করেন। বুদ্ধ ছাড়াও অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হন।

পালযুগে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠানে বিলীন হইয়া যায়। নূতন নূতন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিপূজা আরম্ভ হইল। প্রত্যেক দেবদেবীর মন্ত্র ও সাধনরূপ রচিত হয়। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র একখানি প্রধান তন্ত্রগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম 'সাধনমালা'। এই সাধনমালায় ৩১২টি সাধনায় বা মন্ত্রে অগণিত বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্তির ধ্যান, পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ইত্যাদির বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া বিক্রমশীল মহাবিহারের বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত রচিত "নিষ্পন্নযোগাবলী" গ্রন্থে প্রায় ৬০০ বৌদ্ধ দেবদেবীর বিবরণ আছে। ইহা পালযুগের শেষে রচিত। সারনাথে, বিক্রমশীলায়, ওদন্তপুরীতে, বুদ্ধগয়ায়, পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, আসামে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধতন্ত্রমতে অসংখ্য দেবদেবীব মূর্তি তৈরী হইয়াছিল। ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম।

ভারতের আদর্শ অনুযায়ী অন্যান্য রাজাদের মতো বাংলার পালরাজারাও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইবাব জন্য ভিন্ন ধর্মের প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিতেন। পালরাজারা 'পরমসৌগত' বা বুদ্ধোপাসক হইলেও তাঁহাদের মন্ত্রীরা ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাই ছিলেন পালরাজ্যের প্রধান কর্ণধার। গর্গদেব, দর্ভপাণি, সোমেশ্বর, কেদার-মিশ্র, ভট্ট গুরব-মিশ্র ইঁহারা পুরুষানুক্রমে ধর্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের যথাক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতে, বৃত্তি দিতে, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করাইতে তাঁহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না। এই কারণে বৌদ্ধধর্মানুরাগী হইয়াও হিন্দুপ্রধান বাংলাদেশে তাঁহারা লোকপ্রিয় রাজা হইয়াছিলেন।

পাহাড়পুরের মৃৎ-ফলক চিত্রাবলী। পাহাড়পুরের (উত্তরবঙ্গে) বৌদ্ধবিহার নির্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পালরাজ ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। ইহার ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করা

হইয়াছে। এই পুনরুদ্ধারের ইতিহাস প্রসঙ্গত একটু উল্লেখ করিতে হয়। আজ হইতে প্রায় ৪০ বছর আগে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে এবং ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ভাণ্ডারকরের যুক্ত তত্ত্বাবধানে পাহাড়পুরের খননকার্য আরম্ভ হয়।
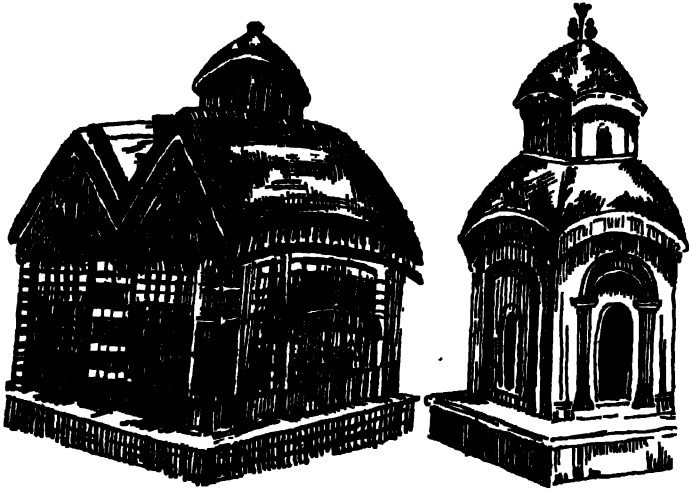
এই খননকার্যের ফলে পালযুগের অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মূর্তি ও মৃৎফলকোৎকীর্ণ চিত্রাবলী অন্যতম। এগুলি পালযুগের শিল্পোৎকর্ষের বিচিত্র নিদর্শন।

পাহাড়পুরের মৃৎফলকে উৎকীর্ণ বা পোড়ামাটির মূর্তিগুলি (terracottas) সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সারিবদ্ধভাবে এই ফলকগুলি সাজাইয়া রাখিলে উৎকীর্ণ মূর্তি বা চিত্রগুলি দেখিয়া তখনকার সমাজের ইতিহাস জানিতে কষ্ট হয় না। মৃৎশিল্পীরা জীবনের ধারাটিকে নানারূপের ভিতর দিয়া মাটির ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলার আদিবাসী নারীপুরুষের রূপ, পশুপক্ষীর নানা নিদর্শন, গন্ধর্ব কিন্নরী অর্ধমানব-অর্ধপশুর কাল্পনিক মূর্তি, মা ও শিশু, ব্যায়ামরত মল্লবীর, লাঠি-হাতে দ্বারপাল, কলসী-কাঁখে কুয়ার কাছে জলভরার জন্য নারী, গৃহিণী নারী, যোদ্ধা নারী ও পুরুষ, রথারোহী ধনুর্ধর, দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, লাঙ্গল-কাঁধে কৃষক, জেলে-জেলেনী, শিকারী ব্যাধ, নৃত্যসংগীতরতা নারী,

গীতবাদ্যরত পুরুষ, ধার্মিক ব্রাহ্মণ, অস্থিচর্মসার দরিদ্র ভিক্ষুক—পরনে নেংটি, কাঁধে লাঠির দুইপ্রান্তে পুঁটলি—মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই—এরকম অজস্র চিত্র, বাংলার ও বাঙালীর সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের টুকরোছবি (কেবল রথারোহী যোদ্ধা ও মল্লবীর ছাড়া) আজও বাংলাদেশে দেখা যায়। দেবদেবীর মূর্তিও আছে - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, শিব। শিবের মূর্তি বেশী। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি আছে—বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। বিষয়বস্তুর মতো রূপায়ণের ভঙ্গিও স্বচ্ছন্দ সরল সাবলীল ও বলিষ্ঠ। শিল্পীর হাতের সহিত যেন হৃদয়ও কাজ করিয়াছে।

সেনরাজবংশ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পালরাজারা বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের পতনের পর সেনবংশের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেনরাজারা দাক্ষিণাত্যের কর্নাটদেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করেন। কোন্ সময় ও কেন তাঁহারা সুদূর কর্নাটদেশ হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কেহ বলেন যে তাঁহারা পালরাজাদের অধীনে কাজকর্ম করিতেন, ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া সিংহাসন দখল করিয়া জাঁকিয়া বসেন। আবার কেহ বলেন যে দাক্ষিণাত্য হইতে একাধিক রাজারা যখন বাংলাদেশে যুদ্ধাভিযান করেন তখন সেনবংশের পূর্বপুরুষরা কেহ হয়ত বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। দুইটি অনুমানই সত্য হইবার সম্ভাবনা। বিজয়সেনকেই বাংলাদেশে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিকদের স্বীকৃত সেনরাজবংশের কালানুক্রম এই :

রাজা	রাজ্যাভিষেক কাল (আনুমানিক)
বিজয়সেন	১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ
বল্লালসেন	১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ
লক্ষ্মণসেন	১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ
বিশ্বরূপসেন	১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ
কেশবসেন	১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ

বল্লালসেন

সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বল্লালসেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। বল্লাল নিজে অবশ্য শিব-উপাসক ছিলেন। পালরাজাদের আমলে যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবনতি হইয়াছিল তাহা নহে। তবে বৌদ্ধধর্মের পোষকতার জন্য যে দেবদেবীবহুল বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল পালযুগে, সেন-আমলে প্রত্যক্ষ পোষকতার অভাবে তাহার প্রভাব দ্রুত কমিতে থাকে এবং হিন্দু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। বল্লালসেন শুধু কৃতী রাজা নহেন, বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত ছিলেন। আনন্দভট্ট বিরচিত 'বল্লালচরিত' হইতে বল্লালসেন সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে মিথ্যা বাদ দিয়া সত্য বাছিয়া লওয়া কঠিন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ বল্লালসেনের নিজের রচিত। বাংলাদেশে 'কৌলীন্যপ্রথার' অন্যতম প্রবর্তক বলিয়া বল্লালসেন খ্যাত।

লক্ষ্মণসেন

বল্লালসেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন রাজা হন। লক্ষ্মণসেন রণনিপুণ ছিলেন। যখন তিনি যুবরাজ ছিলেন তখন কলিঙ্গ, কাশী ও কামরূপ অভিযান করিয়া তিনি গৌড়রাজ্য বিস্তৃত করেন। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াই তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। পিতার মতো তিনিও সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

জয়দেব ও ধোয়ী

সেনরাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতির লোক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভাসদমন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত কবি—উমাপতিধর, গোবর্ধন-আচার্য, জয়দেব-মিশ্র, শরণ ও ধোয়ীক বা ধোয়ী। উমাপতি বল্লালসেনেরও মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। রাজশাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ প্রশস্তি উমাপতির রচনা। আচার্য গোবর্ধন বিখ্যাত সংস্কৃতকাব্য 'আর্যসপ্তশতী' রচনা করেন। জয়দেব-মিশ্র ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কালিদাস। তাঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের জন্যই ভারতের ইতিহাসে লক্ষ্মণসেন স্মরণীয় হইয়া আছেন।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের মিলনকাহিনী বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং তাহা লইয়া গীত ও পদাবলী রচনায়ও বিরাম ছিল না। গীতগোবিন্দের

পদগুলিতে সেকালের পদাবলী পূর্ণতালাভ করিয়াছে। এই পদাবলী হইতে বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা হইয়াছে।

কবি ধোয়ী ছিলেন জাতিতে তন্তুবায়। কথিত আছে, সরস্বতীর বরে তিনি কবিত্বশক্তি অর্জন করেন। ধোয়ীর রচিত অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'পবনদূত' কাব্য। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুসরণে যতগুলি 'দূতকাব্য' সেকালে লেখা হইয়াছিল, 'পবনদূত' তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধোয়ী ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। মহারাজা নিজে তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতীক বা পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণাভরণমণ্ডিত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুইটি চামর উপহার দিয়াছিলেন।

বাংলায় মুসলমান অভিযান

দেশের মধ্যে যখনই আত্মপ্রাধান্য আত্মকলহ প্রবল হইয়াছে তখনই বড় বড় রাজ্য ও রাজার পতন হইয়াছে, সমাজের ঐক্য, সংহতি ও শক্তি ধ্বংস হইয়াছে এবং বিদেশীর অভিযানের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আগের ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি। লক্ষ্মণসেনের আমলেও তাহাই হইল।

লক্ষ্মণসেন তখন অতিবৃদ্ধ। রাজ্যের মধ্যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। চারিদিকে সামন্তরা নিজেদের অধীন রাজ্য দখল করিয়া রাজকর্তৃত্ব জাহির করিতে ব্যস্ত, রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা কাহারও মনে নাই। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরে জীবনসায়াহ্নে দেশের জীবনেও অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। এই সময় মুসলমানদের অভিযান আরম্ভ হইল বাংলাদেশে।

QUESTIONS

1. Give an account of the Pala-rajas Devapala and Mahipala I.

2. Give an account of Rampala with reference to Kaivartya rebellion.

3. Write briefly what you know about the contribution of the Pala rulers to Bengali culture.

4. Write notes on :
   (i) Ballala Sena ;
   (ii) Joydeva ;
   (iii) Dhoyi ;
   (iv) Dipankar.

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃহত্তর ভারত

মধ্যএশিয়ায় ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়ায় প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেবল পূর্বদিকে নহে, পশ্চিম-দিকেও ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হইয়াছিল। সাধারণত আমরা ভারত-সমুদ্র পথে পূর্বদিকে ভারতসভ্যতাব প্রসারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত 'বৃহত্তর ভারতের' কথা বলিতে হইলে পশ্চিম সীমান্তপারের কথা বাদ দেওয়া যায় না। পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই বৃহত্তব ভারতেব সীমানা প্রসারিত হইয়াছিল।

পশ্চিম ও মধ্যএসিয়া

সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারকরা পশ্চিমে অ্যান্টিয়োক ও অ্যালেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের ধর্মযাত্রার ফলাফল কি হইয়াছিল সঠিক জানা যায় না। তবে বক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজারা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা যে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অঞ্চলের গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী রাজাদের উপর বৌদ্ধ প্রভাব যে যথেষ্ট পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

মধ্যএশিয়ায় ভারতসংস্কৃতিব ধারা বহন করিয়া লইয়া যান কুষানরাজা কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব। কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মের পোষকতা করিতেন এবং ভারতের বাহিরে মধ্যএসিয়ায় তিনি যে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেখানে ভারতের বৌদ্ধ আচার্যরা বেশ বড বড় ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মধ্যএসিয়ার পথ দিয়া ভারতীয় শ্রমণরা চীনদেশ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুমারজীব প্রসিদ্ধ। এই কুমারজীব চীন ভাষায় অশ্বঘোষ নাগার্জুন ও বসুবন্ধুর রচনাবলী অনুবাদ করিয়াছিলেন। মধ্যএসিয়ায় খোটান প্রভৃতি অঞ্চল যে প্রধানত ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা এই বৌদ্ধ আচার্যদের ধর্মযাত্রার ফলে।

CHAPTER XII : Indian Colonial Enterprise

ভারতসমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় বিস্তার

উত্তর-পশ্চিমের স্থলপথে বাহিরে যে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, কিন্তু সমুদ্রপথে দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে ভারতের রাজনীতিক প্রভাবও প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দেখা যায় যে আন্নাম, কোচিন-চীন ও অন্যান্য দ্বীপে ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য অথবা হিন্দুভাবাপন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের রামায়ণ মহাকাব্যে জাভা ও সুমাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই যে এই অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টজন্মের অনেক আগে হইতেই দক্ষিণভারতের সমুদ্রকূলের বন্দরগুলির সহিত দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার এইসব দ্বীপের বাণিজ্যসূত্রে যে যোগাযোগ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতীয়দের এইসব দ্বীপে যাত্রা করার কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না। ভারতীয়দের এইসব দ্বীপে যাত্রার স্থলপথ ছিল মালয়ের ভিতর দিয়া এবং সমুদ্রপথ ছিল সিঙ্গাপুর প্রণালীর ভিতর দিয়া।

'কথাসরিৎসাগর' রচিত হয় সাতবাহন রাজাদের যুগে। ইহার অনেক কাহিনীতে 'কটাহদ্বীপের' নাম পাওয়া যায়। এই কাহিনীগুলি অধিকাংশই প্রাচীনকালের সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। সুমাত্রা জাভা বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ এই বাণিজ্যসূত্রেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমাদের পুরাণে যে অগস্ত্য মুনির গল্প আছে তাহা হইতে সমুদ্রপারে এই উপনিবেশ স্থাপনের পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। গল্পটি এই :

দক্ষিণভারতের সমুদ্রকূলের অধিবাসীদের রাক্ষসরা প্রায়ই উপদ্রব করিত। এই রাক্ষসরা রাত্রিতে সমুদ্রপথে নৌকায় করিয়া আসিত এবং ভারতীয় উপকূলের লোকজন শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হইয়া অগস্ত্য মুনির কাছে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। অগস্ত্য দেখিলেন যে রাক্ষসরা সমুদ্রের তলায় বাস করে, কাজেই ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমুদ্রের জল শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর উপকূলের ভারতীয় অধিবাসীদের পক্ষে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা সহজ হইয়া গেল।

এই পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য গভীর। দ্বীপের অধিবাসীদেরই এখানে 'রাক্ষস' বলা হইয়াছে। বলিবার কারণ হইল তখনও তাহারা ভারতীয়দের

মতো সভ্য হইতে পারে নাই। আর্য ও হিন্দুযুগের প্রথমপর্বে ভারতের অনুন্নত অসভ্য আদিবাসীদেরও এইভাবে 'রাক্ষস' ও 'দস্যু' বলা হইত। অগস্ত্য মুনি আজও দক্ষিণভারতের সর্বজনপূজ্য দেবতা এবং ভারতের বাহিরে ইন্দোনেসিয়া জাপান প্রভৃতি দেশেও অগস্ত্য মুনি আরাধ্য দেবতা। অগস্ত্য হইলেন সেকালের সমুদ্রযাত্রা ও উপনিবিশের দেবতা। সমুদ্রযাত্রার সহিত উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতের সম্পর্ক বেশী। সেইজন্য দক্ষিণভারতে ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার বৃহত্তর ভারতে অগস্ত্য মুনির লোকপ্রিয়তা আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কম্বুজ ও চম্পা

বর্তমান ইন্দোচীনের একটি অংশে ভারতীয়দের প্রভাবে প্রাচীনকালে দুইটি বিখ্যাত হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—একটির নাম 'কম্বুজ', আর-একটির নাম 'চম্পা'। প্রাচীন চীনা দলিলপত্রে লিখিত আছে যে কম্বুজরাজ্য ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীমার নামে একজন রাজার একটি শিলালিপি হইতেও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বুজের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বুজে হিন্দুসভ্যতার যে কতখানি প্রসার হইয়াছিল তাহা বোর্নিওর একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়। এই লিপিতে বলা হইয়াছে যে রাজা অশ্ববর্মণের পুত্র মূলবর্মণ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুযায়ী বহুরকমের হিন্দু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বোর্নিওয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সুতরাং তাহার মধ্যবর্তী মালয়, সুমাত্রা ও জাভাদ্বীপে তাহার আগেই যে হিন্দুসভ্যতার বিস্তার ও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। দীর্ঘকাল বর্মণবংশের রাজারা প্রবল প্রতাপে কম্বুজে রাজত্ব করেন।

ইন্দোচীনের আর-একটি রাজ্যের নাম চম্পা। চম্পাতেও এক বর্মণবংশের রাজারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যবদ্বীপ বা জাভা

প্রাচীন যবদ্বীপ বা জাভা অঞ্চলে প্রথম শতাব্দীর আগেই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার 'যবদ্বীপ' নাম অতি প্রাচীন। চীনা কাহিনী হইতে জানা যায় যে দেববর্মণ নামে যবদ্বীপের এক হিন্দুরাজা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত

পাঠাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে জাভা বোর্নিও প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল, তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালে তাহাদের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। এইসব দ্বীপের হিন্দুরাজ্য শ্রীবিজয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে চীনা পর্যটক ফাহিয়েন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় ভারত ভ্রমণ করিয়া সমুদ্র-পথে চীনে ফিরিবার সময় পাঁচমাস জাভায় অবস্থান করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অখণ্ড প্রতিপত্তি দেখিতে পান।

শ্রীবিজয়রাজ্য ও শৈলেন্দ্রবংশ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা দ্বীপময় হিন্দুরাজ্যগুলিতে একাধিপত্য বিস্তার করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে মালয় জাভা সুমাত্রা বলি বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপরাজ্য শৈলেন্দ্র রাজাদের আয়ত্তে আসে। শ্রীবিজয় সুমাত্রায় অবস্থিত। ভারতসমুদ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শৈলেন্দ্র-রাজাদের সহিত দক্ষিণভারতের চোলরাজাদের বিরোধ ও নৌযুদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে তাঁহারা চোলদের প্রভুত্বই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। শৈলেন্দ্ররাজা বালপুত্রদেব বাংলার পালরাজা দেবপালের অনুমতিক্রমে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু কুমারঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুরু।

ভারতসংস্কৃতির প্রসার

দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার প্রাচীন হিন্দুরাজ্যগুলিতে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির বিস্ময়কর বিস্তার ও প্রকাশ হইয়াছিল। এইসব রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজকর্মে প্রধানত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হইত এবং প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চা হইত। কম্বুজের রাজা দ্বাদশ শতাব্দীতে কাম্বোডিয়ায় একটি বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। জাভার বিখ্যাত বোরোবুদুর মন্দির শৈলেন্দ্ররাজারা পাহাড়ের উপর নির্মাণ করেন। কেবল এসিয়ার নহে, সারা পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি আশ্চর্য শিল্পকীর্তি। রবীন্দ্রনাথ এই মন্দির দেখিয়া 'বোরোবুদুর' নামে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

"জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়, তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ,......একে বলে শিল্পের তপস্যা।"

বাহিরের উপনিবেশে ভারত এই শিল্পের তপস্যা ও ধর্মের তপস্যা শিখাইয়াছে, কি করিয়া অস্ত্রবলে দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হয় তাহা শিখায় নাই।

QUESTIONS

1. Write what you know abour Indian Colonial enterprise in South-east Asia.

2. Write notes on :

(a) Kambuja ; (b) Srivijaya Rajya ; (c) Champa.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামের অভিযান

যখন সম্রাট হর্ষবর্ধন উত্তরভারতে রাজত্ব করিতেছিলেন, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতসংস্কৃতির বৈচিত্র্য সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দক্ষিণভারতে চালুক্য-পল্লব-পাণ্ড্য রাজবংশ রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভারতের বাহিরে আরব দেশের মরুভূমিতে ঝড় বহিতেছিল। নূতন এক ধর্মচেতনা অর্ধসভ্য অর্ধ-যাযাবর আরববাসীর মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছিল। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পর্বের কথা। এই নূতন ধর্মচেতনা ও ধর্মাদর্শের নাম **ইসলামধর্ম** এবং ইহার প্রবর্তক **হজরত মহম্মদ**। কেবল আরববাসীর মানসলোক আচ্ছন্ন করিয়া যে এই ঝড় উঠিয়াছিল তাহা নহে, ইউরোপ হইতে এশিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আরববাসীদের মহম্মদ এক আল্লা বা ঈশ্বরের অধীনে, এক ইসলামধর্ম-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বানে আরবের মরুপ্রান্তরে এক নূতন জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল এবং ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার প্রবল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আরবের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন, বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রাচীনতা কম নহে, খ্রীষ্টধর্মেরও বয়স তখন ৬০০ বছরের বেশি হইয়াছে। কাজেই নবজাত ইসলামধর্মের দুর্বার প্রাণশক্তি, অন্তত সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মানুরাগীদের বেশ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আধুনিককালে যেমন অর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক শক্তির আশ্রয়ে রাষ্ট্রশক্তি অগ্রসর হয়, প্রাচীন ও

CHAPTER XIII: (a) Condition of North India on the eve of Muslim invasion. Islam, Arab invasion of Sind—Sultan Mahmud—Alberuni.

(b) Rise of the Rajputs—the Gurjara Empire. Bhoja—Muhammad of Ghor's invasion—establishment of the Delhi Sultanate by Kutubuddin.

মধ্যযুগে তেমনি ধর্মের আশ্রয়ে রাষ্ট্রশক্তি অগ্রসর হইত। খ্রীষ্টধর্মের আশ্রয়ে হইয়াছিল, ইসলামধর্মের আশ্রয়েও সপ্তম-অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির বিস্তার হইতেছিল।

আরবদের সিন্ধুঅভিযান

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যাঁহারা ইসলামধর্মের ধারক হইলেন তাঁহাদের বলা হয় **খলিফা**। এই খলিফাদের শাসনে ক্রমে একটি সুসংহত মুসলমান রাজশক্তির বিকাশ হইল এবং তাহা আরবের বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইল। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে **জিহাদ** (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করা এবং তাহাদের ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলিয়া গণ্য হইত না। সেইজন্য ইসলামের বিস্তারের পথ আরও সুগম হইয়াছে এবং তাহার জন্য দুর্ধর্ষ শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগ করিতে কোন বাধারও সৃষ্টি হয় নাই। অল্পকালের মধ্যে তাই দেখা যায় যে মিশর সিরিয়া কার্থেজ আফ্রিকা স্পেন পর্যন্ত ৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্রুতগতিতে ইসলামের কবলিত হয়। মধ্যএসিয়াতেও ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয়। অক্সাস বা অক্ষুনদীর তীর পর্যন্ত দখল করিয়া খলিফারা তাহার অপর পারেও অগ্রসর হইতে উদ্যত হন। খলিফাধীন পারস্য-সাম্রাজ্যের শাসক হাজাজ মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যলোভী ছিলেন এবং বোখারা সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিয়া তিনি কাশগড়ে চীনাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। অতঃপর কাবুল ও সিন্ধুদেশেও অভিযান আরম্ভ হয়।

সিংহলের রাজা কিছু মূল্যবান উপঢৌকন নাকি খলিফা হাজাজের মনস্তুষ্টির জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পথে সিন্ধুর দেবল অঞ্চলের জলদস্যুরা লুট করিয়াছিল। অতএব দেবলের দস্যুদের সায়েস্তা করা দরকার—এই ছিল হাজাজের প্রথম সিন্ধু অভিযানের অজুহাত। হাজাজের অনুরোধে খলিফাও অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়, দেবলের তথাকথিত দস্যুদের সায়েস্তা করা সম্ভব হয় না, সিন্ধীদের প্রবল প্রতিরোধে আরব সেনাপতি পর্যন্ত নিহত হন। দাম্ভিক হাজাজ এই পরাজয়ে অপমানিত হইয়া সিন্ধীদের উপর নিদারুণ প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সময় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় **দাহির**। হাজাজ নূতন সেনাবাহিনী গঠন করিয়া **মহম্মদ বিন কাশিম** নামে সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে অভিযানের সংকল্প করেন।

মহম্মদ বিন্ কাশিমের এই অভিযানকে ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ 'one of the romances of history' বলিয়াছেন। কাশিমের উচ্ছল যৌবন, বীরত্ব ও পৌরুষ, অসাধারণ রণকুশলতা, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি ইত্যাদি গুণের সহিত অদৃষ্টের পরিহাসের মতো তাঁহার জীবনের করুণ পরিণতির কথা মনে করিলে বাস্তবিকই তাহাকে কোন রোমান্সের নায়কের মতো মনে হয়। বাছাই-করা ৬০০০ বীর যোদ্ধা, আরও ৬০০০ সশস্ত্র উষ্ট্রারোহী এবং তাহার সহিত ৩০০০ বক্তিয়ান উটের পিঠে মাল-বোঝাই করিয়া কাশিম ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকালে দেবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাহির ও তাঁহার 'ঠাকুর'রা (সিন্ধী ব্রাহ্মণপ্রধানদের 'ঠাকুর' বলিত) বীরের মতো সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করেন। দাহিরের হাতীর হাওদায় আরবদের একটি অগ্নিতীর বিঁধিয়া আগুন জ্বলিয়া ওঠে, হাতী দৌড়াইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। চারিদিক হইতে দাহিরের উপর তীর বর্ষিত হয়। তীরবিদ্ধ ও ধরাশায়ী হইয়াও দাহির গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আরবদের সহিত মল্লবীরের মতো লড়াই করিতে থাকেন, কিন্তু এক আরবসেনার তরবারির আঘাতে তাঁহার মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। দাহিরের স্ত্রী রানীবাঈ ও পুত্র জয়সিংহ রাওয়ার-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রানীবাঈ বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের দলবদ্ধ করিয়া আরবদের প্রতিরোধ করিবার জন্য শেষসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মুলতান জয় করিয়া কাশিম যখন জয়োল্লাসে তাঁহার সেনাপতি আবু হাকিমকে কনৌজ অভিযানের আদেশ দিবেন তখন খলিফার কাছ হইতে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুর পরোয়ানা আসিল। ঘটনাটি খুবই নাটকীয়, কিন্তু তাহার কারণটি আরও চমকপ্রদ। দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া কাশিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে কাশিম তাঁহাদের ইজ্জত নষ্ট করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্মে আপাদমস্তক মুড়িয়া সেলাই করিয়া কাশিমকে তাঁহার কাছে অবিলম্বে পাঠানো হয়।

গজনীর শাসকদের অভিযান

নবম শতাব্দীর শেষদিকে সিন্ধুদেশে আরবশাসন লোপ পায়। আরবদেশেও খলিফাদের পরিবর্তন হইতে থাকে। বিভিন্ন খলিফাবংশ নিজেদের অধঃপতন

রোধ করিতে পারেন না। আরবদের জাতীয় জীবনে ধর্মবিরোধ (শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের) ও নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খালিফারাও বিলাস-ব্যভিচারে মত্ত হইয়া অন্য কর্তব্য ও দায়িত্ব অবহেলা করিতে আরম্ভ করেন। পারসী, তুর্কী, কুর্দ, আরব ও অন্যান্য শাসকরা খলিফাদের দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। ইহাদের মধ্যে তুর্কীরা খুব প্রবল হইয়া ওঠে। তাহারা গজনীতে ৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। আলপ্তগীন ইহার প্রতিষ্ঠাতা, সবুক্তগীন তাঁহার ক্রীতদাস। গজনীর এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সবুক্তগীনের নেতৃত্বে বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। সবুক্তগীনের পুত্র **সুলতান মামুদ**।

সুলতান মামুদ (৯৯৭-১০৩০)

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুলতান মামুদ গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পিতাকে রাজা জয়পালের সহিত সন্ধি করিতে তিনিই নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং আরও দ্বিগুণ উৎসাহে হিন্দুস্থান অভিযান ও লুঠতরাজ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ১০০০-১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ২৬ বছর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সুলতান মামুদ ১৭-বার ভারতে অভিযান করেন।

শাহীরাজা জয়পালের সহিত তাঁহার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় পেশোয়ারে। জয়পাল অগ্নিচিতায় আত্মোৎসর্গ করেন, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। তাঁহার পুত্র আনন্দ-পালের সহিত মামুদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আনন্দপালও উত্তরভারতের হিন্দু-রাজাদের সংঘবদ্ধ করিয়া মামুদের অভিযান প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া মামুদ নগরকোট (কাংড়া, পাঞ্জাবের কাংড়া জেলায়) দুর্গ আক্রমণ করিয়া লুট করেন। থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা, বৃন্দাবন সর্বত্র ঘরবাড়ি, দেবালয় ধ্বংস করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। এদিকে কনৌজের পরিহার-রাজ রাজ্যপাল বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া জাতীয় সম্মান জলাঞ্জলি দেন। কিন্তু কলিঞ্জরের চান্দেল্ল-রাজ চাঁদরায় কনৌজের এই কলঙ্কের প্রতিশোধ লইলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্যাধর গোয়ালিয়র-রাজের সহযোগিতায় রাজ্যপালকে যুদ্ধে হত্যা করেন। তাঁবেদার কনৌজ-রাজের এই পরিণতিতে মামুদ ক্ষেপিয়া গিয়া চান্দেল্লরাজ্য আক্রমণ করেন।

কিন্তু কাথিয়াওয়াড়ের বিখ্যাত **সোমনাথ মন্দির** আক্রমণ ও লুণ্ঠন

(১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে) মামুদের নিকৃষ্ট অপকীর্তি বলিয়া ইতিহাসে নিন্দিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে কত যে মণিমুক্তা ও সোনার জিনিস ছিল তাহার হিসাব নাই। রাজপুত রাজাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল এই মন্দির। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মন্দির রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। গুজরাটের রাজা ভীমদেব প্রতিরোধ-সংগ্রামে অগ্রণী হন। প্রায় ৫০০০ হিন্দু যোদ্ধা এই মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু মন্দির রক্ষা সম্ভব হয় নাই। মামুদ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সব ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। সোমনাথ লুট করিয়া গজনী ফিরিবার পথে রাজপুত রাজারা তাঁহার পথ রোধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। পরামর-রাজ ভোজদেব ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মামুদ এই প্রতিরোধের ভয়ে অন্য পথে মরুভূমির ভিতর দিয়া গজনী ফিরিয়া গিয়াছিলেন (১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে)। তাহার পরেও আবার জাঠদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন।

মোট সতেরবার ভারত-অভিযান তাঁহার শেষ হয় ছাব্বিশ বছরে। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন বোখারা সমরকন্দ হইতে গুজরাট ও কনৌজ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং আফগানিস্তান, খোরাসান, তাবরিস্তান, সিস্তান, কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত।

অল্-বিরুণীর ভারত-বিবরণ

৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্-বিরুণী খিবাতে জন্মগ্রহণ করেন। মামুদ খিবা জয় করিয়া বিরুণীকে বন্দী করিয়া গজনীতে লইয়া আসেন। মামুদেরই সহযাত্রী হইয়া বিরুণী ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য পর্যবেক্ষণশক্তি ও উদারতার জন্য তিনি যে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সেকালের অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রবিদ্যার প্রতি বিরুণীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের নানাদিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত বিদ্যোৎসাহীর অনুসন্ধিৎসা তাঁহার এত গভীর ছিল যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁহার কোন বিষয় জানিবার ও বুঝিবার পথে অন্তরায় হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, সত্য কথা বলিবার যে সৎসাহস তাঁহার ছিল তাহা আধুনিক কালেও শ্রদ্ধার যোগ্য। সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের অনিষ্টকর ফলাফল

সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তি করিতে তিনি ভয় পান নাই, যদিও মামুদ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: "মামুদের অভিযানের ফলে ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বহুকালের জন্য পিছাইয়া গিয়াছে। তাঁহার রণকুশলতা হিন্দুজীবনকে ধূলিকণার মতো বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়াছে। হিন্দুসভ্যতার নিদর্শনও বহু ধূলিসাৎ হইয়াছে।"

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিরূণী বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে উহা বিভক্ত ছিল। এই সব রাজ্যের মধ্যে সদ্‌ভাব বিশেষ ছিল না, বিরোধ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। কাশ্মীর, সিন্ধু, মালব, কনৌজ প্রভৃতি রাজ্য ইহাদের মধ্যে প্রধান।

ভারতীয় হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু জাতি ও বর্ণে সমাজ বিভক্ত। বাল্যবিবাহের প্রচলন বেশী, এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে কঠোর বৈধব্য-জীবন যাপন করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর সহমরণের বা সতীদাহ প্রথার প্রচলন আছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যবস্থা পিতামাতা করিলেও দানধ্যান বা যৌতুক বলিয়া কিছু দেওয়া হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে কিছু দান করেন, তাহা 'স্ত্রীধন' বা স্ত্রীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দুরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী, তাঁহারা বহু দেবদেবীর পূজা করেন, কিন্তু ইহা সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। বিদ্বান ও শিক্ষিত হিন্দুরা এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসী। দেবদেবীর মূর্তি-পূজার আধিক্যের জন্য ভারতবর্ষে বহু দেবালয় আছে।

ন্যায়বিচার সম্বন্ধে বিরূণী লিখিয়াছেন যে অভিযোগ লিখিতভাবে বা মুখে পেশ করা হয়, তারপর সাক্ষীদের বিবৃতি বিচার করিয়া অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড দেওয়া হয়। ফৌজদারী দণ্ডবিধি মোটেই কঠোর নহে, হিন্দুদের দণ্ডনীতি খ্রীষ্টানদের মতো মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম ও অধর্ম, ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্য—এই দুইয়ের মানদণ্ডে সমস্ত সামাজিক আচরণ বিচার করা হয়, এবং বলা হয় যে ধর্মাচরণই হিন্দু-জীবনের আদর্শ। তবে আইনের চোখে মানুষকে বা ব্যক্তিকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় না। যেমন ব্রাহ্মণরা যত গুরুতর অপরাধই করুন, প্রাণদণ্ড তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এমন কি ব্রাহ্মণরা খুন করিলেও তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হয় না, উপবাস প্রার্থনা ইত্যাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অপহৃত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য

অনুযায়ী চুরি-ডাকাতির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত করিয়া দিবার বিধানও আছে। রাজা ভূমির উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ

গ্রহণ করেন, শ্রমিক কারিগর ও বণিকরা আয়কর দিয়া থাকেন। কেবল ব্রাহ্মণদের কোন 'ট্যাক্স' বা 'কর' দিতে হয় না।

একাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, গজনীর তুর্কীদের ভারত-অভিযানের সময়, অল্‌বিরুণী ভারতের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে অকল্যাণ-সূচক যে অন্তর্বিরোধের ইঙ্গিত আছে তাহা লক্ষণীয়। প্রধানত রাজপুতবংশের রাজারা তখন উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অধিষ্ঠিত। রাজপুতরা শৌর্যবীর্য ও দেশাত্মবোধের প্রতিমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ক্ষমতালোলুপতার জন্য রাষ্ট্রীয় সংহতি ও একতা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বৈদেশিক আক্রমণ ও প্রভুত্ব বিস্তার অনেক সহজসাধ্য হইয়াছিল।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি

কিন্তু এই রাজপুতরা কাহারা? নিঃসন্দেহে রাজপুতরা আজ ভারতীয়। যেকালের কথা বলা হইতেছে তখনও রাজপুতরা মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন এবং হিন্দুধর্মেও গভীর অনুরাগী ছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, রাজপুতদের উৎপত্তি হইল কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বহুদিন ইহা লইয়া বিতর্কও হইয়াছে। কেহ বলেন যে রাজপুতরা সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে উদ্‌ভূত। সম্প্রতি রাজপুতজাতির ইতিহাসরচয়িতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা এই মত সমর্থন করাতে ইহার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না।

গুর্জর রাজ্য

গুর্জর রাজ্যের কেন্দ্র দক্ষিণ-রাজস্থানে সপ্তম শতাব্দীতে গড়িয়া ওঠে। পরে প্রতিহার (বা পরিহার) নামে তাহাদেরই একটি শাখা উজ্জয়িনী ও কনৌজ অধিকার করিয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। কনৌজ লইয়া বাংলার পালরাজাদের সহিত ইঁহাদের বিরোধ হয়। নবম ও দশম শতকে **ভোজদেব** (৮৪০-৯০) ও তাঁহার পুত্র **মহেন্দ্রপাল** (৮৯০-৯১০) এই বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ভোজ ও মহেন্দ্রপাল উভয়ের সঙ্গেই বাংলার পালরাজাদের বিরোধ চলিয়াছিল। এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিহার-রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরিতে থাকে দশম শতক হইতে, ভোজদেবের পৌত্র মহীপালদেবের রাজত্বকালে (৯১০-৪০)। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়-ইন্দ্র এই সময় ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ অধিকার করিয়া প্রতিহার-রাজ্যের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ফিরিয়া যান। এই আঘাত সামলাইয়া ওঠা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। ইহার পর অল্পকালের মধ্যে গজনীর তুর্কীদের দুর্ধর্ষ অভিযান আরম্ভ হয় এবং রাজপুত-রাজাদের এই পারস্পরিক বিরোধের জন্য তাঁহাদের পক্ষে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। কনৌজের প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের মতো কেহ কেহ আবার বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতদের অসাধারণ বীরত্ব, পৌরুষ ও দেশাত্মবোধ সবই প্রায় ব্যর্থ হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবে। বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তিও এই অনৈক্যের রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

রাজপুত-রাজাদের বিরোধ

রাজপুত-রাজাদের মধ্যে বিরোধের কথা আগে বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত এই বিরোধ ও রাজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্বক্ষণে উত্তরভারতের রাজপুত রাজবংশের মধ্যে প্রধান ছিলেন আজমীরের চৌহান রাজারা ও কনৌজের প্রতিহার-পরবর্তী গহড়ওয়াল রাজারা। গহড়ওয়ালরাজ **জয়চাঁদ** ও চৌহানরাজ **পৃথ্বীরাজ**—দুইজনের মধ্যে ঘোর শত্রুতা ছিল। গুজরাটের চৌলুক্যরাজের সহিতও চৌহানরাজের সম্প্রীতি ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রাজপুত রাজাদের এই বিরোধ প্রায় বংশানুক্রমিক হইয়া গিয়াছিল। এই অন্তর্বিরোধের সুযোগে ভারতে মুসলমান-বিজয় ও মুসলমান-রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ ঘুরীর অভিযান

আফ্‌গানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী ও হীরাটের মধ্যবর্তী-স্থান 'ঘুর' কেন্দ্র করিয়া আর-একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তুর্কীদের। তুর্কীদেরই একটি শাখা, ইহাদের 'সালজুক তুর্কী' বলিত। ঘুরবংশীয় তুর্কীরা গজনীবংশীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠেন। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গজনীরাজবংশের দ্রুত অবনতি হয় এবং তাহাদের দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া ঘুরবংশীয়রা গজনীরাজ্য অধিকার করেন। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যিনি গজনী অধিকার করেন তাঁহার নাম গিয়াসউদ্দিন। তাঁহার ভাই মৈজউদ্দিনও কৃতী পুরুষ ছিলেন। ভারত অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন ঘুরবংশীয় এই মৈজউদ্দিন, ইতিহাসে যিনি **মহম্মদ ঘুরী** নামে খ্যাত।

দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পর্বে, ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, মহম্মদ ঘুরী ভারত-অভিযান আরম্ভ করিয়া প্রথমে মুলতান অধিকার করেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য নগর ও দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। ঘুরীর অগ্রগতিতে রাজপুত রাজারা সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠেন। এই সময় উত্তরভারতে চারটি রাজপুত রাজবংশ প্রধান ছিল—

১। কনৌজের **গহড়ওয়াল** বা **রাঠোর** রাজবংশ।

২। দিল্লী ও আজমীরের **চৌহান** রাজবংশ। দিল্লীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ৯৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। গুজরাটের বাঘেল রাজবংশ।

৪। বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল রাজবংশ।

১১৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিতে গিয়া মহম্মদ ঘুরী বাঘেলরাজের কাছে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তারপর পেশোয়ার, লাহোর প্রভৃতি অধিকার করেন। পাঞ্জাব অধিকারভুক্ত হইবার পর ঘুরী চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘুরীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয় দুইবার তরাইনে।

তরাইনের যুদ্ধ ১১৯১

থানেশ্বর ও কর্ণলের মধ্যে, থানেশ্বর হইতে ১৪ মাইল দূরে, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে চৌহানরাজ বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদ ঘুরীর সম্মুখীন হন। ফিরিস্তার মতে তাঁহার প্রায় ২০০,০০০ (দুইলক্ষ) অশ্বারোহী ও ৩০০০ (তিনহাজার) গজারোহী ছিল। কনৌজের রাথোররাজ জয়চাঁদ এই প্রতিরোধ-সংগ্রামে পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেন নাই, কারণ তাঁহার কন্যাকে চৌহানরাজ জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আক্রোশ ছিল। বিনা সাহায্যেই পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার ভাই গোবিন্দ রায় (বা চাঁদ রায়) প্রচণ্ড যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন, মহম্মদ ঘুরী নিজেও আহত হন। অবশেষে ঘুরী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করেন এবং বহুদূর পর্যন্ত রাজপুত সৈন্যরা তুর্কী সৈন্যদের তাড়াইয়া লইয়া যায়।

গজনী ফিরিয়া গিয়া মহম্মদ ঘুরী পরাজয়ের গ্লানিতে গজরাইতে থাকেন। পরবর্তী বছর ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে গজনী হইতে মহম্মদ ঘুরী তরাইন অভিমুখে যাত্রা করেন। পৃথ্বীরাজ সমসাময়িক রাজপুত-রাজাদের কাছে আবেদন করেন ঘুরীর অভিযান প্রতিরোধ করিয়া হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তরাইনের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সুবিস্তীর্ণ হিন্দুযুগের ও হিন্দুরাজত্বের অবসান হয় তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে। ভারতের আকাশে ইসলামের সূর্যোদয় হয়।
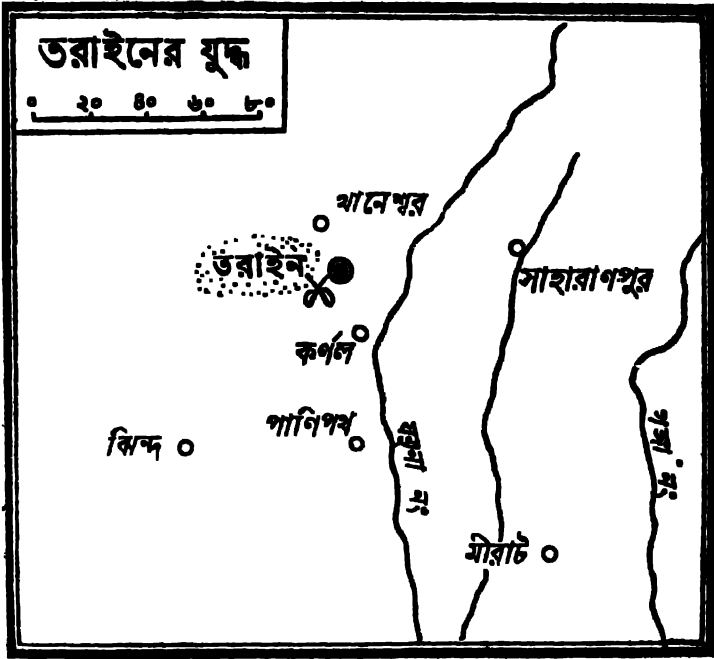
কুতুবউদ্দিনের স্থলতানৎ প্রতিষ্ঠা

আজমীর জয় করিয়া মহম্মদ ঘরবাড়ী ও বহু দেবালয় ধ্বংস করেন। প্রচুর ধনসম্পদ লইয়া বিজয়ী ঘুরী গজনী ফিরিয়া যান। কিন্তু বিজিত ভারতরাজ্য ছাড়িয়া যান না। তাঁহার একান্ত অনুগত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়া যান। কুতুব কেবল নূতন রাজ্য রক্ষা করিবেন না, তাহা বিস্তৃত করিবেন এবং ভারতে মুসলমানরাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহাই তাঁহার কর্তব্য। এই কর্তব্য কুতুব পালন করিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে মীরাট, কোল (আলিগড়ের কাছে) ও দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লীতে তাঁহার রাজ্যশাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। দিল্লী হইতে কনৌজ যাত্রা করিয়া রাঠোররাজ পৃথ্বীরাজ-বিদ্বেষী জয়চাঁদকে তিনি পরাজিত করেন (১১৯৩)।

১১৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয় অনুচর মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খলজী বিহার জয় করিয়া কুতুব কর্তৃক পুরস্কৃত হন। বছর দুই পরে বখতিয়ার বাংলাদেশও অভিযান করিয়া জয় করেন। ভারতে মুসলমানরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

QUESTIONS

1. Give an estimate of the historical significance of the Arab invasion of Sind.

2. Briefly narrate the story of the advent of the Muslim power in India till the establishment of the Delhi Sultanate by Kutubuddin.

3. "Not so fanatical as Mahmud, Muhammad was certainly more political than his great predecessor" (Iswariprasad). Discuss the statement with reference to the Indian expeditions of Mahmud of Gazni and Muhammad of Ghor:

4. Who was Alberuni? Give a short account of his observations on Indian social and cultural life.

চতুর্দশ অধ্যায়

ইলতুৎমিস ও বলবন

হিন্দুস্থানে মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মহম্মদ ঘুরী, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরীর মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিল্লীর আমীর ও সেনাপতিরা তাঁহাকেই 'সুলতান' মনোনীত করেন। মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্র স্থাপিত হয় দিল্লীতে এবং কুতুব এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 'আইবেক' বা 'আইবক' কথার অর্থ 'গোলাম', কুতুব নিজেও গোলাম ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুলতানবংশকে **গোলামবংশ** বলা হয়।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬-১০

কুতুব মাত্র চার বছর রাজত্ব করার সুযোগ পান এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে সুশাসক বলিয়া পরিচিত হন। কাহিনীকার হাসান নিজামী মুক্তকণ্ঠে কুতুবের গুণগান করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার রাজত্বকালে নাকি বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত। তিনি ধর্মপ্রাণ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, তবে দুষ্টকে দমন করিতে দ্বিধা করিতেন না। উদারতা ও কঠোরতার এক বিচিত্র মিশ্রণ হইয়াছিল তাঁহার চরিত্রে। এক কথায় যেমন তিনি লক্ষ টাকা দান করিতে পারিতেন, তেমনি লক্ষ মানুষের প্রাণ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার শাসনে দুষ্টদের দৌরাত্ম্য বাড়ে নাই, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধও তীব্র হয় নাই। 'চৌগান' খেলিতে গিয়া (আধুনিক পোলো খেলার মতো) ঘোড়ার পিঠের উপর হইতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ওমরাহরা ইলতুৎমিসকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

CHAPTER XIV; Kutubuddin—Iltutmish—his contrbution to the development of the Sultanate. Riziyya. Balban's measures against the Turkish nobles, Mongol menace, rebellion in Bengal—Balban's contribution to the Sultanate.

ইলতুৎমিস ১২১১-৩৬

কুতুব ছাড়াও মহম্মদ ঘুরীর আরও দুইজন ক্ষমতাবান গোলাম ছিলেন—নাসিরউদ্দিন কুবাচা ও তাজউদ্দিন ইলতুজ। দিল্লীর মসনদের মোহ ইহারা ছাড়িতে পারেন নাই। ইহারা কেহ নূতন সুলতানকে মানিতে চাহিলেন না। ইলতুৎমিস সিংহাসনের চারিদিকে ঘোর চক্রান্তের বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইলেন না, স্থির বুদ্ধি ও সাহস লইয়া নির্মমভাবে তাহা দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে দিল্লী বুদাউন অযোধ্যা বারাণসী ইত্যাদি অঞ্চলে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১২১৬ সনে তরাইনের কাছে যুদ্ধ করিয়া তিনি তাজউদ্দিনকে পরাজিত করেন। নাসিরের অধিকার হইতে লাহোর কাড়িয়া লন, কেবল সিন্ধু প্রদেশ নাসিরেব দখলে থাকে। ১২২৮ সনে মূলতান ও উচ দখল করিয়া নিষ্কণ্টক হন। নাসিরউদ্দিন সিন্ধুর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।

চেঙ্গিস খাঁর আমলে মোঙ্গলবা এসিয়ায় একটি শক্তিশালী জাতিরূপে গড়িয়া ওঠে। চীন মধ্যএসিয়া ও পশ্চিমএসিয়া অধিকার করিতে তাহাদের বেশীদিন সময় লাগে নাই। মোঙ্গলবা সিন্ধু ও পশ্চিম-পাঞ্জাব অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়, কারণ এদেশের অত্যধিক গরম তাহাদেব সহ্য হয় না। ১২২১ সনে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের প্রথম আবির্ভাব হয়। নাসিরউদ্দিনের রাজ্য ইলতুৎমিসের অধিকারভুক্ত হইলে তাঁহাকে মোঙ্গলদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে হয়। আফগানিস্তান হইতে তখন মোঙ্গলবা-ভারত-লুণ্ঠনের অভিযান চালাইত। ইলতুৎমিস ইহা প্রতিরোধ করেন।

বখ্‌তিয়ারকে রোগশয্যায় হত্যা করিয়া আলি মরদন বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বখ্‌তিয়ারের বন্ধুরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লন। হিসামউদ্দিন নামে একজন সুযোগ্য কর্মচারী 'গিয়াসউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়-লখ্‌নৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১২১৩)। জাজনগর (উড়িষ্যা), ত্রিহুত (মিথিলা), বঙ্গ ও কামরূপও জয় করিয়া তিনি রাজাদের করদানে সম্মত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাতন্ত্র্য দিল্লীর সুলতানের কাছে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিসের পুত্র যুদ্ধযাত্রা করেন (১২২৭) এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সুলতানপুত্রের হঠাৎ-মৃত্যুর পর
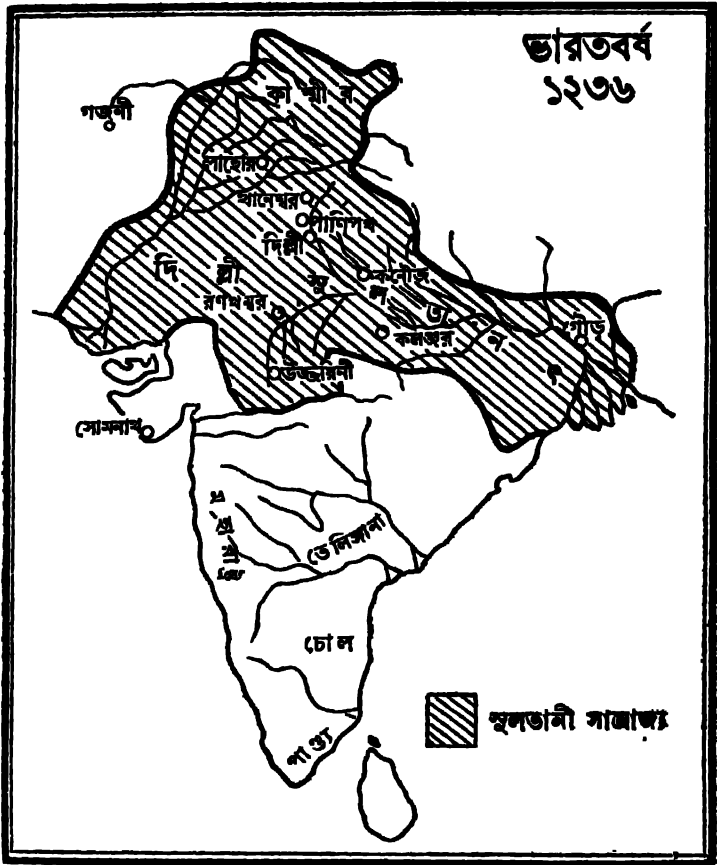
ঘিয়াসের অনুচর ইখতিয়ারউদ্দিন বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ইলতুৎমিস তাঁহাকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া বাংলাকে দিল্লীর অধীনে আনেন (১২৩০-৩১)। তারপর তিনি গোয়ালিয়র অধিকার করেন (১২৩২) এবং মালব আক্রমণ করিয়া ভিলসা ও উজ্জয়িনী নগর লুণ্ঠন করেন। ১২২৮ সনে ইলতুৎমিস বাগদাদের খলিফার কাছ হইতে ইসলামের রাজসম্মান লাভ করেন। খলিফার এই সম্মান প্রদর্শনে ভারতের মুসলমানরাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং রাজশক্তির কাছে ইসলামধর্মীদের মাথা হেঁট করিতে বাধ্য করা হয়। **খিলাফৎ** লাভের ফলে ভারতের তুর্কীসাম্রাজ্য ইসলামের অংশ বলিয়া গৃহীত হয় এবং **সুলতান** রাষ্ট্রশক্তির উৎস ও প্রতিভূরূপে স্বীকৃত হন।

সুলতানৎএ ইলতুৎমিসের দান

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মুসলমান গোলাম-সুলতানবংশের সত্যকার প্রতিষ্ঠাতা হইলেন ইলতুৎমিস। তরুণ বয়সে ভাগ্য তাঁহাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে এবং বহু বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া ধাপে ধাপে তিনি ক্ষমতার উচ্চশৃঙ্গে উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রভু কুতুব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন 'বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিৎ নির্মাণ কবিতে পারেন নাই। ইলতুৎমিস সেই ভিৎ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার জন্য ঘরে-বাইরে শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। পাঞ্জাব হইতে বাংলা-বিহার পর্যন্ত বিদ্রোহী ও চক্রান্তকারীদের দমন করিয়া তিনি দিল্লীর সুলতানের একাধিপত্য আক্রমণ প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সফল হইয়াছিলেন। মোঙ্গলদেব প্রথম ভারত হইতে বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিয়া তিনি শিশুরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিবাপদ করিয়াছিলেন। রাজপুত রাজাদের সম্পূর্ণ দমন করিতে না পারিলেও তাঁহাদের প্রবল শত্রু হইতে দেন নাই। এইসব কঠিন বাজকর্তব্য পালন করিয়াও ইলতুৎমিস ধর্ম ও ন্যায়-বিচারের প্রতি মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইতেন। ইলতুৎমিসের অন্যতম কীর্তি হইল **কুতুব মিনার** নির্মাণ। সুলতান কুতুবউদ্দিন এই মিনার নির্মাণ করেন নাই। ইহাকে কুতুব সাহেবের 'লাট' বলা হয়, কারণ ইহা বিখ্যাত মুসলমান পীর খাজা কুতুবউদ্দিনের নামে নির্মিত। ইলতুৎমিস তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিতেন, তাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে এই মিনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাজিয়া বেগম ১২৩৬-৪০

ইলতুৎমিস তাঁহার পুত্রদের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা জানিতেন, তাই কন্যা রাজিয়াকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ওমরাহরা অনেক ওজর-আপত্তি করেন, ধর্মের দোহাই দেন, কিন্তু স্থিরচিত্ত সুলতান কোন-কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই। রাজিয়া নারী, তাঁহার পক্ষে রাজক্ষমতার অধিকারী হওয়া নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই অভিযোগও শেষ পর্যন্ত টিকিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশরে ও পারস্যে মুসলমান নারীরা রাজত্ব করিয়াছেন, কাজেই ধর্মের গোঁড়ামি রাজিয়ার সিংহাসনলাভে বাধা হইতে পারিল না।

রাজিয়া তাঁহার মুদ্রার উপর খোদাই করিয়া দিলেন, 'উমদৎ-উল-নিশান', অর্থাৎ 'প্রতিভাবতী মহিলা'। কাহিনীকারেরা তাঁহাকে বিদুষী, দূরদর্শী,

গুণানুরাগী, সাহসী ও বুদ্ধিমতী মহিলা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাজিয়া রাজোচিত ভঙ্গিমায় চলাফেরা করিতেন। 'জেনানা' মহলের অন্তরাল হইতে বাহিরে লোকচক্ষুর সামনে আসিয়া, মাথায় পুরুষের মতো শিরস্ত্রাণ বাঁধিয়া প্রকাশ্য দরবারে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমান প্রধানদের তিনি কঠোর হাতে দমন করিয়াছেন, নারীসুলভ করুণায় বিগলিত হন নাই। তাঁহার পুরুষোচিত আচার-ব্যবহারে গোঁড়া মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কাজেই সুলতানী মসনদে বেশীদিন বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

অল্পকালের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে আমীর, মালিক ও উলামাদের চক্রান্ত পাকাইয়া ওঠে। রাজপুরীর অধ্যক্ষ ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন, ভাতিন্দা ও লাহোরের শাসক, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সরহিন্দের শাসক আলতুনিয়াও বিদ্রোহী হন। সৈন্যসামন্ত লইযা রাজিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন। যুদ্ধে তাঁহার প্রিয় হাব্‌সী গোলাম ইযাকুৎ নিহত হন এবং তিনিও বন্দী হন। আলতুনিয়াকে বিবাহ করিযা রাজিয়া দিল্লী অভিযান করিযা পুনরধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার ভাই বহরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার হাতেই আলতুনিয়া-সহ রাজিয়া নিহত হন (১৫ অক্টোবর ১২৪০)। সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকাল শেষ হইয়া যায়।

সুলতানা রাজিয়ার পরে ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র বহরাম শাহ (১২৪০-৪২), পৌত্র মাসুদ শাহ (১২৪২-৪৬) ও কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ (১২৪৬-৬৫) দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বহরাম ও মাসুদ ছিলেন গোলামচক্রের ('চল্লিশচক্র' বলিত) হাতের পুতুল, প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা তাঁহারা ভোগ করিতেন না। শাসন করিতেন মালিক ও আমীররা। নাসিরউদ্দিনও তাই ছিলেন, তবে এই 'চল্লিশ গোলামচক্রের' অন্যতম নেতা বলবন ক্রমে গোলামচক্রাধিপতি তো বটেই, সুলতানের সমকক্ষ হইয়া ওঠেন। নাসিরউদ্দিনের দীর্ঘ ২০ বছর রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় বলবন ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান পরামর্শদাতা, বিপদের কাণ্ডারী ও কর্ণধার, সুলতান ধর্মকর্ম করিতেন, কাজী-মোল্লাদের গুণগানে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। আর বলবন করিতেন যাবতীয় রাজকর্ম। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন দিল্লীর সুলতান হন।

ঘিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৫-৮৭

নাসিরউদ্দিনের রাজ্য পরিচালনার সময় বলবন মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন যে স্থলতানের রাজমুকুট অনেক অস্বস্তি ও অশান্তির কারণ হইবে, সিংহাসনে বসিয়া সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। গোলামচক্রের দুঃস্বপ্ন তাঁহার কাছে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মনে হইল। দীর্ঘ ২০ বছর ধরিয়া নাসিরের আমলে তিনি দেখিয়াছেন কিভাবে স্থলতানের ভাগ্য লইয়া এই 'চল্লিশ বান্দাচক্র' ছিনিমিনি খেলেন। তাই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল অভিজাত গোলাম-চক্রের বা আমীরগোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য চূর্ণ করা। স্থলতান যে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রধান ও একমাত্র উৎস, আর কেহ তাহার কণামাত্রেরও ধারক বা বাহক নহে—ইহা বলবন সর্বপ্রথম অমাত্যগোষ্ঠীকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন। ইহাতেও বলবন নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে আমীর অমাত্যদের ইজ্জৎ বা আভিজাত্য বলিয়া আলাদা কিছু নাই, যাহা আছে তাহা থাকা না-থাকা সম্পূর্ণ স্থলতানের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে। প্রথমে তিনি বুদাউনের শাসককে একজন ভৃত্যহত্যার অপরাধে প্রকাশ্য রাজপথে ধরিয়া আনিয়া বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেন। আরও একাধিক খাঁ এইভাবে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমীর খাঁ নামে একজন শাসক বাংলার বিদ্রোহী তুগ্রিল খাঁকে জব্দ করিতে পারেন নাই বলিয়া অযোধ্যার প্রবেশপথে স্থলতান তাঁহাকে প্রকাশ্য ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দিতে হুকুম দেন। এইরকম আচরণের পর অমাত্যগোষ্ঠী বুঝিয়াছিলেন যে বলবন তাঁহাদের কোন স্পর্ধা সহ্য করিবেন না, চক্র ও চক্রান্ত তিনি কঠোরভাবে দমন করিবেন।

সামরিক সংস্কার। সামরিক কর্মচারীরা বৃত্তি হিসাবে জমি ভোগ করিতেন। সামরিক কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোন চেতনা ছিল না, কেবল পরম নিশ্চিন্তে বৃত্তি ভোগ করার বেশ আগ্রহ ছিল। বলবন এই অপদার্থ গলগ্রহদের উচ্ছেদ করিয়া সামরিক বিভাগ সবল ও সক্রিয় করার ব্যবস্থা করেন। বৃত্তিভোগী কর্মচারীদের তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি অক্ষম বৃদ্ধদের এবং বিধবা ও অসহায় অনাথদের বৃত্তি না দিয়া পেন্সন বা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন। কেবল তরুণ ও যুবকদের সেনাবিভাগে নিযুক্ত করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সংস্কারের ফলে বলবনের আমলে মুসলমান সেনাবাহিনীর রণশক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বাংলার বিদ্রোহ দমন। বখতিয়ার খলজীর সময় হইতে দিল্লীর স্থলতানরা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তাঁহাদের আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক বারনী বাঙালীর স্বভাবই 'বিদ্রোহ করা' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। বাংলার শাসক ছিলেন তখন তুগ্রিল খাঁ। তুগ্রিলকে বলবন গোলামরূপে কিনিয়াছিলেন এবং বলবনেরই আশ্রয়ে তুগ্রিলের তেজ বাড়িতে থাকে। পারিষদরা তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে বলবন বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার দুই পুত্র সীমান্তে মোঙ্গলদের সামলাইতে ব্যস্ত, অতএব তাঁহার দিক হইতে রাজশক্তি দখল করার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। সিংহাসনের লোভে তুগ্রিলের মাথা ঘুরিয়া গেল, জাজনগর আক্রমণ করিয়া বহু ধনরত্ন তিনি লুট করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, তুগ্রিল দিল্লীর স্থলতান হইতে চাহিলেন। কিন্তু দিল্লী অনেক দূর মনে করিয়া তিনি আগেই বাংলাদেশে 'স্থলতান উপাধি' গ্রহণ করিয়া নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। গোলামের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার জন্য বলবন অযোধ্যার শাসক আমীর খাঁকে আদেশ দিলেন যুদ্ধযাত্রা করিতে। একবার নহে, তিনবার আমীরের অভিযান ব্যর্থ হইল। ইহার পর বৃদ্ধ বলবন নিজে প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যসহ পুত্র বুঘরা খাঁকে সঙ্গে লইয়া বাংলা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং প্রায় তিন বছর তুগ্রিলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করেন। বিদ্রোহী তুগ্রিলের মাথা দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে বলবন বাংলার রাজধানী লখ্‌নৌতিতে ফিরিয়া আসেন। তারপর পুত্র বুঘরা খাঁকে বাংলার শাসনভার দিয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া যান।

মোঙ্গলদের অভিযান প্রতিরোধ। মোঙ্গলদের অভিযানের বিপদ সম্বন্ধে বলবন সর্বদা সচেতন ছিলেন। একবার তাঁহার পারিষদরা তাঁহাকে মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে সাম্রাজ্য-লোভে তিনি বিদেশীদের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া দিতে চান না। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা তিনি অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ খাঁকে মুলতান, সিন্ধু ও লাহোরের শাসনভার দিয়াছিলেন। মোগল আক্রমণেই মহম্মদ নিহত হন (১২৮৬)। স্থলতানের প্রিয় পুত্র ছিলেন মহম্মদ, তাঁহাকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী

মনোনীত করিয়াছিলেন। এক বছরের মধ্যে মানসিক কষ্টে ও বার্ধক্যের অসুস্থতায় বলবনের মৃত্যু হয় (১২৮৭)।

সুলতানৎ-এ বলবনের দান। গোলামবংশের সুলতানদের মধ্যে বলবনের মতো দীর্ঘ ৪০ বছর রাষ্ট্র-পরিচালনার অভিজ্ঞতা আর কাহারও ছিল না। এই ৪০ বছরের মধ্যে ২০ বছর (১২৪৬-৬৫) তিনি নাসিরউদ্দিনের সুলতানত্বকালে রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, এবং তারপর বাকি ২০ বছর নিজে সুলতান হইয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। গোলামবংশের সুলতানদের উপর ভারতে মুসলমান রাষ্ট্রের প্রাথমিক লালনপালনের ভার পড়িয়াছিল। ইতিহাসের এই গুরুদায়িত্ব কুতুবউদ্দিন পালন করিবার সুযোগ পান নাই। ইলতুৎমিস যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরচক্রের দুরভিসন্ধির জন্য তাহা যতদূর করা প্রয়োজন ছিল তাহা করিতে পারেন নাই। বলবন প্রতিকূল রাজনীতিক পরিবেশের মধ্যেও কতকটা অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন বলা চলে। সেকালের রাজ্যশাসনের প্রধান সমস্যাটি তিনি বুঝিতে পারিয়া তাহা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্যাটি হইল অমাত্যদের চক্রান্ত ও ক্ষমতা-লোলুপতা—বিষাক্ত বীজাণুর মতো যাহা রাষ্ট্রদেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ঝাঁঝরা করিয়া ফেলিয়াছিল। এই অমাত্যচক্রান্তের বীজাণু তিনি সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কার জন্য তিনি যে রাজ্যবিস্তারে অনর্থক শক্তিক্ষয় করেন নাই, তাহাও তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ভারতের গোলাম-বংশের সুলতানদের মধ্যে বলবন নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ, এবং মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ-নির্মাণে তাঁহার দান অসামান্য।

QUESTIONS

1. What was the contribution of Iltutmish to the development of Delhi Sultanate ?
2. Give a brief account of Balban's reign.
3. What measures were taken by Balban for the consolidation of the Delhi Sultanate ?
4. Write notes on :
   - (a) Kutub-minar
   - (b) Kutubuddin Aibek
   - (c) Khilafat
   - (d) Raziyya

পঞ্চদশ অধ্যায়

খল্‌জী ও তুঘলকবংশ

সুলতান বলবনের মৃত্যুর দুই তিন বছরের মধ্যে মুসলমান গোলাম-রাজবংশের রাজত্ব শেষ হইয়া যায়। ইহার মধ্যে সুলতানদের একজন দেহরক্ষী ক্রমে আমীরের মর্যাদা লাভ করিয়া একেবারে সুলতানদের সিংহাসন পর্যন্ত দখল করিয়া বসেন। এই দেহরক্ষীর নাম জালালউদ্দিন, উপাধি 'খল্‌জী'। বলবনের পর সুলতান কায়কোবাদের (১২৮৭-৯০) আমলে জালালউদ্দিন আমীরশ্রেষ্ঠ হন এবং কায়কোবাদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্র কায়ুরমাসকে হত্যা করিয়া তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। গোলামবংশের অবসান ও **খলজীবংশের** প্রতিষ্ঠা হয়। জালালউদ্দিন সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অসাধুতার যুগে সাধু সুলতানের যে-রকম করুণ মর্মান্তিক পরিণতি হইতে পারে তাঁহারও সেই পরিণতি হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলতান হন।

আলাউদ্দিন খল্‌জী ১২৯৬-১৩১৬

সুলতান হইয়া দিল্লী গিয়া সিংহাসনে বসিতে আলাউদ্দিনকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ অমাত্যদের প্রচুর সোনার চাক্‌তি বিতরণ করিয়া আলাউদ্দিন শান্ত করিলেন। তাঁহাদের উচ্চ রাজপদের লোভ দেখাইয়াও ভুলান হইল। দুইহাতে সোনা ছড়াইয়া সেনাবাহিনীতে দলে দলে লোক ভর্তি করা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন ৫৬ হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ১২৯৬ সনের শেষে যখন তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন তখন স্বর্ণমুদ্রা ও রাজমর্যাদার লোভে সকলে জালাল হত্যার অপরাধ ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

CHAPTER XV: The Khaljis. Alauddin, administration, military expeditions, economic measures—Mongols. Nature of Khalji imperialism—Historian Barani—poet Amir Khusrau, and saint Nijamuddin Aulia.

Tughluq Dynasty—Muhammad Bin Tughluq his reign, effects of his measures. Ibn Batutah—Firuz Shah, theolgiocal reaction—Rebellion in Bengal and Sind—revival of Jagir—beneficent measures, his failure.

বাহিরের শত্রু মোঙ্গলদের প্রতিরোধ। বাহিরের শত্রু মোঙ্গলরা এই সময় বারংবার উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হানা দিতে লাগিল। আলাউদ্দিন সিংহাসনে বসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা অভিযান করিয়া ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছরে (১২৯৭) প্রায় একলক্ষ মোঙ্গলসেনা মুলতান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হয়, কিন্তু উলুগখাঁর অধীনে সুলতানের সৈন্যরা তাহাদের পরাজিত করে। মোঙ্গলরা প্রচণ্ড মার খাইয়া ফিরিয়া যায়। কিছুদিন পরে আবার তাহারা অভিযান করে, এবং এইবার মোঙ্গল সেনাপতি প্রায় দুই হাজার অনুচরসহ বন্দী হইয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় দিল্লী প্রেরিত হন। ১২৯৯ সনে মোঙ্গলনেতা কুতলুগ খাজার অধীনে অসংখ্য মোঙ্গলসৈন্য দিল্লী অভিমুখে অভিযান করে। চারিদিকে লোকজন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে আর্তনাদ করিতে থাকে। সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের লইয়া একটি সমর-পরিষদ গঠন করিয়া সুলতান আলাউদ্দিন এই দুর্ধর্ষ আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করেন। জাফর খাঁ ও উলুগ খাঁর সহিত আলাউদ্দিন নিজেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মোঙ্গলরা পরাজিত হয়, কিন্তু সুলতানের বীর সেনাপতি জাফর খাঁ যুদ্ধে নিহত হন।

১৩০৪ সনে মোঙ্গলরা লাহোরের উত্তরদিকে অভিযান করিয়া শিবালিক পর্বতমালা ঘুরিয়া, ভারতের ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল সৈন্য লইয়া মোঙ্গলরা আবার অভিযান করে এবং যুদ্ধে তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। মোঙ্গলরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ভারতসীমান্ত ছাড়িয়া পলায়ন করে। ইহার পর হইতে হিন্দুস্থানের নাম শুনিলে মোঙ্গলরা ভয়ে কাঁপিত, মুখ দিয়া কথা বাহির হইত না। দিল্লীর সুলতানরা সকলেই মোঙ্গলদের অভিযান প্রতিরোধ করিয়াছেন, কিন্তু আলাউদ্দিন তাহাদের এমন নির্মম শিক্ষা দিয়াছিলেন যে দীর্ঘদিন তাহারা তাহা ভুলিতে পারে নাই। সীমান্তের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করিয়া তিনি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাও দৃঢ় করিয়াছিলেন।

গুজরাট ও উত্তরভারত বিজয়। আলাউদ্দিনের আদেশে উলুগ খাঁ ও নসরত খাঁ গুজরাট-রাজ্য আক্রমণ করেন (১২৯৭)। রাজা কর্ণদেব পলায়ন করিলেন, রাণী কমলাদেবী বন্দী হইলেন। মামুদের ধ্বংসাভিযানের পর সোমনাথের মন্দিরে যে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল তাহা উৎপাটন
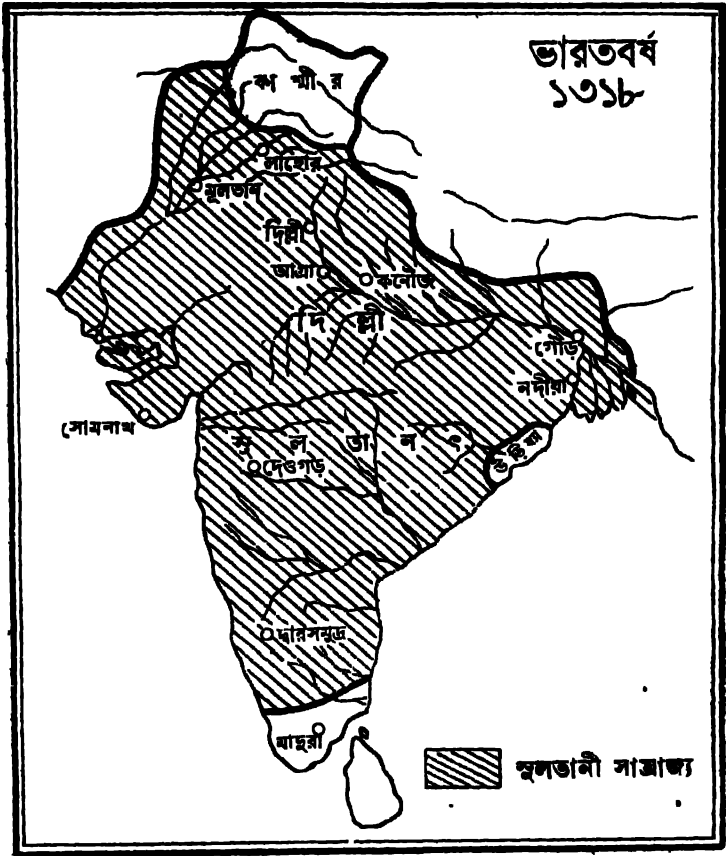
করিয়া সুলতানকে উপঢৌকন পাঠাইলেন বিজয়ী সেনাপতিরা। রাজা কর্ণ ও তাঁহার কন্যা দেবলদেবী যাদবরাজ রামদেবের কাছে দেবগিরিতে আশ্রয় লইলেন। ক্যাম্বে আক্রমণ করিয়া উল্লসিত নসরত ধনিক হিন্দু সদাগরদের ধনদৌলত লুট করিলেন এবং 'কাফুর' নামে একজন সুদর্শন খোজাকে ক্রয় করিলেন। সমস্ত ধনরত্ন অপেক্ষা মূল্যবান হইল এই গোলাম খোজাটি। কাফুরের রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাষ্ট্রের বিশস্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই কাফুরই বিখ্যাত 'মালিক কাফুর', সুলতান আলাউদ্দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিমান সেনানায়ক।

গুজরাট-জয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া রাজপুতশক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন রণথম্বর দুর্গ আক্রমণ করিলেন (১২৯৯)। তারপর রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ রাজ্য

মেবারের দিকে সুলতান যুদ্ধযাত্রা করিলেন (১৩০৩), উদ্দেশ্য হইল মেবারের দুর্ভেদ্য পর্বতশীর্ষের দুর্গ চিতোর জয় করা। ইহা ছাড়া আরও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, রানা রতনসিংহের পরমাসুন্দরী রানী পদ্মিনীকে ছিনাইয়া আনা। চিতোরদুর্গের সামনে গোরা ও বাদল নামে দুইজন তরুণ রাজপুতবীর একদল সৈন্য লইয়া অমিতবিক্রমে আলাউদ্দিনের অভিযান রুখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নিরুপায় হইয়া অবশেষে রাজপুতবীর ও বীরাঙ্গনারা পদ্মিনীসহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেন। টড্ তাঁহার 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই কাহিনীর মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়াছেন। সম্প্রতি কোন কোন ঐতিহাসিক পদ্মিনীর উপাখ্যানকে সত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের মতে রাজপুত বীরাঙ্গনাদের আত্মোৎসর্গের ইতিহাস পরে পদ্মিনীকে কেন্দ্র করিয়া কাল্পনিক 'রোমান্স' বা কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

চিতোর অভিযানের সময় বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত **আমীর খসরু** আলাউদ্দিনের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট, সোমবার চিতোর দুর্গ জয় করিয়া সুলতান প্রায় ৩০ হাজার হিন্দুকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং পুত্র খিজির খাঁকে চিতোর রাজ্যের শাসনভার দিয়া তাহার নূতন নামকরণ করেন 'খিজিরাবাদ'। চিতোর অধিকারের পর আলাউদ্দিন মালব মাণ্ডু উজ্জয়িনী ধারানগরী ও চান্দেরী জয় করিয়া ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তরভারতের অধিপতি হন। তারপর দক্ষিণ-ভারতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়।

দাক্ষিণাত্য অভিযান ও মালিক কাফুর। সুলতান হইবার আগে পিতৃব্য জালালের বিনা অনুমতিতে আলাউদ্দিন যাদবরাজের বিরুদ্ধে দেবগিরিতে অভিযান করিয়াছিলেন (১২৯৬)। সুলতানের প্রিয় গোলাম **মালিক কাফুর** সসৈন্যে দেবগিরি যাত্রা করেন (১৩০৭), রামদেবপুত্র সঙ্গম পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মালিক কাফুর রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া রামদেব ও তাঁহার পরিবারের সকলকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান। যাদবরা ছাড়া উত্তর-দাক্ষিণাত্যে কাকতীয় রাজবংশের দ্বিতীয়-প্রতাপরুদ্র (১২৯৫-১৩২৬) রাজত্ব করিতেছিলেন। মালিক কাফুর দেবগিরি হইয়া তেলেঙ্গানায় ওয়ারঙ্গল (Warangal) অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (১৩১০), প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। প্রচুর হাতীঘোড়া

ও ধনরত্ন লইয়া কাফুর দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। উত্তর-দাক্ষিণাত্যের পর আরও দক্ষিণে হোয়সল ও পাণ্ড্যদের রাজ্য অভিমুখে মালিক কাফুরের অভিযান আরম্ভ হইল। দেবগিরি হইতেই তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং রামদেব যথাসাধ্য তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাফুর প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন (অক্টোবর ১৩১১)।

যত দ্রুতগতিতে উত্থান, ততোধিক দ্রুতগতিতে পতন যেন সেকালের রাজ্য ও রাজশক্তির ভাগ্যে লেখা থাকিত। যে বিশাল সাম্রাজ্য আলাউদ্দিন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার ভিৎ দৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই। রাজ্যের নেশায় তিনি রাজ্যবৃদ্ধি কবিয়াছিলেন, তাহার সুশাসন সম্ভব কি না ভাবিয়া দেখেন নাই। অল্পকালের মধ্যে তাই তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিল। গুজরাট বিদ্রোহ করিল, চিতোরের রাজপুতরা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, দেবগিরিতে রামদেবের জামাতা হরপালদেব ক্ষমতা দখল করিলেন। অসুস্থ আলাউদ্দিন এই অসন্তোষ ও বিদ্রোহেব মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (২ জানুয়ারি, ১৩১৬)।

আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার

রাজনীতিক ও সামরিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকিলেও সুলতান আলাউদ্দিন প্রথম হইতেই মূল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তাঁহার প্রধান কাজ হইল. রাজকর্মচারীদের সমস্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তির বৃত্তি বাতিল করা। এই বৃত্তিকে 'ইকতা' বলিত; যাঁহারা ইহা ভোগ করিতেন তাঁহাদের বলা হইত 'ইকৃতাদার' ('জায়গীর' ও 'জায়গীরদার' কথাও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়)। ইকৃতাদাররা ক্রমে অলস ও বিলাসী হইয়া ওঠেন, নিশ্চিন্তে আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করিয়া রাজকর্তব্য ভুলিয়া যান এবং প্রজাদের সহিত জোট পাকাইয়া নানারকমের রাজদ্রোহের চক্রান্ত করেন। এই বৃত্তিভোগীর ঘরোয়া প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য আলাউদ্দিন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গুরুতর সংস্কারসাধনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার প্রবর্তিত নূতন ভূমিব্যবস্থা হইল এই—

১। জমির উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ 'রাজস্ব' নির্ধারণ করা হইল, তাহা হইতে কিছু বাদ দেওয়া হইবে না।

২। মণ্ডল, প্রধান বা পরগণাদারদের সকলরকমের 'হক্' বা নিষ্কর ভূমির বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং পদমর্যাদার জন্য তাঁহারা কোনরকমের

সুযোগ সুবিধা পাইবেন না। প্রবর্তিত 'অর্ধেক ফসলের' হারে তাঁহাদেরও রাজস্ব দিতে হইবে।

৩। জমি জরিপ করিয়া এবং ফসলের গড়পড়তা উৎপাদন হিসাব করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করা হইবে।

৪। অনাবাদী চারণভূমির জন্যও 'কর' বা ট্যাক্স দিতে হইবে।

এই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অর্ধেক ফসল 'রাজস্ব' হিসাবে আদায় করিলে চাষীদের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে না যাহা আমলারা বা প্রধানরা উদরসাৎ করিতে পারিবেন। প্রধানদের ও আমলাদের নিষ্কর জমি ভোগ করারও অধিকার থাকিবে না এবং তাহার বদলে জমির জন্য তাঁহাদের যে-হারে ট্যাক্স বা কর দিতে হইবে তাহাতে তাঁহারাওপ্রায় চাষীদের সমান স্তরে নামিয়া আসিবেন। অনাবাদী জমির উপর ট্যাক্স ধার্য করার ফলে তাঁহাদের উপ্রি আয়ের সমস্ত পথও বন্ধ হইয়া যাইবে।

আলাউদ্দিন সামরিক বিভাগ পুনর্গঠনেও 'ইক্‌তা' বা নিষ্কর বৃত্তির প্রশ্রয় দেন নাই, সৈন্যদের রাজকোষ হইতে নগদ টাকায় বেতন দিয়াছেন। এককথায় তাঁহার অর্থনীতিকে 'নগদ টাকা' বা 'মুদ্রাকেন্দ্রিক' নীতি বলা যায়। তাঁহাব কালে মধ্যযুগে এই আধুনিক কালোপযোগী অর্থনৈতিক মনোভাব বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ। বৃত্তির বদলে আলাউদ্দিনের মুদ্রাকেন্দ্রিক বা নগদ-টাকার নীতির ফলে সমাজে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন দুই-ই বৃদ্ধি পায়। লোকের হাতে টাকা বেশী আসার জন্য মুদ্রাস্ফীতি (inflation) হয়। সমাজে বিনিময় বা কেনাকাটার জন্য পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ যদি না বাড়ে, কেবল টাকার পরিমাণ বাড়ে, তাহা হইলে পরিমিত পণ্য অধিক টাকার বিনিময়ে লেনদেন হইতে থাকে, অর্থাৎ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়। আলাউদ্দিনের আমলে, বিশেষ করিয়া রাজধানী দিল্লী অঞ্চলে, এই মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়। সুতরাং তিনি মূল্যনিয়ন্ত্রণের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করেন। তাহার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়:

১। পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।

২। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।

৩। পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম ও দ্বিতীয়টি আধুনিক 'কণ্ট্রোল' ব্যবস্থার মতো, তৃতীয়টি আধুনিক 'রেশনিং'। জরুরী অবস্থায় ও সংকটের সময় এই 'কণ্ট্রোল' ও 'রেশনিং' ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। আলাউদ্দিন প্রধানত দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাহার জন্য সুসংগঠিত গোয়েন্দাবিভাগ ছিল এবং আইন ভঙ্গ কবিলে কঠোব শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও ছিল। বণিক, ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা শাস্তির ভয়ে কিছু করিতে সাহস করিতেন না। অসাধু ব্যবসায়ীদের গদি ও দোকান হইতে পদাঘাত করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া প্রকাশ্যে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হইত। বারনী লিখিয়াছেন যে আলাউদ্দিনেব এই পণ্য ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আশ্চয সুফল ফলিয়াছিল। দেশেব লোক কিছুদিন সুখে ও শান্তিতে বাস করার সুযোগ পাইয়াছিল এবং আমলা বা অমাত্যরা তাহাদের উপর যখন তখন অত্যাচাব কবিতে সাহস পাইতেন না।

খলজী সাম্রাজ্যনীতি

মুসলমানী স্বৈরশাসনের চূড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছিল আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে। সামরিক অধিনায়কত্বে ও রাষ্ট্রিক শাসনে তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহা অত্যন্ত বিরল। মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ছিল ধর্ম। মুসলমানরাষ্ট্রও ইসলামধর্মেব ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'সুলতান' উপাধি প্রথমে বাগদাদেব খলিফার রাজ্যের স্বাধীন রাজারা ব্যবহার করেন, এবং 'সুলতান' ও 'সুলতানৎ' কথাব অর্থ হইল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলামধর্মের সহিত সুলতানী রাষ্ট্রনীতির ব্যবধান ক্রমেই দুস্তর হইয়া উঠে। রাষ্ট্র-পরিচালনার সহিত ধর্মকর্মের বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে। খল্‌জীবংশের সুলতানদের মধ্যে বোধহয় আলাউদ্দিনই ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ সাধনে সর্বাপেক্ষা বেশী তৎপর ও কৃতকার্য হন। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রনীতিকে "Machiavellian Statecraft" বা ম্যাকিয়াভেলির মতো কুটিল রাষ্ট্রনীতি বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বাস্তব রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খল্‌জীবংশের সুলতানদের সাম্রাজ্যপ্রসারনীতি এই বাস্তব রাষ্ট্রনীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই কারণে তাঁহাদের পক্ষে, বিশেষ করিয়া খল্‌জীবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিনের পক্ষে সমগ্র উত্তর-ভারত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল।

বারনী, খসরু ও নিজামউদ্দিন আউলিয়া

খল্‌জীযুগের অন্যতম মুসলমান কাহিনীকার (Chronicler) জিয়াউদ্দিন বারনী। তাঁহার "তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" গ্রন্থ হইতে তৎকালের বহু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জানা যায়। একালের মুসলমানযুগের ঐতিহাসিকরা তাঁহার এই গ্রন্থ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার তথ্যনিষ্ঠা ও বিচারবোধেরও প্রশংসা করিয়াছেন।

আমীর খসরুর আসল নাম আবুল্ হাসান। 'খসরু' তাঁহার ছদ্মনাম। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি ও ঐতিহাসিক বলিয়া তিনি খ্যাত। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, ১৩২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু। স্থলতান বলবনের রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ মহম্মদের অভিভাবকত্ব করিতেন। বিদ্যাচর্চা ও বিদ্বৎজনের সাহচর্যের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ক্রমে পরবর্তী স্থলতানদের আমলে তিনি রাজসভাকবির মর্যাদা পান। স্থলতান আলাউদ্দিন তাঁহাকে মাসিক একহাজার তঙ্কা বেতন দিতেন।

মুসলমান সাধু শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন খসরু। ধর্মপ্রাণ নিজামউদ্দিনের চরিত্র-মাহাত্ম্যে আরও অনেকে তখন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, স্থলতানরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। শোনা যায় আমীর খসরু সাধু নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে এত গভীরভাবে ভালবাসিতেন যে নিজামউদ্দিনের মৃত্যুর শোকে অভিভূত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয়।

তুঘলকবংশ

দোর্দণ্ডপ্রতাপ আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন সিংহাসন লইয়া জঘন্য চক্রান্ত, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলিতে লাগল। গুজরাট হইতে কেনা গোলাম মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে প্রায় রাষ্ট্রের কাণ্ডারী হইয়া বসিয়াছিলেন, প্রভুর মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই তিনি মসনদের চক্রান্তের প্রধান নায়ক হইলেন। এই সময় উত্তরপশ্চিম সীমান্তের দীপলপুরের রক্ষকশাসক 'গাজী মালিক' এই নির্বিকার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া **ঘিয়াসউদ্দিন তুঘলক** নাম গ্রহণ করেন। ইনিই তুঘলকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩২৫ সনে ঘিয়াসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ 'মহম্মদ বিন তুঘলক' নামে স্থলতান হন।

মহম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৫-৫১

সিংহাসনে বসিয়া মহম্মদ তুঘলক প্রথমে শাসনসংস্কারে মন দিলেন। গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে তিনি সাধারণের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের শুল্ক ও করবৃদ্ধি করিলেন। বারনী লিখিয়াছেন যে প্রজাদের আয়ের দিকে নজর না রাখিয়া সুলতান এত বেশী মাত্রায় কর ও আবওয়াব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে তাহাদের আর দুর্দশার সীমা ছিল না। মহম্মদ মুদ্রা-প্রচলন বৈধ ঘোষণা করিয়া (১৩৩০) এবং তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করিয়া রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দেন। মজুত সোনা রূপা যাহাতে খরচ না হয় এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি চালাইবার জন্য যাহাতে কোন আর্থিক অনটন না হয়, বোধ হয় সেইজন্যই মহম্মদ তাম্রমুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁহার বানচাল হইয়া যায়, কারণ অসংখ্য জালমুদ্রা বাজার ছাইয়া ফেলে।

মহম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রা

দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) রাজধানী পরিবর্তন করার পরিকল্পনা তাঁহার প্রচুর অর্থ-অপব্যয়ের ও অদূরদর্শিতার আর-একটি দৃষ্টান্ত। দেবগিরিতে বাহাউদ্দিনের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সাম্রাজ্য শাসনের দিক হইতে উহার ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তিনি দেবগিরিতে বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্য কিছুকালের মধ্যে সুলতানের উৎসাহ যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি খপ্‌ করিয়া নিভিয়া গেল। মহম্মদ আবার দৌলতাবাদ হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৩৩৭)।

মহম্মদের যুদ্ধযাত্রা ও বিদ্রোহ-দমন। মহম্মদের মতো খেয়ালী সুলতান যে মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। একবার

তিনি খোরাসান অভিযানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার চীন অভিযান সম্বন্ধে যে কাহিনী শোনা যায় তাহা ঘটনা নহে, নিছক কল্পনা। বিদ্রোহ দমনের মধ্যে প্রথমে মহম্মদ দক্ষিণভারতে পূর্ব-উপকূল অঞ্চলে যাত্রা করেন (১৩৩৫)—উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিদ্রোহী শাসক জালালউদ্দিনকে দমন করা। কিন্তু ওয়ারঙ্গল পর্যন্ত পৌছানোর পর সৈন্যদের মধ্যে মহামারী লাগাতে তিনি অভিযান পরিত্যাগ করেন। পাঞ্জাবে বিদ্রোহ হয় এবং বিদ্রোহীরা লাহোর অধিকার করেন। সুলতান দাক্ষিণাত্য হইতে দুইজন সেনাপতি পাঠান, তাঁহারা বিদ্রোহীদের দমন করিয়া লাহোর পুনরধিকার করেন।

বাংলাদেশে বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল, মহম্মদের সময়েও বাদ গেল না। বহরম খাঁর মৃত্যুর পব মালিক ফকরউদ্দিন নিজেকে পূর্ববঙ্গের শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন। কাদিব খাঁ ছিলেন লখনৌতির শাসক, বিদ্রোহী সৈন্যদেব হাতে তিনি নিহত হন। এই সুযোগে ফকরউদ্দিন লখনৌতি দখল কবিবার চেষ্টা করিলে আলি মুবারক নামে কাদিরেব একজন অনুচর বাধা দেন এবং দিল্লীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। কোন সাড়া না পাইয়া মুবারক নিজেকে লখনৌতির স্বাধীন শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন। ফকর ও মুবারকের বিরোধ কয়েক বছর ধরিয়া চলিতে থাকে। মহম্মদ এই বিরোধ অবসানের জন্য কিছুই কবিতে পারেন নাই। তারপব অযোধ্যার শাসক আইন-উল-মূলক বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহাকে বন্দী কবা হয়। ইহার পর মূলতানের শাসককে হত্যা করিয়া নগরটি দখল কবা হয়। সুলতান মহম্মদ নিজে সিন্ধু অভিযান করেন, শাহ ভয় পাইয়া পলায়ন করেন। তারপর পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান করিয়া তিনি জাঠ ও রাজপুতদের কয়েকজন দলপতিকে দিল্লী ধরিয়া আনিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষা দেন। ১৩৫১ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন: "Muhammad Tughlak was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle Ages." মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহদের মধ্যে ভারতে মহম্মদ তুঘলক নিঃসন্দেহে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। এই ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা

নহে, তাহার সহিত বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের ক্ষমতারও মিলন হইয়াছিল। মুসলমানবিজয়ের পর দিল্লীর সিংহাসন যে-সব সুলতান অলংকৃত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদের মতো বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। যেমন তিনি চারুকলার সমঝদার ছিলেন, সুশিক্ষিত পণ্ডিত ও সুদক্ষ কবি ছিলেন, তেমনি তর্কশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞানে পর্যন্ত তাঁহার রীতিমত দখল ছিল। যেমন শব্দবিন্যাসে, তেমনি অক্ষরবিন্যাসে (calligraphy) তিনি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক তর্কবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহাব গভীর জ্ঞান ছিল। বারনী বলিয়াছেন যে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মহম্মদ ছিলেন বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি।

পাণ্ডিত্যের মতো তাঁহার চারিত্রিক উদারতার প্রতিও সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। দীনদুঃখী হইতে আরম্ভ করিয়া ধার্মিক, পণ্ডিত প্রভৃতি সকল রকমের যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এত গুণের সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে পরস্পর-বিরোধী দোষ-গুণের বিচিত্র সংমিশ্রণ বলিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত খেয়ালী ছিলেন এবং খেয়ালের বশে (যেমন রাজধানী অপসারণ, দোয়াব অঞ্চলে করবৃদ্ধি, তাম্রমুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি) এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহাতে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে এই কারণে "mixture of opposites" অথবা "amazing compound of contradiction" বলিবার কোন সংগত কারণ নাই। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধানত ধর্মধ্বজীরাই নানারকম অভিযোগ করিয়াছেন, এমন কি ঐতিহাসিক বারনীরও অভিযোগের কারণ তাহাই।

ইবন বতুতার বিবরণ

ত্রয়োদশ শতকে মার্কো পোলোর পর চতুর্দশ শতকে ভারতবর্ষে আর একজন বিখ্যাত পর্যটক আসিয়াছিলেন আরব দেশ হইতে, তাঁহার নাম ইবন বতুতা, আসল নাম 'আবু আবদুল্লা মহম্মদ'। ১৩২৫ হইতে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরিয়া আফ্রিকা পশ্চিম-এসিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া, চীন ও স্পেন পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের (১৩২৫-৫১) মধ্যেই বতুতা নানাদেশ ভ্রমণ করেন, এবং ভারতবর্ষে আসেন

১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। মহম্মদের ব্যক্তিগত চরিত্র, এবং সেই যুগের হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায়। বতুতা মহম্মদের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "সুলতান যেমন দানধ্যান করিতে ভালবাসিতেন, তেমনি রক্তক্ষয় করিতেও তাঁহার অরুচি ছিল না। তাঁহার প্রাসাদের ফটকের সামনে প্রতিদিন দেখা যায় কয়েকজন দানের প্রত্যাশায় আছে, আবার তাহাদেরই পাশে হয়ত কয়েকজন প্রাণদণ্ডের আদেশের অপেক্ষায় ভয়ে কাঁপিতেছে।"

ইবন বতুতা ভারতের সমাজ সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সব বিবরণের মধ্যে 'সতীদাহের' বিবরণ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ তুঘলক সতীদাহ রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তবে সফল হন নাই, হওয়া সম্ভবও ছিল না। বতুতার বৃত্তান্ত হইতে মনে হয় যে সতীদাহের জন্য সুলতানরা একরকম 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ফিরুজ তুঘলক ১৩৫১-৮৮

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় পিতৃব্যপুত্র ফিরুজ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মহম্মদের রাজত্বকালেই তিনি রাজকার্যের বিভিন্ন দিকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহেও তিনি খুব দক্ষ হইয়াছিলেন। সিংহাসনলাভের পর তিনি বাংলাদেশ ও সিন্ধুদেশ তাঁহার শাসনে আনিবার জন্য সচেষ্ট হন।

বাংলাদেশে অভিযান (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯-৬০)। বাংলাদেশে তখন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের শাসক ছিলেন শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস লখনৌতি দখল করিয়া (১৩৪২) পশ্চিমবঙ্গের, এবং পরে পূর্ববঙ্গের শাসক হন। যখন তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করেন তখন সুলতান ফিরুজ বিপুল সৈন্য লইয়া বাংলাদেশে অভিযান করেন (নভেম্বর ১৩৫৩)। ইলিয়াস একডালা দুর্গে (দিনাজপুর জেলায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর ১৩৫৪)। ফিরুজ দ্বিতীয়বার বাংলায় অভিযান করেন ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই অভিযানের পথে তিনি জৌনপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে পৌছাইবার পর দেখেন যে ইলিয়াসপুত্র সিকান্দার আত্মরক্ষার জন্য একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। দুর্গ অবরোধ করিয়াও যখন বিশেষ কোন ফল হইল না তখন ফিরুজ বিরোধ মিটাইয়া

ফেলেন। ইলিয়াসপুত্র সিকান্দার পূর্ববঙ্গে ফকরুদ্দিনের জামাতা জাফর খাঁকে সোনারগাঁ প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন, এবং সুলতানকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুশী করেন। কিন্তু জাফর খাঁ দিল্লী আসিয়া আর বাংলায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন না, সিকান্দারকেই সুলতান বাংলার শাসকরূপে মনোনীত করেন।

সিন্ধু অভিযান। সিন্ধুপ্রদেশে থাট্টা অঞ্চলে মহম্মদ তুঘলক বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া পরলোকগমন করেন। বিদ্রোহীরা তাঁহার শাসন মানে নাই। ফিরুজ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সিন্ধু অভিযান করেন (১৩৬২) ৯০ হাজার সৈন্য ও ৪৮০ হাতি লইয়া। প্রকাণ্ড নৌবহরও সিন্ধুনদে জমা করা হয়। থাট্টার শাসক নগর রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। সুলতানের শিবিরে মড়ক, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফিরুজ তখন সিন্ধু ছাড়িয়া গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথের বিভ্রাটের জন্য তাঁহার বহু সৈন্যক্ষয় হয়। অবশেষে গুজরাটে পৌঁছাইয়া তিনি খাদ্য ও অর্থ পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। কিন্তু থাট্টার কথা কিছুতে ভুলিতে না পারিয়া আবার সিন্ধু অভিযান করেন এবং থাট্টার শাসক এইবার আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

ফিরুজের ধর্মমত

মহম্মদ তুঘলক যে মুসলমান উলামা ও মোল্লামৌলবীদের বিরাগভাজন হইয়া, উদার ধর্মমত পোষণ করিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, ফিরুজ তাহা জানিতেন। কাজেই তিনি নিজেকে ইসলামধর্মের ত্রাণকর্তা ও মহাধার্মিক প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও অনুদার ধর্মনীতির সমর্থক হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিত 'ফতুহাৎ-ই-ফিরুজ শাহী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "আমি হিন্দু প্রজাদের ইসলামধর্ম গ্রহণের জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছি। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের নগদ টাকা, জায়গীর, খেতাব, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছি।" কেবল এই কাজ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যাঁহারা তাঁহার ইসলামধর্ম গ্রহণের আহ্বানে সাড়া দেন নাই, তাঁহাদের উপর তিনি 'জিজিয়া' করের বোঝা চাপাইয়াছেন এবং তাঁহাদের দেবদেবী ও দেবালয় ধ্বংস করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের হত্যা করিয়াছেন। এইসব হিন্দুবিদ্বেষী কাজকর্মের জন্য গোঁড়া মুসলমানরা প্রীত হইলেন। পিতৃব্য মহম্মদের উপর মোল্লা-উলামাদের যে রাগ ছিল তাহা আর ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর রহিল না। ফিরুজ

তাঁহাদের জন্য ‘ওয়াক্‌ফ’ (যেমন হিন্দুদের ‘দেবোত্তর’ ইত্যাদি) বা ভূমিদান করেন। গোঁড়া মুসলমানরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে থাকেন।

রাজস্বনীতি ও শাসনসংস্কার

ফিরুজ ইসলাম-অনুমোদিত চার প্রকারের ‘কর’ প্রবর্তন করেন, যেমন খারাজ (ভূমি ও খনি-রাজস্ব), খাম্‌স (লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ), জিজিযা (বিধর্মী হিন্দুদের দেয় ‘কর’) এবং জাকাৎ (বাৎসরিক আযের উদ্বৃত্ত অংশের শতকরা আড়াই ভাগ)। কতকগুলি ‘কর’ তিনি রহিত করেন, যেমন গোচারণ-কর, গৃহশুল্ক ইত্যাদি প্রায় চব্বিশ রকমের রাজকব। চাষবাসের সুবিধার জন্য সেচব্যবস্থার উন্নতি করিয়া তিনি সেচকর প্রবর্তন করেন, খাল সেতু নির্মাণ করিয়া চলাচলের ও ব্যবসা-বাণিজ্যেব সুবিধা করিয়া দেন। আধুলী-সিকি প্রভৃতি খণ্ডমুদ্রার প্রচলন করিয়া তিনি বাণিজ্যিক লেনদেনের বাধা দূর করার চেষ্টা করেন।

ঘরবাড়ী, পথঘাট, খালনালা, নূতন রাজধানী ইত্যাদি নির্মাণকার্যে সুলতান ফিরুজের প্রবল উৎসাহ ছিল। ফিরুজাবাদ, হিসার, ফিরুজপুর, ফতেহাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি নগর তাঁহার আমলে নির্মিত। জনৈক কাহিনীকার বলিয়াছেন যে ফিরুজ ২০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০ পান্থশালা, ১০০ সেতু, ১৯টি স্নানাগার, ৫টি চিকিৎসালয়, ৫টি বড কূপ বা কুয়া এবং কয়েকশত সুন্দর সমাধি নির্মাণ করেন। এইসব নির্মাণকার্যে তিনি হাজার হাজার যুদ্ধে বন্দী গোলামদের নিয়োগ করেন। তাঁহার নূতন শহর ফিরুজাবাদের (দিল্লীর একাংশ) শোভা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি এলাহাবাদ ও মীরাট হইতে দুইটি অশোকস্তম্ভ তুলিয়া আনিয়া নূতন করিয়া স্থাপন করেন। ইহার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সেকালের পক্ষে বিস্ময়কব মনে হয়।

ফিরুজ আগের মতো উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর না করিয়া কৃষকদের ছয় বছরের গড়পড়তা ফসলের আয় হইতে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ তুঘলক জায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ফিরুজ পূর্ণোদ্যমে জায়গীর পুনঃপ্রবর্তন করেন। রাজকর্মচারী, সেনাপতি, সৈনিক প্রভৃতিদের নগদ টাকায় বেতন না দিয়া তিনি পুনরায় জায়গীর দিবার ব্যবস্থা করেন। গোলামপোষণে ফিরুজের বহু অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। ফিরুজের সময়

সুলতানের অধীনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার গোলাম থাকিত এবং তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয় রাজকোষ হইতেই বহন করা হইত। মধ্যযুগীয় সুলতানী বিলাসিতার ইহা একটি বিচিত্র দৃষ্টান্ত।

QUESTIONS

1. "The reign of Alauddin represents the high watermark of Muslim despotism" Discuss the statement with reference to Alauddin's wars of conquest and suppression of internal disorders.

2. Give a brief account of Alauddin Khalji's economic measures, with reference to his revenue policy and price control.

3. Who was Malik Kafur ? Give a short account of his Deccan campaigns.

4. "Muhammad Tughlak was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle Ages" Discuss the statement critically.

5. Muhammad Tughlak is often called a 'mixture of opposites'. Do you agree ? Give reasons for your answer.

6. Give a brief estimate of Firuz Shah Tughlak's achievements as a ruler.

7. Write notes on :

(a) Ibn Batuta
(b) Amir Khusrau
(c) Barani
(d) Nizamuddin Aulia
(e) Daulatabad

ষোড়শ অধ্যায়

তৈমুরের অভিযান। সুলতানদের পতন

প্রায় ৩৭ বছর রাজত্ব করিয়া ফিরুজ তুঘলক বৃদ্ধ বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৩৮৮)। পরবর্তী নয়-দশ বছর সুলতানের সিংহাসনে দুর্বলেরা রাজত্ব করিয়াছেন, এবং প্রবলের প্রতাপের পর দুর্বলের রাজত্বে যে অরাজকতা সৃষ্টি হইয়া থাকে ফিরুজের মৃত্যুর পর ভারতে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। অরাজকতার সুযোগে ভারতের ইতিহাসে বারংবার যাহা ঘটিয়াছে এইবারও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দুর্ধর্ষ চেঙ্গিসের আত্মীয় চাঘতাইবংশের তারাঘাইনন্দন **তৈমুর** ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অভিযান করিলেন। তেত্রিশ বছর বয়সে (১৩৬৯) তৈমুর মধ্যএসিয়ায় সমরকন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মেসোপোতামিয়া, আফগানিস্তান ও পারস্যদেশ জয় করেন। হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য স্বভাবতঃই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে এবং ইতিহাস সেই প্রলোভন মিটাইবার সুযোগও তাঁহাকে করিয়া দেয়।

সমরকন্দ হইতে বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া, নদনদী অতিক্রম করিয়া ছয় মাসের মধ্যে তৈমুর রাজধানী দিল্লীর কাছে উপস্থিত হন। পথে প্রত্যেকটি নগর লুট ও ধ্বংস করিয়া তিনি নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদ তুঘলক ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ইকবাল রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লী অধিকার করিয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নরহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় মত্ত হন। মাত্র একপক্ষকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া তিনি আবার সমরকন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীর বিশাল তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দিল্লীর সুলতান কেবল নামেই দিল্লীর শাসক হইয়া থাকেন। দিল্লীর

CHAPTER XVI—(1) Invasion of Timur.

(2) Disintegration of the Sultanate—the Sayyids and the Lodis in outline.
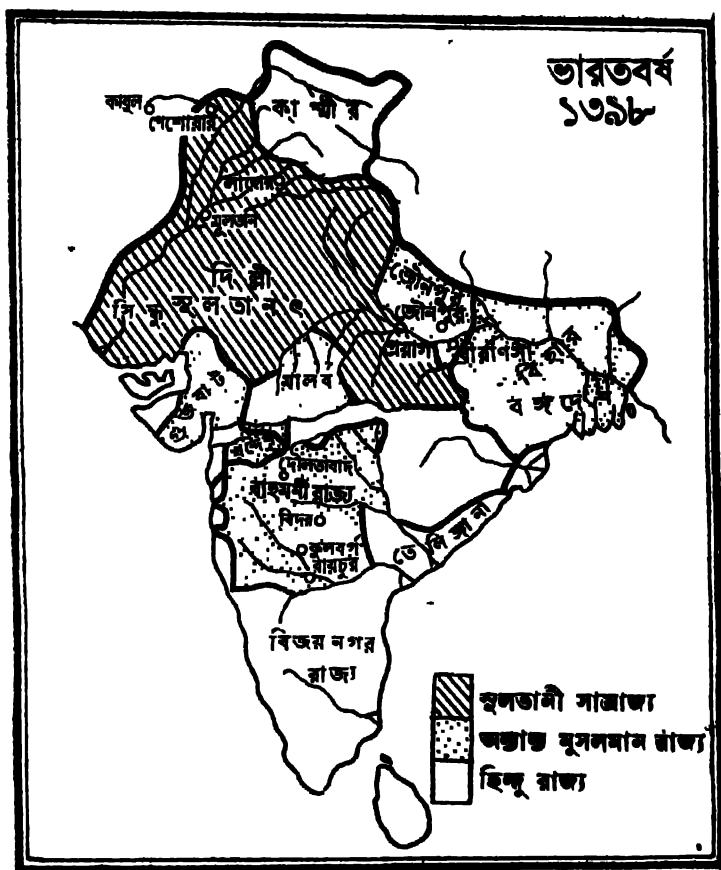
এই দুর্ভাগ্যের সময় দাক্ষিণাত্যের বাহমনী ও বিজয়নগররাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ আসে। মালব, গুজরাট, জৌনপুর, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দিল্লীর শাসনমুক্ত শাসকরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সুলতানী শাসনের অবসান ঘনাইয়া আসে।

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেবল যে শাসকরাই দায়ী ছিলেন তাহা নহে, আমীর-ওমরাহ ও অমাত্যগোষ্ঠী হয়ত তাহার জন্য আরও অনেক বেশী দায়ী ছিলেন। ভারতের প্রচুর ঐশ্বর্যবিলাসে তাঁহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আগের তেজ বীর্য রণকুশলতা কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। চতুর্দশ

শতকে কুতব, ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দিন, কাফুর বা ঘিয়াসউদ্দিনেব মতো প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিভাশালী শাসকের কেন যে আর উদ্ভব হইল না তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে মহম্মদ ফিরুজের আমল পর্যন্ত যত রাজকীয় বিলাস বাড়িয়াছে, হাজার হাজার গোলাম সুলতানের খেয়াল চরিতার্থের জন্য রাজকোষের অর্থ শোষণ করিয়াছে, তত সুলতানী রাষ্ট্রের ভিৎ ফাঁপা এবং ভিতরের শক্তিও ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের আরও কারণ ছিল। যখন চলাচলের ও দ্রুতগতি যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন উত্তর হইতে দক্ষিণভারত পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য কেবল সুলতানী দাপটের জোরে শাসন করা অসম্ভব ছিল বলা চলে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের যোগাযোগ এই কারণে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইত, কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবধানের জন্য সুলতানের দৃষ্টির অন্তরালে চক্রান্ত, বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দানা বাঁধিতে পারিত। তাহাব ফলে সুলতানরা রাজ্যশাসনেব দিকে মনোযোগ দিবার অবসর পাইতেন না, কেবল চক্রান্ত ও বিদ্রোহ দমন কবিতে ব্যস্ত থাকিতেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যেব পতনের আরও একটি বড় কারণ হইল, হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানে কোন সুলতানই হিন্দুদের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, এবং কোন সুনিয়ন্ত্রিত হিন্দু-নীতিও প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। মহম্মদ তুঘলকের মতো দুই-একজন সুলতান হিন্দুদের প্রতি কিছু উদার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কোন রাষ্ট্রীয় নীতিগত ব্যাপার নহে। রাষ্ট্র-পরিচালনায় হিন্দুদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি হইতে সুলতানরা বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তাহার ফলে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিৎ সর্বদাই টলমল করিয়াছে।

এতগুলি অন্তরায়ের জন্য সুলতানরা তাঁহাদের রাজ্যের ভিত্তি ও আভ্যন্তরিক সংহতি দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। তৈমুরের অভিযানের ঝড়ে স্বভাবতঃই তাহা তাসের ঘরের মতো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তারপর পঞ্চদশ শতকের ইতিহাস হইতেছে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হিন্দু-মুসলমান শাসকদের আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ষোড়শ শতকে মোগল-শাসনের সূচনার পর হইতে ইতিহাসের ধারা আবার নূতন খাতে বহিতে থাকে।

সৈয়দ ও লোদীবংশ

সৈয়দবংশের চারজন সুলতান (১৪১৪-৫১) এবং আফগান (পাঠান) লোদীবংশের তিনজন সুলতান (১৪৫১-১৫২৬) প্রায় ১১২ বছর রাজত্ব করেন। খিজির খাঁ সৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারীর প্রতিনিধিরূপে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, সমরকন্দে বৎসরান্তে 'কর' পাঠাইতেন এবং রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পুত্র মুবারক শাহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং উচ্চ-রাজপদে দুই-একজন হিন্দুকে নিয়োগ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। মুবাবকের পর মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসিযা চাবিদিকে বিদ্রোহেব সম্মুখীন হন। তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন শাহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী লাহোরের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর কাছে সিংহাসন সমর্পণ করিয়া (১৪৫১) বুদাউনে গিয়া বাস করেন। সৈয়দী শাসন এইখানেই শেষ হইয়া যায়।

লোদীবংশের বাহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯), তাঁহাব পুত্র সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) ও পৌত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬), তিনজনই কীর্তিমান শাসক ছিলেন। সিকান্দার বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ শাসক হইলেও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষনীতি অনুসরণ করিয়া পূর্বগামী সুলতানদের মতো মারাত্মক অন্যায় ও ভুল করিয়াছিলেন। আগ্রা শহরেব প্রতিষ্ঠার জন্য (১৫০৪) ইতিহাসে সিকান্দার স্মরণীয় হইয়া আছেন।

সিকান্দার-পুত্র ইব্রাহিম লোদীও কৃতী শাসক ছিলেন। মেবারের রানা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন, বানা অমিতবিক্রমে তাহা প্রতিরোধ করেন। অবশেষে সুলতান ও আমীরের বিরোধ এমন স্তরে পৌছায় যে দৌলৎ খাঁ লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। গর্বোদ্ধত আফগান আমীররা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনেন। পানিপথের প্রথম ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলে (১৫২৬) ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, পাঠান সুলতানদের রাজত্বের অবসান হয়।

QUESTIONS

1. What were the causes of the disintegration of the Sultanate ?
2. Write notes on :
   (i) Invasion of Timur
   (ii) The Sayyids and the Lodis

সপ্তদশ অধ্যায়

হুসেন শাহ। রাজা গণেশ। বাহমনী রাজ্য

স্থলতানী আমলে বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এক নূতন যুগের স্থচনা করেন ইলিয়াস শাহ। এই ইলিয়াস শাহের বংশের পর রাজা গণেশের বংশ ও হুসেন শাহের বংশ, মধ্যে স্বল্পকালস্থায়ী হাবসীদের রাজত্ব বাদ দিয়া, প্রায় দুইশত বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন (১৩৪২-১৫৩৮)। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ইহাদের শাসনকালে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এক নবযুগের স্থচনা হয়।

ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) লখনৌতির সিংহাসন দখল করিয়া ত্রিহুত জয় করেন, নেপাল অভিযান কবেন দক্ষিণপূর্ব ভারতে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত এবং ত্রিহুত হইতে চম্পারন, গোরক্ষপুর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাংলার স্থলতানের মর্যাদাবৃদ্ধি করেন। মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে ইলিয়াসের পক্ষে এই প্রভাব-বিস্তারে কোন অস্থবিধা হয় নাই। মহম্মদের পর ফিরুজ তুঘলকের বাংলাদেশ আক্রমণে ইলিয়াস বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, শেষ পর্যন্ত ফিরুজ একডালা-দুর্গ অধিকার না করিয়া দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ফিরুজ-ইলিয়াসের মধ্যে পরে বন্ধুত্বও হইয়াছিল এবং বাংলাব সহিত দিল্লীর উপঢৌকন আদান-প্রদান চলিত। ইলিয়াসের পুত্র সিকান্দারের আমলে (১৩৫৭-৮৯) ফিরুজ আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু এইবারও একডালা দুর্গ দুর্ভেদ্য প্রমাণিত হয়, এবং দিল্লীর স্থলতান বাংলার স্থলতানের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি করিতে বাধ্য হন। সিকান্দরের পর তাঁহার পুত্র ঘিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) এবং

CHAPTER XVII : (1) Bengal Under Iliyas Shahi rulers, Raja Ganesh, Hussain Shah.

(2) Bahmani Kingdom. Five Sultanates of the Deccan.

আজমের পুত্র সৈফউদ্দিন হামজা শাহ (১৪০৯-১০) বাংলাদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু ইলিয়াস ও সিকান্দারের ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের ছিল না। হামজার আমলে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সঠিক জানা যায় না। এইটুকু শুধু জানা যায় যে এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে 'রাজা গণেশ' নামে একজন ব্রাহ্মণ জমিদার ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া ওঠেন এবং অবশেষে রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসেন।

রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশের রাজত্বকাল ১৪১৪-৪২

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্মণ **রাজা গণেশ** ও তাঁহার বংশধরদের মাত্র ২৮ বছরের রাজত্ব (১৪১৪-৪২) কেন্দ্র করিয়া বহু কিংবদন্তী ও কাল্পনিক উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমান আমলে হঠাৎ একজন হিন্দুর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠালাভ নিশ্চয় রোমাঞ্চকর ঘটনা। কাজেই কাহিনীর সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে।

সিকান্দার শাহের পর আজম শাহের আমল হইতে সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার গণেশ ক্ষমতার উচ্চশিখরে ওঠেন। বিশাল জমিদারীর মালিক বলিয়া এমনিতেই তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, নিজের সৈন্যসামন্ত পাইক বরকন্দাজও তাঁহার রাখার অধিকার ছিল। আজমের অক্ষম উত্তরাধিকারীদের আমলে স্বভাবতঃই গণেশ রাষ্ট্র-পরিচালক হইয়া ওঠেন এবং সুলতানরা তাঁহার হাতের পুতুল হইয়া পড়েন। অবশেষে গণেশের পক্ষে ঘরোয়া চক্রান্ত ও বিবাদের মধ্যে রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিতে (১৪১৪) বিশেষ কষ্ট হয় না। একজন হিন্দু কাফেরের সিংহাসন দখলে ক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমানরা জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিমকে বাংলাদেশে ইসলামরাষ্ট্র রক্ষা করার জন্য আহ্বান করেন। জৌনপুরী সুলতানের অভিযান অবশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, তিনি চুক্তি করিয়া বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। গণেশ কিছু অর্থ উপঢৌকন দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহার পুত্র যদু বা (যদুসেন) ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলার সুলতান হইবেন। গণেশ দনুজমর্দনদেবের নাম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার সুশাসনে সাধারণ মুসলমানরাও এত প্রীত হইয়াছিল যে, ফিরিস্তা বলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা তাঁহাকে মুসলমানমতে কবর দিতে চাহিয়াছিল।

রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদুসেন ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা বা পুনর্দীক্ষা নিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৪১৮)। যদুসেনের

মুসলমানী নাম হইল 'জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ'। যত্নসেন জালালউদ্দিনের ধর্মান্তর ছুইবার হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। প্রথম ধর্মান্তরের পর তাঁহার পিতা রাজা গণেশ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান ছুই সম্প্রদায়ই তাঁহাকে কোন সমাজে গ্রহণ করেন নাই। যতুসেন এইজন্যই পিতার মৃত্যুর পর ইসলামধর্মে পুনর্দীক্ষিত না হইয়া সিংহাসনে বসিতে চান নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যতুসেনের হিন্দুধর্মগ্রহণ ব্রাহ্মণরা মানেন নাই বলিয়া তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষও প্রবল হইয়াছিল। **জালালউদ্দিন** নামে রাজসিংহাসনে বসিয়া তিনি ব্রাহ্মণদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ সারা-জীবনই তীব্র ছিল।

যতুসেন-জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৪৩১) তাঁহার পুত্র শামসউদ্দিন আহ্‌মদ সিংহাসনের অধিকারী হন। রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (১৪৪২) এবং গণেশ-বংশের রাজত্বেরও অবসান হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে হাব্‌সী গোলামরা গৌড়বঙ্গের রাজসিংহাসনে কিছুদিন অধিষ্ঠিত হইয়া অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের দৌরাত্ম্য দমন করিয়া হুসেন শাহ যখন সিংহাসন দখল (১৪৯৩) করেন তখন আবার বাংলাদেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯

হাব্‌সী গোলামদের আমলে বাংলাদেশ ও বাঙালীর চরম দুর্গতি হইয়াছিল। এই দুর্গতির কবল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলাদেশে এক নবযুগের প্রবর্তন করেন হুসেন শাহ। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায় 'একানি-চাঁদপাড়া' নামে একটি গ্রাম আছে। হুসেনের বাল্যকালের স্মৃতি এই গ্রামের সঙ্গে জড়িত। কথিত আছে তিনি তাঁহার পিতার সহিত গৌড় যাইবার পথে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। আরবদেশের সম্ভ্রান্ত সৈয়দবংশীয় মুসলমান ছিলেন বলিয়া স্থানীয় এক কাজীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। গৌড়ের হাব্‌সী শাসক তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মাত্র এক আনা রাজস্বের বিনিময়ে তাঁহাকে চাঁদপাড়া

গ্রামের জমিদারী দেন। গ্রামের নাম তাই একানি-চাঁদপাড়া। রাজস্ববিভাগে সামান্য বেতনের কর্মচারী হইতে নিজের প্রতিভাবলে তিনি প্রধান-সচিবের পদে উন্নীত হন। তারপর তাঁহার লোকপ্রিয়তার জন্য সহজে তিনি রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসেন (১৪৯৩)।

উত্তরবিহার ও কামরূপ জয় করিয়া, আসাম উড়িষ্যা ও ত্রিপুরায় অভিযান করিয়া হুসেন শাহ বাংলাদেশের পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিপুরার একাংশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। কেবল আসাম অভিযান ছাড়া আর সব অভিযানেই তিনি সফল হন। উত্তরপশ্চিমে বিহার হইতে দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম, উত্তরপূর্বে হাজো এবং দক্ষিণপশ্চিমে মন্দারন ও ২৪-পরগণা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত রাজ্যের কোথাও বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি ছিল না, তাঁহার সুশাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করিত।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, "Alauddin Husain Shah was unquestionably the best, if not the greatest, of the medieval rulers of Bengal." জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি ও সম্প্রীতির জন্য হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতেন। মধ্যযুগে, বোধ হয় মোগল বাদশাহ আকবর ছাড়া, আর কোন শাসকের ভাগ্যে প্রজাদের এরকম অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা পাওয়া সম্ভব হয় নাই, এবং এত মহৎ মানবিক গুণের সমাবেশও কোন শাসকের চরিত্রে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাংলার মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের রাজকাযে নিয়োগ করিতেন, হুসেন শাহ হিন্দুদের উপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও সৈনাপত্যের ভার দিতেও দ্বিধা করেন নাই। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী দুই ভাই, বাংলার দুই বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি, সুলতান হুসেন শাহের দুই হাত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনাতন গোস্বামী ছিলেন 'দবীর-খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারী, আর রূপ গোস্বামী ছিলেন 'সাকর-মল্লিক,' অর্থাৎ সবাধিকারী বা চাফ সেক্রেটারী। গোপীনাথ বসু ছিলেন উজীর, মুকুন্দ দাস ব্যক্তিগত চিকিৎসক, কেশব ছত্রী রক্ষীপ্রধান, অনুপ মিণ্ট মাস্টার, গৌর মল্লিক সেনাপতি। পাঠান সুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু হুসেন শাহের পোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি হয় মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ

প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের সাহিত্যসাধনার ফলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে হুসেন শাহের রাজত্বকাল ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নবজাগরণের প্রবর্তকরূপে ইতিহাসে হুসেন শাহ চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২) গৌড়ের সিংহাসন অলংকৃত করিয়া পিতার সুনাম ও সুকীতির ঐতিহ্য সর্বক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ রাখেন। রাজকর্তব্যপালনে, ধর্মীয় উদারতায়, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির আন্তরিক পোষকতায় তিনি পিতার সুযোগ্য পুত্ররূপেই পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে চট্টগ্রামের রাজকর্মচারী ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে দিয়া 'মহাভারত' অনুবাদ করান। কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহ নসরতের গুণগ্রাহী ছিলেন। নসরতের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ (১৫৩২-৩৩) অল্পকাল রাজত্ব করিলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়া তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখাইয়াছিলেন।

নসরৎ ও ফিরুজ শাহের পর বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক ঘিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) কয়েক বছর প্রবল দুর্যোগের মধ্যে রাজত্ব করেন। তারপর একদিকে আফগান বীর শের খান বা শের শাহ এবং অন্যদিকে মোগলদের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের ও বাংলাদেশের ইতিহাস আবার নূতন পথে বাঁক ফিরিতে থাকে।

দাক্ষিণাত্যের বাহমনীরাজ্য

মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর (১৩৩৬) ও স্বতন্ত্র মুসলমান বাহমনীরাজ্য (১৩৪৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবগিরির (দৌলতাবাদ) বিদ্রোহী ওমরাহগোষ্ঠীর নেতা ইসমাইল হইলেন স্বাধীন বাহমনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তবে 'বাহমনী' নাম তাঁহার নহে। কিছুদিনের মধ্যে ইসমাইল 'হাসান' নামে একজন মুসলমান সেনানায়ককে রাজ্যভার অর্পণ করেন। হাসান পারস্যের বীর 'বহমনের' বংশধর বলিয়া বিশেষ মর্যাদা দাবী করেন এবং তাঁহার নামকরণ করেন আবুল মুজফফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ। হাসানের 'বাহমন' উপাধির জন্য তাঁহার বংশ বাহমনীবংশ এবং তাঁহার রাজ্য বাহমনীরাজ্য নামে পরিচিত।

হাসান বাহমন কৃতী, কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী শাসক ছিলেন। গুলবর্গা ছিল তাঁহার রাজধানী (হায়দারাবাদের অন্তর্গত)। গুলবর্গা, বিদর, বেরার ও দেবগিরি বা দৌলতাবাদ—এই চারটি অঞ্চল বিভাগীয় শাসনকর্তার অধীনে রাখিয়া তিনি রাজ পরিচালনা করিতেন। বাহমনীবংশের অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে প্রথম-মহম্মদ শাহ বাহমন (১৩৫৮-৭৩), ফিরুজ শাহ বাহমনী (১৩৯৭-১৪২২) ও আহ্মদ শাহ বাহমন (১৪২২-৩৫) অন্যতম। বাহমনী সুলতানদের সহিত প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ক্রমাগত বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধিত। বিরোধের একটি বড কারণ ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী **রায়চুর দোয়াব** অঞ্চলে কর্তৃত্ব।

তৃতীয়-মহম্মদ শাহ বাহমনীর মন্ত্রী **মামুদ ঘাওয়ান** (১৪৬৩-৮২) বাহমনী-রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনে বিশেষ উদ্‌যোগী হন। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে মামুদ ঘাওয়ানের মন্ত্রিত্ব স্মরণীয় হইয়া আছে। দানধ্যানে, বদান্যতায় ও ন্যায়বিচারে তাঁহার সমকক্ষ সচিব তখন আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। বিদরে বৃহৎ মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগার স্থাপন তাঁহার জীবনের স্মরণীয় কীর্তি। তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগ করিয়া সুলতান তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১৪৮১)। সুলতান পরে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া মনস্তাপে অত্যধিক মদ্যপান করিয়া অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন।

দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ-সুলতানবংশ

ঘাওয়ানের প্রাণদণ্ডে যেন বাহমনীরাজ্যেরও প্রাণদণ্ড হইল। বাহমনীরাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। তাহার ভগ্নস্তূপের উপর দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি খণ্ডরাজ্যে পাঁচটি স্বতন্ত্র সুলতানবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল :

বেরার ॥ ইমাদ শাহীবংশ (১৪৮৪)
বিজাপুর ॥ আদিল শাহীবংশ (১৪৮৯)
আহম্মদনগর ॥ নিজাম শাহীবংশ (১৪৯০)
গোলকুণ্ডা ॥ কুতুব শাহীবংশ (১৫১২)
বিদর ॥ বারিদ শাহীবংশ (১৫২৬)

দাক্ষিণাত্যের এই পাঁচটি সুলতানবংশের মধ্যে বিজাপুরের আদিল শাহীবংশের কীর্তি স্মরণীয়। আদিল শাহ মারাঠী-নারীকে বিবাহ করেন, ফার্সীর বদলে স্থানীয় মারাঠী ভাষা রাজভাষারূপে প্রচলিত করেন এবং সাহিত্য-শিল্পকলার অনুশীলনে

নানাভাবে পোষকতা করেন। গোয়া বন্দর বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত। আদিল শাহের আমলে পর্তুগীজরা রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গোয়া বন্দর অধিকার করে। তারপর প্রায় ৪৫০ বছর পরে ১৯৬১ সনের শেষে সেইদিন মাত্র গোয়া বিদেশী পর্তুগীজদের কবলমুক্ত হইয়াছে। বেরার ছাড়া অন্য চারটি রাজ্যের সুলতান একজোট হইয়া বিখ্যাত তালিকোটের যুদ্ধে (২৩ জানুয়ারী, ১৫৬৫) বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করেন। আদিল শাহ আহম্মদনগরের রাজকুমারী চাঁদবিবিকে বিবাহ করেন এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহাকে হত্যা করা হয় তখন তাঁহার নাবালক পুত্র ইব্রাহিমের 'রিজেণ্ট' বা অভিভাবকরূপে চাঁদবিবি রাজ্যশাসন করেন।

আদিল শাহীবংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান সুলতান হইলেন ইব্রাহিম আদিলশাহ (১৫৮০-১৬২৬) ও মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৬-৫৬)। ইব্রাহিম নূতন ভূমিরাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। পর্তুগীজদের বাণিজ্যপ্রসারে ও গির্জা নির্মাণে তিনি উৎসাহ দেন এবং হিন্দুদের উচ্চ-রাজকর্মে নিয়োগ করেন। মহম্মদ আদিল শাহও সক্ষম শাসক ছিলেন, আহম্মদনগরের কিয়দংশ ও কর্নাটকের অধিকাংশ জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শাহজাহান বিজাপুর আক্রমণ করেন ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ঔরঙ্গজীব ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর জয় করেন। আদিল শাহী সুলতানদের স্থাপত্য ও শিল্পকলাকীর্তি আজও বিজাপুরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

QUESTIONS

1. Who was Raja Ganesh ? What do you know of the history of Bengal under Ganesh and his successors ?
2. "Alauddin Husain Shah was unquestionably the best, if not the greatest of the medieval rulers of Bengal." Discuss the statement.
3. Give a short account of the rise and fall of the Bahamani kingdom and the rise of the Five Sultanates of the Deccan.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিজয়নগর-রাজ্য

॥ পটভূমি ॥ দক্ষিণভারতের বিজয়নগর-রাজ্যের উত্থান ও পতন ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা বলিয়া মনে হয়। ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণভারতের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বরাবরই ছিল, সেই আর্যযুগ হইতে। আর্য ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বিস্তার দক্ষিণে অনেক পরে হইয়াছিল। মুসলমান আমলে প্রথম খলজী-সুলতানরা দক্ষিণের দিকে দৃষ্টি দেন, তুঘলকরা সেই নীতিই অনুসরণ করেন। মহম্মদ তুঘলক দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) রাজধানী পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবগিরির যাদববংশের বিপর্যয়ে এবং দক্ষিণে সুলতানদের অভিযানের আংশিক সাফল্যে দক্ষিণভারতীয় হিন্দুরা বিচলিত হইলেও হতাশ হন নাই। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্বন্ধে অতিসচেতন বলিয়া তাঁহারা ভিতরে ভিতরে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছেন। দক্ষিণভারতে শৈবধর্মের প্রাবল্য ছিল। শৈবদের মধ্যে একাত্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানরা যেমন বিধর্মী হিন্দুদের 'কাফের' বলিতেন, শৈবরা তেমনি বিধর্মী মুসলমানদের বলিতেন 'ভাবী'। একডাকে শৈবরা একজোট হইতে পারিতেন এবং ধর্মরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই অবস্থায় দক্ষিণভারতের হিন্দুরা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার প্রসার ও প্রভুত্ব খর্ব করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিরোধ হইতে বিজয়নগর-রাজ্যের উত্থান সম্ভব হইয়াছে।

CHAPTER XVIII : The Vijaynagar Empire—some illustrious rulers. Administrative system. economic conditions—foreign travellers—art and culture.

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা ১৩৩৬

দেবগিরির যাদববংশীয় রামদেব সুলতানী প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সঙ্গম মানিতে চান নাই। একথা আগে বলা হইয়াছে। সঙ্গমের পাঁচপুত্র ইসলামের প্রসার প্রতিরোধ করার সংকল্প করেন। দুই ভাই হরিহর ও বুক্কা প্রথমে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা নিয়া সুলতানের প্রতিনিধিরূপে দাক্ষিণাত্যে আসেন, কিন্তু ধর্মগুরু আচার্য বিদ্যারণ্য তাঁহাদের স্বধর্মপালনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। হরিহর ও বুক্কা সুলতানী আশ্রয় ও পরধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া স্বধর্মরক্ষার শপথ গ্রহণ করেন।

ইতিহাসের কি বিচিত্র বিচার। দিল্লীর সুলতান দাক্ষিণাত্যের মুসলমান আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার যে বিশ্বস্ত ইসলামধর্মী প্রতিনিধিদের (হরিহর ও বুক্কা) পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের পত্তন করিলেন।

হরিহর ও বুক্কা দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া সুলতানের বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে নূতন হিন্দুরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন মহাসমারোহে বিজয়োৎসব করিয়া। জয়কীর্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য নূতন রাজধানীর নাম হয় 'বিজয়নগর' এবং আচার্য বিদ্যারণ্যের উপদেশ ও উৎসাহের কথা মনে করিয়া, তাহার আরও একটি নাম রাখা হয় 'বিদ্যানগর'। দেবতা বিরূপাক্ষের (শিব) পূজা করিয়া সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি অনুযায়ী হরিহরের অভিষেক-উৎসব হয় (১৮ এপ্রিল ১৩৩৬)।

বিজয়নগর ও বাহমনীরাজ্যের বিরোধ

॥ বিজয়নগর-বাহমনীর বিরোধ ও সংঘর্ষ॥ দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ও মুসলমানরাজ্য বাহমনীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অবিরাম লাগিয়া থাকে, কেহ কাহারও প্রসার-প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারে না। বিজয়নগরের দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৯-১৪০৬) কাঞ্চী, ত্রিচিনোপল্লী, মহীশূর, কানাড়া প্রভৃতি জয় করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। বাহমনী সুলতানদের সহিত বিজয়নগরের সংঘর্ষ হয়। দ্বিতীয়-দেবরায়ের (১৪২২-৪৬) সময়, সিংহল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দক্ষিণভারতব্যাপী বিজয়নগররাজ্য বিস্তৃত হয়। পরবর্তী রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বাহমনী সুলতানরা কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার গজপতি-রাজারা পূর্বাঞ্চলের অনেকটা অংশ অধিকার

করেন। বিজয়নগরের সামনে ঘোর সঙ্কট দেখা দেয়। এই সময়ে সঙ্গমবংশের দ্বিতীয়বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সালুব-বংশীয় নরসিংহ বিজয়নগরের দখল করেন (১৪৮৬)। নরসিংহ সঙ্কট হইতে বিজয়নগরকে মুক্ত করেন, এবং বাহমনী ও উড়িষ্যার অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেনাপতি নরস নায়ক রাজ্য-পরিচালনার ভার নেন। নরসের মৃত্যুর পর পুত্র বীরনরসিংহ রাজা নরসিংহের অপদার্থ পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন। বীর-নরসিংহ হইলেন তুলুব-বংশীয়। তাঁহার অল্পকাল রাজত্বের পর কৃষ্ণদেব রায় রাজা হন। কৃষ্ণদেব হইলেন বীর-নরসিংহের ছোটভাই।

রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯-৩০

বিজয়নগররাজ্যের ইতিহাসে কৃষ্ণদেব রায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার সম্মান পাইয়াছেন। তাঁহার মতো শক্তিশালী, দূরদর্শী, রণকুশলী সুশাসক বিজয়নগরের সিংহাসনে আর কেহ পূর্বে বা পরে অধিষ্ঠিত হন নাই। বাহমনী ও তাঁহাদের পরবর্তী বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি সুলতানদের আক্রমণ ও

বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের মুদ্রা। বিষ্ণুমূর্তি। রাজার নাম

অভিযান প্রতিরোধ করিয়া তিনি বিজয়নগরের মর্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্বোপকূল অঞ্চলের একটির পর একটি কেন্দ্র হইতে প্রতাপরুদ্রের (কাকতীয়বংশীয়) আধিপত্য উচ্ছেদ করিয়া কৃষ্ণদেব একেবারে কটক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তালিকোটের যুদ্ধ ১৫৬৫॥ কৃষ্ণদেবের আমলে বিজয়নগরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব প্রায় সমগ্র দক্ষিণভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেবের পর তাঁহার ভাই **অচ্যুত রায়**, ভ্রাতুষ্পুত্র **সদাশিব রায়** রাজা হন। সদাশিবের মন্ত্রী রাম রায় রাজ্যের পরিচালক হইয়া ওঠেন। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানরা একজোট হন এবং বেরার ছাড়া অন্য চার-সুলতান মিলিত হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। যুদ্ধ হয় কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরে। কিন্তু রাক্ষসী ও তাঙ্গাদি নামে দুইটি উত্তরতীরের গ্রাম তালিকোট অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী বলিয়া ঐতিহাসিকরা কেহ ইহাকে 'রাক্ষসী-তাঙ্গাদির যুদ্ধ', কেহ 'তালিকোটের যুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যুদ্ধে প্রথমে হিন্দুদের জয় হয়, কিন্তু পরে ২৩ জানুয়ারী ১৫৬৫ মঙ্গলবার, চূড়ান্ত সংগ্রামে বিজয়নগরের প্রচণ্ড পরাজয় ও বিপর্যয় হয়।

বিজয়নগরের প্রশাসনিক ও অর্থনীতিক অবস্থা

মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী বিজয়নগরের রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক

ব্যবস্থার ভিত্ গঠিত হইয়াছিল। রাজা ছিলেন পিরামিডের চূড়ায়, মন্ত্রীপরিষদ তাঁহাকে রাষ্ট্রপরিচালনায় পরামর্শ দিতেন। প্রদেশকর্তা, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতিদের লইয়া মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইত। রাজার পরবর্তী স্তরের রাজ-কর্মচারীদের প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রত্নাগারিক ও নগর-রক্ষক (মুসলমানদের কোতোয়াল ও বর্তমান পুলিস-কমিশনারের মতো)। ইঁহাদের অধীনে আরও অনেক কর্মচারী থাকিতেন।

প্রাদেশিক শাসন-সংগঠন খুব দৃঢ় ছিল। সমগ্র বিজয়নগর-রাজ্য দুই-শতাধিক প্রদেশে বিভক্ত ছিল, প্রদেশের অন্তর্গত ছিল **নাডু** বা **কোট্টম্** এবং কতকগুলি গ্রাম লইয়া 'কোট্টম্' গঠিত হইত। প্রদেশের শাসনকর্তা **নায়ক**। নায়করা নির্দিষ্ট রাজকর দিয়া এবং সৈন্যসামন্ত মজুত রাখিয়া নিশ্চিন্তে স্বাধীন-ভাবে প্রদেশ শাসন করিতেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ডাক পড়িলে তাঁহাদের নির্দিষ্ট সৈন্যসামন্ত ও সমরসজ্জা যোগান দিতে হইত। তাহা দিতে পারিলে এবং নির্ধারিত রাজস্ব যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিলে রাজা সাধারণত তাঁহাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রামে পঞ্চায়েতের মতো ব্যবস্থা ছিল এবং গ্রাম্যসমাজের সক্রিয়তা উপরের চাপে নষ্ট করা হইত না। বিজয়নগর-রাজ্যের এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাচীন হিন্দু-ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিজয়নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমাজের উপরের স্তরের ভোগবিলাসে এবং রাজধানীর জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ জনসমাজে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাহার কারণ রাজকীয় ঐশ্বর্যবিলাসের জন্য এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের জন্য রাজভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ রাখিতে এত অর্থের প্রয়োজন হইত যে ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া প্রজাদের কাছ হইতে তাহা আদায় করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাহার ফলে ধনীরা আরও ধনী হইতেন, দরিদ্ররা ক্রমে নিঃস্ব হইয়া যাইতেন। পর্তুগীজ লেখক নুনিজ বলিয়াছেন যে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন ফসলের দশভাগের নয়ভাগ নায়ককে দিত, নায়ক তাহার অর্ধেক রাজাকে দিতেন। নুনিজের উক্তি অতিশয়োক্তি মনে হইলেও, কৃষকদের উপর যে রাজস্বের জন্য যথেষ্ট জুলুম করা হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়নগরের বাহিরের গৌরব ও জাঁকজমকের মধ্যে ইহা কলঙ্ক বলিয়া মনে হয়।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতি

মধ্যযুগের রাজকীয় ঐশ্বর্যবিলাসে আর কিছু না হোক, শিল্পকলার চর্চা ও উন্নতি হইয়াছে। বিজয়নগর রাজধানী এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল ঐশ্বর্যবিলাসের জন্য। ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কোন্তি (Nicolo Conti) ১৪২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর দেখিয়া লিখিয়াছেন: "বিজয়নগর শহরের ব্যাস প্রায় ৬০ মাইল, পাহাড়ের গা পর্যন্ত প্রাচীর দিয়া ঘেরা। শহরবাসীদের মধ্যে প্রায় ৯০ হাজার লোক যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এখানকার লোক বহুবিবাহ করিয়া থাকে। সতীদাহ বা সহমরণপ্রথাও প্রচলিত আছে।" পারস্যের রাজদূত আবদুর রাজ্জাক ১৪৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: "বিজয়নগর শহরের মতো শহর পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। পর পর সাতটি প্রাচীর দিয়া শহরটি বেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে নদীর মতো জলপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, প্রবাহপথ ঝকঝকে পাথর দিয়া বাঁধানো। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে দেওয়ানখানা, মন্ত্রীদের কার্যালয়, চল্লিশ-স্তম্ভের বিশাল হলঘর। তাহার সামনে ৬০ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড়া, মানুষ অপেক্ষা উঁচু গ্যালারীতে রাজকার্যের দলিলপত্র রাখা হয়। সেখানে লিপিকররা বসিয়া দলিলপত্র লেখেন। ইহাকে 'দফ্‌তরখানা' বলা যায়।"

বিজয়নগরের রাজারা প্রাসাদ, অট্টালিকা, দুর্গ, সেচনালা, জলাশয়, দেবদেউল ইত্যাদি নির্মাণে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। দেবালয়স্থাপত্যের মধ্যে বিজয়নগরের ঐতিহাসিক সত্তার বলিষ্ঠতম প্রকাশ হইয়াছে বলা যায়। নূতন দেবালয়ে 'কল্যাণমণ্ডপ', 'হাজার-স্তম্ভ মণ্ডপ' ইত্যাদি নূতন অঙ্গ সংযোজিত হইয়াছিল, এমন কি পুরাতন দেবালয়ও বৃহত্তর করিয়া সংস্কার করা হইয়াছিল। শত শত হাজার-স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ একটা বড় বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্তম্ভের গায়ে মানুষ ও পশুর অতিপ্রাকৃতিক তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি খোদাই করা হইত, অধিকাংশই একখণ্ড পাথর হইতে। এইগুলি ভাস্কর্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দেবালয়ের মধ্যে বিথল বা বিষ্ণুমন্দির, হাজার-রামের মন্দির, কাঞ্চীপুরমের একাম্রনাথ ও বরদরাজের মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত। বিজয়নগরের শেষ পর্বে মাদুরার শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মাদুরার বিখ্যাত সুন্দরেশ্বর-মীনাক্ষী মন্দির ইহার অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দির (দক্ষিণভারতের বৃহত্তর মন্দির) এই পর্বের কীর্তি।

QUESTIONS

1. Give a short account of the rise and decline of the Kingdom of Vijaynagar.

2. Give an account of the administrative system of the Vijaynagar rulers.

3. Briefly describe the economic conditions and the art and culture of the Vijaynagar Empire.

উনবিংশ অধ্যায়

ইসলামের সাংস্কৃতিক সংঘাত

ভারতের হিন্দুদের সহিত প্রাচীনকাল হইতেই বহু বিদেশী জাতি-উপজাতির সান্নিধ্য ঘটিয়াছে। হিন্দুধর্মের সর্বাগ্রাসী উদারতা তাহাদের আত্মসাৎ করিয়াছে, শক হুন পহ্লব গুর্জর প্রভৃতি জাতি হিন্দুসমাজের দেহে ও মনে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত লেনদেনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নাই, হিন্দুসংস্কৃতির সম্ভার সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইসলামধর্মী মুসলমানদের সহিত সংঘাত ও সান্নিধ্যের ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, কারণ হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম, হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার পার্থক্যের জন্যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সহিত প্রাণ খুলিয়া সামাজিক মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করিতে পারে নাই।

সর্দার পানিক্কর বলিয়াছেন "The main social result of the introduction of Islam as a religion into India was the division of society on a vertical basis···Two parallel societies were established on the same soil."— কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইসলামধর্মের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় সমাজ উর্ধ্বাধ রেখায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এতদিন ভারতের সমাজে যে ভেদ ছিল তাহা অনুভূমিক।

CHAPTER XIX: Impact of Islam on India—orthodox reaction—Raghunandana. Synthesis, the Bhakti cult and Sufism, Ramananda, Kabir, Chaitanya, Mira Bai, Namdeva and Nanak. Development of vernacular literature. Art in Sultanate period—Indo-Saracenic and Indigenous art.

এক সমাজের মধ্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা সমাজকে সমান্তরাল রেখার মতো বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে নাই। অনুভূমিক স্তরবিন্যস্ত সমাজে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আদানপ্রদানের দুর্ভেদ্য বাধা থাকে না, কিন্তু ঊর্ধ্বাধ-খণ্ডিত সমাজে তাহা থাকে। ইসলামধর্মের ও সমাজের রীতিনীতিপ্রথা, আচার-বিচার ধর্মানুষ্ঠান, এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত হিন্দুসমাজের পূর্ব-পশ্চিমের মতো ব্যবধান থাকায় ফলে ভারতে দুইটি পৃথক, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সমাজের উদ্ভব হয়। তাহার উপর ইসলামধর্ম এত একমুখী ও একাগ্র যে হিন্দুধর্মের পক্ষে তাহার সহিত যুঝিয়া ওঠাও সম্ভব হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও অবশ্য ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আদর্শের ও ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছে, একের আদর্শ অন্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, শিল্পরীতি ও কলা-কৌশলের লেনদেন হইয়াছে, ভাষা ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। প্রধানত ভাবরাজ্যের ক্ষেত্রে এই আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ। বাকি যাহা তাহা শিল্পকলার রীতি বা স্টাইলের ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যে বা চিত্র রূপায়ণে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রতিক্রিয়ার পথ। রঘুনন্দন

হিন্দুসমাজের কাঠামটি জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার ভিত্তি বা স্তরবন্ধন কোনদিনই অচল অটল ছিল না, এবং সমাজকে তাহা অচলায়তনে পরিণত করে নাই। এই শিথিলতার জন্য কালক্রমে হিন্দুসমাজে অনাচার ও ব্যভিচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে সমাজের নিম্নস্তরের অনুন্নত হিন্দুদের স্বল্পায়াসেই মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন। জোরজবরদস্তি করিয়াও হিন্দুদের ধর্মনাশ করিতে মুসলমানরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। পূর্বভারতে বাংলাদেশে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী হইতে হিন্দুসমাজে এই বিপর্যয় ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল। অর্থ ও রাজখেতাবের লোভে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও বিশেষ ধর্মবন্ধন মানিতেছিলেন না। তাহার উপর ধর্মান্ধ মুসলমানদের ধর্মনাশের প্রচেষ্টাতেও হিন্দুসমাজ আরও দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

মুসলমানদের আগমনের পর পূর্বভারতের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের, সমাজ কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার ছবি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' কাব্যে আঁকিয়াছেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন:

হিন্দু তুরকে মিলল বাস,
একক ধম্মে আওকো উপহাস।
কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ,
কতহুঁ মিলমিস কতহুঁ ছেদ।

ধরি আনএ বাঁভন-বড়ুআ,
মথাঁ চডাবএ গাইক চঁডুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চডাবএ চাহ ঘোড়।

"হিন্দু ও তুরকের (তুর্কী বা মুসলমানের) বাস কাছাকাছি, কিন্তু একের ধর্ম অপরের উপহাসের বস্তু। একের বাঙ (আজ্ঞান), অপরের বেদ। কাহারও সমাজে মেলামেশা, কাহারও সমাজে ভেদ। তুর্কীরা ব্রাহ্মণ-বটুকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মাথায় গরুর ঠ্যাং চড়াইয়া দেয়, তারপর ফোটা চাটিয়া, পৈতা ছিঁড়িয়া ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে চায়।" বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন যে মুসলমানরা অত্যন্ত কোপনস্বভাব, বিনা কারণে তাহাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং চোখমুখ তপ্ত তামার টাটের মতো লাল হইয়া ওঠে।

কবি বিদ্যাপতির অঙ্কিত এই সমাজচিত্র কাল্পনিক নহে, বাস্তব সত্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার হিন্দুসমাজ এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানে, ধর্মেকর্মে পর্যন্ত নানারকমের শৈথিল্য ও অনাচার দেখা দিতে থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন এই সময়ে নূতন করিয়া ধর্মশাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে শিথিল হিন্দুসমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে ইসলামের অভিযানের প্রতিরোধ বলা যাইতে পারে। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সমকালে এবং হুসেন শাহী সুলতানদের আমলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্বমতের খণ্ডন ও পুনঃপ্রবর্তন করিয়া হিন্দু-সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করিতে উদ্‌যোগী হন। আচারবিষয়ে ২৮টি তত্ত্বকথা লইয়া তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' মহাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কেবল পুরাতন স্মৃতিবাক্যের পুনরুক্তি করেন নাই, নূতন করিয়া অনেক কঠোর

সামাজিক বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রধানত স্মার্ত রঘুনন্দনের এই ব্যবস্থা অনুসারেই গত ৪০০ বছর ধরিয়া বাংলার হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সামাজিক বিধানের কঠোরতা সম্বন্ধে সমাজবিদ্‌রা নানামত পোষণ করেন। কেহ বলেন যে রঘুনন্দনের জাতি-বর্ণ-কুল ও আচার-বিচারের শুদ্ধতা সম্বন্ধে কঠোর বিধানের ফলে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হইয়াছে, সমাজ ক্রমে প্রাণহীন, অচল ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। কিছুটা যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, 'বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো' নীতি কিছুটা রঘুনন্দনের ক্ষেত্রেও কার্যকর হইয়াছে। তাঁহার অনেক সামাজিক বিধান আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়াশীল বা পশ্চাদ্‌মুখী মনে হইবে। কিন্তু যে কালে এবং যে-উদ্দেশ্যে রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখিলে তাঁহার সামাজিক বজ্র-আঁটুনি খুব অসংগত বোধ হইবে না। মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দুসমাজকে ঘোর অনাচার ও বিপর্যয়ের কবল হইতে তিনি মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পন্থা একালের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও, সেকালের বিচারে যথার্থ কালোপযোগী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া স্মার্ত রঘুনন্দনের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ইহা একটি দিক ও দৃষ্টান্ত মাত্র। আরও অন্যদিকে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার রূপ স্বতন্ত্র, তাহাকে আমরা 'synthesis' বা সমন্বয়মুখী প্রতিক্রিয়া বলিতে পারি।

সমন্বয়ের পথ

প্রতিরোধের দুই প্রকার রূপ আছে। এক প্রকার রূপ হইতেছে, আত্মরক্ষার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নূতন করিয়া সংগঠিত করা এবং আক্রমণকারীর সহিত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া। রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত ভট্টাচার্যরা ইসলামের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিরোধের এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রতিরোধের দ্বিতীয় রূপ হইতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের মধ্যে সদ্‌গুণ ও মহৎ আদর্শের পারস্পরিক আদান-প্রদান, মিলন-মিশ্রণ। সুলতানী আমলে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সকলেই যে বিধর্মী হিন্দুনিধনযজ্ঞে মত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। বাংলাদেশের হুসেন শাহ, কাশ্মীরের জয়নুল আবেদিন তাহার অন্যতম

দৃষ্টান্ত। হুসেন শাহের কথা আগে বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রধান রাজকর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছিল হুসেন শাহী সুলতানদের পোষকতায়। বাংলা সাহিত্যে মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদির অনুশীলনেও সুলতানীরা আন্তরিক উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেশের লোক তখন হুসেন শাহী সুলতানদের গুণগান করিয়া মুখে মুখে অনেক ছড়া রচনা করিয়াছিল। যেমন—

বাদশা ছিল হোসেন শাহ জাতিতে পাঠান।
হিন্দু তার পাত্র মিত্র উজীর দেওয়ান॥

কাশ্মীরের সুলতান অনুরূপ উদার ছিলেন। তাঁহার পিতার শাসনকালে অনেক ব্রাহ্মণ রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া-কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। 'মহাভারত' 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ পারসী ভাষায় এবং আরবী ও পারসী ভাষার অনেক গ্রন্থ হিন্দিভাষায় তিনি অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই মহানুভবতার জন্য জয়নুল, সংগত কারণেই 'কাশ্মীরের আকবর' বলিয়া পরিচিত।

সূফীবাদের বিকাশ

বাহিরের জগতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামধর্মের যে বিচিত্র বিশ্বমানবিক প্রকাশ হইয়াছিল, সূফী আদর্শ ও দর্শনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ নাই, উভয়ের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার মতো মধুর—এই অনুভূতি ও জীবনদর্শনের সাধনা করিবার জন্য দশম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সূফীদের আবির্ভাব ধর্মসাধনার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। গ্রীসের প্লেটোনিক, ইরানের জরথুশ্ত্রীয় দর্শনের সহিত ভারতীয় বেদান্তের সর্বভূতে ব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধদের সাম্য মৈত্রী করুণা ও পরিব্রাজক জীবনের আদর্শ যে ইসলামের সূফী সাধকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের দ্বিমত নাই।

ভারতে ইসলামধর্মের প্রচারে ও প্রসারে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। একটিকে বলা হয় তুর্কী পদ্ধতি—তুর্কানা তরীকা—ইহা লুটতরাজ হত্যা ও ধ্বংসের পদ্ধতি। পাঠান সুলতানরা অধিকাংশই এই

তুর্কানা-রীতিতে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। দ্বিতীয় পদ্ধতি মুসলমান সুফীসাধকদের শান্তি ও মৈত্রীর পদ্ধতি, তাহাকে সুফিয়ানা তরীকা বলা হয়। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মূল মানবিক আদর্শ সহজ ও সরলভাবে প্রচার করিয়া, অলৌকিক শক্তির খেলা দেখাইয়া (যাহাকে মুসলমানী ভাষায় 'কেরামতি জাহির করিয়া' বলা হয়) তাহাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার পথ সুফীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুফিয়ানা রীতিতে দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা সুদূর বাংলাদেশে ইসলামধর্মের প্রসার বেশী সার্থক হইয়াছিল। তুর্কানারীতিপন্থী মুসলমান গাজী বা যোদ্ধারা বাংলাদেশে পরে সুফিয়ানারীতির সাধকরূপে পীর হইয়াছিলেন। এই সুফিয়ানার পথেই বাংলাদেশে বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি, আউল বাউল দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। লালন ফকির, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাউল জাতিতে মুসলমান।

ভক্তিবাদের প্রবাহ

অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ-ছয়শত বছর ধরিয়া সমগ্র ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণভারতের শংকরাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রমুখ ধর্মসংস্কারকেরা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। শংকরাচার্যের কঠোর অদ্বৈতবাদ রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধ্বের ভিতর দিয়া ধাপে ধাপে ভক্তিবাদের পথে নামিয়া আসিতে থাকে। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষই যে অন্তরের ভক্তিভালবাসার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের সাধনা করিতে পারে, এবং মানুষের সহিত মানুষের প্রীতির সম্পর্কই যে ঈশ্বরপ্রীতির শ্রেষ্ঠ সোপান, একথা জাতিভেদদুষ্ট, আচারসর্বস্ব হিন্দুসমাজে সেদিন উচ্চকণ্ঠে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। কঠোর যুক্তিপন্থী ব্রহ্মবাদীর পথ জনসাধারণের পথ নহে, একথা ভক্তিবাদীরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান সুলতানদের আমলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এই সত্য আরও প্রকট হইয়া ওঠে। দক্ষিণ হইতে উত্তরে ভক্তিবাদের বাণী রামানন্দ (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) বহন করিয়া আনেন, তাঁহার শিষ্য কবীর ও অন্যান্য সাধকরা তাহা সর্বত্র প্রচার করেন—

ভক্তি দ্রাবিড উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ'নৌ খণ্ড ॥

"ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে দ্রাবিড়ে, রামানন্দ তাহা বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং কবীর তাহা প্রকট করিয়াছেন চারিদিকে।" **রামানন্দ** বাহ্ আচার ছাড়িলেন এবং সংস্কৃত ছাড়িয়া চল্‌তি লোকভাষায় ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন এই সাধনা ও প্রচাব প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, রামানন্দ সকল জাতিকে সাধনার অধিকার দিলেন। তাঁহার প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে **রবিদাস** ছিলেন মুচি, **কবীর** ছিলেন জোলা, **সোনা** ছিলেন নাপিত, **ধন্না** ছিলেন জাঠ, **পীপা** ছিলেন রাজপুত। এই ভক্তিবাদের ধারা অবলম্বন করিয়া পাঞ্জাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন **নানক**, রাজপুতনায় **দাদূ**, মহারাষ্ট্রে **নামদেব**, বাংলাদেশে **শ্রীচৈতন্য** ও **নিত্যানন্দ**। সমগ্র উত্তরভারত **মীরাবাঈ** তাঁহার ভক্তিসংগীতে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এইসব সাধকের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর করিয়া মিলন ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা। এইসব বাণীর মধ্যে সেই উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা।—কবীর

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি।—দাদূ

"পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম, কিন্তু নিজের 'দিল্' বা অন্তরের মধ্যে খোঁজ করিলে দেখা যায় যে রাম-রহিমের বাস সেইখানে।" কবীরের বহু দোঁহার মধ্যে এই বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দাদূর কথার মর্ম হইল, আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে, হিন্দু ও তুর্কীতে বা মুসলমানে কোন ভেদ নাই।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের এই বাণী ছাড়া মধ্যযুগীয় সাধকদের সমদৃষ্টি হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল বেশী। ইসলামের গণতান্ত্রিক ও মানবিক আবেদনের উত্তরে ভক্তিবাদী সাধকরা হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে সেদিন যদি এই বাণী প্রচার না করিতেন, সকলের উপর মানুষই যে সত্য—এই আদর্শ সমাজের সামনে তুলিয়া না ধরিতেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের যে কতদূর ক্ষতি হইত তাহা বলা যায় না। রামানন্দের

সমদৃষ্টির ধারায় নামদেব, নানক, শ্রীচৈতন্যদেব মানবিক ধর্মের আদর্শপ্রচার করিয়াছেন এবং মূলকথা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা এই যে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ নাই, ঈশ্বরে-ঈশ্বরেও কোন ভেদ নাই, মানবপ্রীতি ঈশ্বরসাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

মাতৃভাষায় সাহিত্যানুশীলন

ইসলামের সংঘাতে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন পর্বের সূচনা হইয়াছিল। হিন্দী আরবী ও ফার্সী ভাষার সংমিশ্রণে নূতন উর্দু ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সংস্কৃতের পরিবর্তে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক মাতৃভাষার সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চতুর্দশ শতকেই কবি আমীর খসরু বলিয়াছিলেন যে পারসী ও আরবী ভাষা অপেক্ষা ভারতের হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অনেক বেশী উন্নত ও গতিশীল। হিন্দী, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সুলতানী আমলে সাহিত্যসৃষ্টির মর্যাদা-লাভ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসকদের পোষকতায় বাংলাভাষায় লৌকিক পুরাণ ও সাধারণ সাহিত্যের চর্চাও আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত মুসলমান শাসকদের আশ্রিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ বাংলাদেশে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গৌড়ের মুসলমান দরবারের কর্মচারীদের মধ্যেই প্রথম ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রধানত শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বনে রচিত। হুসেন শাহের দবীরখাস সনাতনের জন্য লিখিত ভাগবতের পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। হুসেনের কর্মচারীদের মধ্যে যে অনেক কবি-পণ্ডিত ছিলেন এবং হুসেন শাহী সুলতানরা যে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সেকথা আগে বলা হইয়াছে।

ভারতীয় মুসলমানী শিল্পরীতি

ভারতের মুসলমান সুলতানরা তুর্কিয়ানা পদ্ধতিতে যেমন হিন্দুদের দেবালয় ধ্বংস করিয়াছেন, তেমনি মসজিদ মিনার সমাধি প্রাসাদ অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণেও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। অর্থাৎ একদিকে তাঁহারা ভাঙ্গিয়াছেন, আবার অন্যদিকে নিজেদের মতো করিয়া গড়িয়াছেন। কুতুবউদ্দিন যখন দিল্লী ও আজমীরে মসজিদ সমাধি ইত্যাদি গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন

ইসলামী স্থাপত্যে বৃত্তাকার গম্বুজ (dome) ও কোণাকার তোরণ (pointed arch) একটি বড বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু মিস্ত্রিরাই, যাহারা এই কাজে নিযুক্ত হইত, এই গঠনরীতির সহিত পরিচিত ছিল না। তাহার ফলে হিন্দু মিস্ত্রিরা নিজেদের রীতির সহিত মিশাইয়া যাহা গঠন করিয়াছে মুসলমান শাসকরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দিল্লী ও

(গৌড়ের মসজিদের অক্ষরচিত্র)
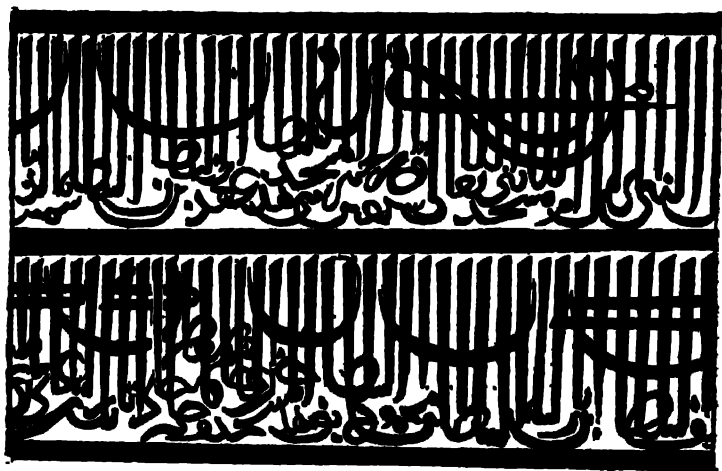
আজমীরের সমাধির তোরণগুলি তাই সমালোচকরা 'Muslim in form, but Hindu in construction' (ভিন্সেণ্ট স্মিথ) বলিয়াছেন। দিল্লীর তুঘলকী স্থাপত্যরীতিতে হিন্দুপ্রভাব খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু জৌনপুরী রীতিতে আবার হিন্দুপ্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং জৌনপুরের মসজিদের চত্বরের ঘেরা পথে ও স্তম্ভাদির গডনে হিন্দু দেবালয়ের ছাপ পড়িয়াছে। বাংলাদেশে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সুলতানী আমলের বিখ্যাত মসজিদগুলি দেখিলে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতির প্রভাব তাহাতে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। তাহার বঙ্কিমরেখাকৃতি কার্নিস দেখিলে গৌড় বাংলার খড়ের ঘরের কথা মনে হইবে। তাহা ছাড়া স্তম্ভ তোরণ খিলান প্রভৃতির গড়নেও হিন্দুরীতি পরিস্ফুট।

উত্তর ও পশ্চিমভারতের মুসলমানী স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন দেখিতে

পাওয়া যায় গুজরাটে। সেখানকার মসজিদগুলি দেখিলে বোঝা যায় যে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের গড়ন কিছুটা বদলাইয়া মুসলমানদের আরাধনা-স্থানের উপযোগী করা হইয়াছে এবং গুজরাট ও দক্ষিণ-রাজপুতানার হিন্দু কারুবিদ্যার প্রভাবও তাহার উপর স্পষ্ট। ক্যাম্বের প্রধান মসজিদের প্রবেশপথ ঠিক হিন্দু মন্দিরের মতো। এইসব নিদর্শন হইতে বোঝা যায় যে ভারতের মুসলমানী শিল্পরীতি বাগদাদ বা মেসোপোতামিয়ার বিশুদ্ধ ইসলামী রীতি নহে, স্বতন্ত্র ভারতীয়-মুসলমানী রীতি ধর্ম সাহিত্যের মতো শিল্পকলার ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানী রীতির সংমিশ্রণে এক নূতন রীতি-সমন্বয় হইয়াছিল। সুলতানীযুগে এবং পরে মোগল আমলেও এই মিশ্ররীতির বিকাশ হইয়াছিল স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও কারুশিল্পে।

QUESTIONS

1. What were the social consequences of the impact of Islam on India ?

প্রতিক্রিয়ার ধারায় স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি এবং সমন্বয়ের ধারায় ভক্তিবাদ, সুফীবাদ ইত্যাদির বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে।

2. Write what you know of the development of Vernacular literature and Indo-Saracenic style of art under the Sultanate.

3. Give an account of the development of the cult of Bhaktism and Vaisnavism in the age of the Sultans.

4. Write notes on :

   (a) Chaitanya

   (b) Nanak

   (c) Kabir

   (d) Ramananda

   (e) Mira Bai

বাবর। হুমায়ুন। শের শাহ

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে আবার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। মোগল শাসকরা ভারতের সিংহাসনে বসিলেন। ভারতে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পিতৃবংশানুক্রমে তৈমুরের সহিত এবং মাতৃবংশানুক্রমে চেঙ্গিস খাঁর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজীব—এই ছয়জনই প্রসিদ্ধ মোগল বাদশাহ। ১৫২৬ সনে প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পর হইতে ১৭০৭ সনে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর মোগল বাদশাহরা রাজত্ব করেন। তাহার পর ইংরেজদের কুটনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রণনীতির চাপে মোগলদের শাসনবন্ধন দ্রুত শিথিল হইতে থাকে এবং ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ধীরে ধীরে ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ ১৫২৬

পারস্য ও তুর্কীস্থানের মধ্যবর্তী ফরগনা অঞ্চলে বাবর জন্মগ্রহণ করেন (১৪৮৩)। পিতার মৃত্যুর পর (১৪৯৪) এগার বছর বয়সে তিনি পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। যখন তিনি ১৪-১৫ বয়সের কিশোর তখন হইতেই সাম্রাজ্য-জয়ের স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রথমে সমরকন্দ জয় করেন (১৪৯৭)। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উজবেকপতি তাঁহাকে সমরকন্দ ও ফরগনা হইতে বিতাড়িত করেন। বাবর-যাযাবরের মতো নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। হিন্দুস্থানে তাঁহার প্রথম অভিযান আরম্ভ হয় ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে। পারসীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিলেন এবং উজবেকদের সহিত যুদ্ধে শিখিয়াছিলেন তাহাদের মারাত্মক 'তুলুঘ্মা' রণকৌশল, অর্থাৎ শত্রুসেনার পাশ (flank) ভাঙ্গিয়া দিয়া যুগপৎ সামনে ও পিছনে বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণ করার কৌশল। এই রণকৌশলে সৈন্যদের সুশিক্ষিত করিয়া নূতন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া বাবর ভারত অভিযান করেন।

CHAPTER XX; The Mughals, Panipat. War with Rajputs, Babur, his memoirs—Humayun—Sher Shah—his revenue and administrative measures. Mughal power re-established.

কাবুল হইতে পাঞ্জাব অভিমুখে ১২ হাজার সৈন্য লইয়া বাবর যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (নভেম্বর ১৫২৫)। দৌলত খাঁ লোদীর বাধা দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাবর দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন। দিল্লী হইতে ইব্রাহিম লোদী তাঁহার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর অনতিদূরে পানিপথে, ২১ এপ্রিল ১৫২৬, ঐতিহাসিক যুদ্ধে ভারতে পাঠান
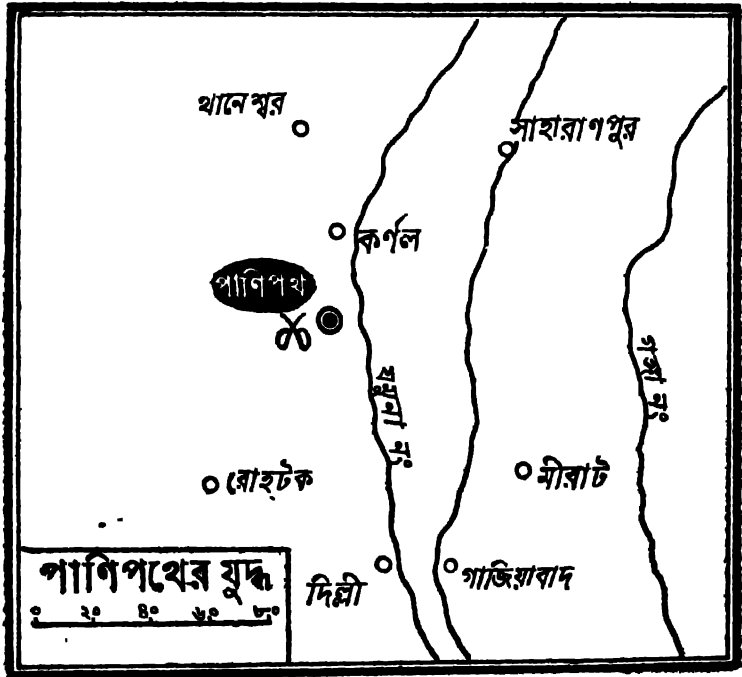
সুলতানদের ভাগ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। গজারোহী ও অশ্বারোহী ছাড়া ইব্রাহিমের প্রায় একলক্ষ সৈন্য ছিল, বাবরের সৈন্য অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু বাবরের ভাষায়, ইব্রাহিমের কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, সৈন্যসমাবেশ ও পরিচালনায় তাঁহার বিবেচনা ও দূরদর্শিতারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সংখ্যায় অল্প সৈন্য লইয়াও বিচক্ষণ অধ্যক্ষতা, সুশৃঙ্খল পরিচালনা ও উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য বাবরের পক্ষে ইব্রাহিমকে যুদ্ধে পরাজিত করা খুব কঠিন হয় নাই। 'আত্মজীবনী'তে বাবর লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের কৃপায় এই বিপুল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিতে আমার কষ্ট হয় নাই,

একবেলার মধ্যেই তাহা ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিল।" বাবর দিল্লী ও আগ্রা দ্রুত অধিকার করেন।

রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ

বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন আফগান নায়কদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া জৌনপুর ও গাজীপুর দখল করিলেন। গোয়ালিয়র, এটাওয়া, কল্পি, ধোলপুর—একে একে সব মোগলদের অধিকারভুক্ত হইল। পাণিপথের যুদ্ধের পর আটমাসের মধ্যে মোগলরা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য জয় করিলেন। বাকি রহিল কেবল মেবার চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহের দুর্ধর্ষ রাজপুতশক্তিকে জয় করা। চিতোরের রানা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন তখন হিন্দু রাজপুতদের মধ্যমণি। গুজরাট, ভিলসা, রণথম্বর প্রভৃতি জয় করিয়া মধ্যভারতে তিনি বিপুল রাজপুতশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বাবর দিল্লীর সুলতানকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু বাবর হিন্দুস্থানে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগী দেখিয়া রানার দুশ্চিন্তা হইল, তিনি তাহাতে বাধা দিবার সংকল্প করিলেন। বাবর ও রানার বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য খানুয়া বা কান্‌ওয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে দুইপক্ষ মুখোমুখি দাঁড়াইলেন।

আগ্রার কয়েক মাইল পশ্চিমে খানুয়া বা কান্‌ওয়া গ্রাম। যুদ্ধের দিন ২৭ মার্চ ১৫২৭ (কাহারও মতে ১৬ মার্চ) হিন্দু রাজপুত রানার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বাবর জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। খানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু বাবর তাঁহার উন্নত রণকৌশল ও অস্ত্রের জন্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলেন। অবশেষে ঘর্ঘরার যুদ্ধে (৬ মে ১৫২৯) সুলতান মামুদ লোদী ও তাঁহার সহযোগীদের পরাজিত করিয়া বাবর পাঠানশক্তির পুনরুত্থানের আশা একেবারে চূর্ণ করিয়া দেন।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতে মোগলশক্তির অভ্যুদয় ও জয় হয়, দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হন। খানুয়ার যুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রানা সংগ্রামসিংহের পরাজয়ে রাজপুতদের হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যায়, মোগলশক্তির প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হয়। অবশেষে ঘর্ঘরার যুদ্ধে পাঠানশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয়ে ভারতে মোগলশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতে মোগলশক্তির প্রতিষ্ঠাতারূপে এইজন্য বাবর ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

বাবরের চরিত্র ও আত্মজীবনী

২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর যে একজন কৃতী যোদ্ধা ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শাসনপ্রতিভা বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুলতানী আমলের শেষপর্বের শাসনব্যবস্থা তিনি তেমন সংস্কার করেন নাই। তিনি হৃদয়বান উদার পুরুষ ছিলেন, ধর্মীয় সংকীর্ণতাও তাঁহার বিশেষ ছিল না। শিল্পীসুলভ রুচিসৌন্দর্যপ্রীতি তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তুর্কী ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল। তাঁহার রচিত "আত্মজীবনী" ইতিহাসের তো বটেই, সাহিত্যেরও সম্পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে। সহজ সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি নিজের জীবনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কোন প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনাকে গোপন করেন নাই। এই কারণে তাঁহার 'আত্মজীবনী' সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উভয়ের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে। আকবরের নির্দেশে বাবরের 'আত্মজীবনী' ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৮২৬ সনে ইহার একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয় (Erskine ও Leyden কৃত)।

কিশোর বয়সে পিতৃহীন ও রাজ্যহীন হইয়াও বাবর নিজের সংগঠন ও সামরিক প্রতিভাবলে বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। গজনীর মামুদের মতো অমানুষিক ধ্বংসলীলায় ও বিধর্মী-নিধনে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করেন নাই। তিনি সত্যকার মানবদরদী বলিয়াই শিল্পানুরাগী ছিলেন। বাবর একহাতে তরবারী ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, আর একহাতে লেখনী ধারণ করিয়া অপূর্ব কবিতা ও সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। মোগল শাসনকালে ভারতের সমাজ, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইতে পারে, বাবরের জীবনে ও চরিত্রে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুকালে হুমায়ুন ছিলেন ২৩ বছরের যুবক। তাঁহার পিতা বাবর ও পুত্র আকবর অনেক অল্পবয়সে রাজ্য-পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। পিতার আমলে বাদকশানের শাসক হিসাবেও তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি বাবরের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য প্রায় হারাইতে বসিয়াছিলেন। হুমায়ুন ছিলেন সুশিক্ষিত 'ভদ্রলোক', একেবারে

নিষ্কর্মাও ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতিভাবান পিতা বাবরের মতো তাঁহার কর্মক্ষমতা, ধৈর্য ও দূরদর্শিতা ছিল না। তাহার উপর আফিমের নেশাও তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিল। আরামপ্রিয়তাও তাঁহাব ব্যর্থতা ও পতনের অন্যতম কারণ।

গুজরাট আক্রমণ করিয়া (১৫৩৫) হুমায়ুন প্রথমে বেশ কৃতিত্ব দেখান, কিন্তু আগ্রায় বসিয়া বিলাসে মত্ত থাকার জন্য গুজরাট ও মালব হাতছাড়া

হুমায়ুনেব মুদ্রা

হইয়া যায়। আফগানদের মধ্যে পশ্চিমে গুজরাটেব বাহাতুর শাহ এবং পূর্বেব আরও তুর্ধর্ষ শূরবংশীয় আফগান নায়ক শের খান (শের শাহ) হুমায়ুনের পথের প্রধান কণ্টক ছিলেন। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে শের খানের বিরুদ্ধে হুমায়ুন অভিযান করিলেন, কিন্তু চুনার তুর্গ অধিকার করিতে তাঁহার এত সময় কাটিয়া গেল যে শের খান সেই সুযোগে গৌড় দখল করিলেন। বক্সারের কাছে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) হুমায়ুনের মোগল সৈন্য শের খানের কাছে পরাজিত হয়। আরও একবছর পবে (১৫৪০) হরদোই-এর যুদ্ধে (কনৌজের যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত) শের খানের কাছে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পাঞ্জাব পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার ভাইদের প্রীতিলাভের চেষ্টা করিয়া হুমায়ুন ব্যর্থ হন এবং শেষে সিন্ধু চলিয়া যান। এই সময় হামিদা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৫৪১)। হামিদা বেগম আকবরের জননী। রাজপুতানা হইতে সিন্ধু ফিরিবার পথে আকবরের জন্ম হয় (১৫ অক্টোবর ১৫৪২ ; মতান্তরে ২৩ নভেম্বর ১৫৪২)।

শের শাহ ১৫৩৯-৪৫

হুমায়ুনের বারংবার ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে হঠাৎ শের শাহের অধীনে পাঠান-শক্তির প্রবল পুনরুত্থানে মনে হইল মোগলদের ভাগ্যরবি বুঝি অস্ত যায়। তাহা

অবশ্য যায় নাই, তবে ১৫ বছর শূরবংশীয় আফগানরা দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া মোগলযুগের ইতিহাসের মধ্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। আফগান বীর শের শাহ এই নূতন অধ্যায়ের রচয়িতা। বাবরপুত্র হুমায়ুনকে রাজ্যসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শেরখান 'শের শাহ' নামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (ডিসেম্বর ১৫৩৯)। অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান বীর শের শাহের কৃতিত্ব যে অসাধারণ তাহা ইতিহাসে স্বীকৃত। বিহারের সাসারাম অঞ্চলের একজন অখ্যাত জায়গীরদার হইতে জীবন শুরু করিয়া তিনি ভারতের সম্রাটরূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করিলেও এবং যুদ্ধবিগ্রহে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকিলেও, শের শাহ রাজ্য সুশাসনের জন্য যে-সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে শাসকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শের শাহের শাসনব্যবস্থা

শের শাহের আগে পাঠান সুলতানরা যে শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা স্তরে স্তরে উচ্চচূড়া হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিন্যস্ত ছিল। কিন্তু শের শাহ যে শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার মূলকেন্দ্র ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে বা পাদদেশে, উপরে বা চূড়ায় নহে। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি 'সরকারে' বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক 'সরকার' কয়েকটি পরগণায় ভাগ করা হইয়াছিল। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি পরগণা গঠিত ছিল। প্রদেশের শাসককে **ইক্তাদার** অথবা **জায়গীরদার** বলা হইত। প্রদেশের অধীন প্রত্যেক সরকারে রাজকার্যের প্রধান পরিচালক ছিলেন **শিকদার-ই-শিকদারান**; বিচারকার্য ও রাজস্বের পরিচালক ছিলেন **মুনসিফ-ই-মুনসিফান**। সরকারের অধীন পরগণায় **শিকদার, মুনসিফ, ফোতাদার** (কোষাধ্যক্ষ), **কানুনগো** (ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ের কর্মচারী), **কারকুন** (লেখক), **আমিন** প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামের ভার থাকিত মণ্ডলদের উপর। গ্রাম-পরগণা-সরকার-প্রদেশ, ধাপে ধাপে এইভাবে ভিৎ হইতে শাসনব্যবস্থা উপরের কেন্দ্রীয় চক্র দেওয়ানগোষ্ঠি এবং তাহার উপরে স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন স্বভাবতঃই শের শাহ নিজে। তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান শাসক, বিচারক ও রণনায়ক। তাঁহার অধীনে ছিলেন কয়েকজন উজীর

বা মন্ত্রী—(১) **দিওয়ান-ই-ওজারত** বা রাজস্বমন্ত্রী, (২) **দিওয়ান-ই-আরিজ** বা সেনাবিভাগের মন্ত্রী, (৩) **দিওয়ান-ই-রিসালত** বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও (৪) **দিওয়ান-ই-ইন্‌সা**, বা দলিল-দস্তাবেজ বিভাগের মন্ত্রী। এই চারজন মন্ত্রী ছাড়া বিচারবিভাগের একজন, সংবাদবিভাগের একজন এবং রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মন্ত্রী ছিলেন। শের শাহের আদেশ ও নির্দেশ মন্ত্রীরা পালন করিতেন এবং প্রাদেশিক শাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম তদারক করার ও আবশ্যক মতো সম্রাটকে তাহা জ্ঞাপন করার ভারও থাকিত তাঁহাদের উপর। মন্ত্রীরা ছাড়াও শের শাহের নিজের খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। শের শাহের এই শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবন করিলে বোঝা যায় যে কেবল সামরিক সংগ্রামে নহে, রাষ্ট্রিক সংগঠনেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

শের শাহের রাজস্বব্যবস্থা

দেশের সমস্ত জমি মাপজোক করিয়া রাজার প্রাপ্য রাজস্ব ও প্রজার স্বত্ব শের শাহ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। প্রজার স্বত্ব, ও 'কর' নির্দিষ্ট করিয়া রাজার তরফ হইতে 'পাট্টা' বা পত্র এবং প্রজার তরফ হইতে 'কবুলিয়ত' বা স্বীকৃতি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণভাবে উৎপন্ন শস্যের
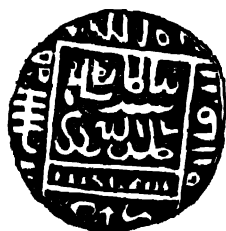
শের শাহের মুদ্রা

তিনভাগের একভাগ রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নির্ধারণের পদ্ধতি অনেক চিন্তা করিয়া উদ্‌ভাবন করা হইয়াছিল। জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা-শক্তি অনুসারে 'উত্তম', 'মাঝারি' ও 'মন্দ' এই তিনভাগে ভাগ করিয়া, তিনশ্রেণীর জমির মোট ফসলের পরিমাণ হইতে 'গড' (average) ঠিক করা হইত এবং সেই গড়ের তিনভাগের একভাগ ছিল রাজস্ব।

শের শাহ প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থায় প্রজাস্বত্ব নির্দিষ্ট হওয়াতে স্থানীয় জমিদার জায়গীরদারদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল ; প্রজারাও

কিছুটা স্বস্তি পাইয়াছিল। পাট্টা-কবুলিয়তের জন্ম জমিদার বা কোন রাজকর্মচারী হিসাবের গোলমাল করিয়া সহজে জোরজুলুম করিতে পারিতেন না। রাজস্ব-ব্যবস্থার ভিত্তিও খুব দৃঢ় ছিল। জমির মাপজোক করিয়া উৎপাদিকা-শক্তিভেদে গড়-ফসলের উপর যে রাজস্ব নির্দিষ্ট হইত তাহাতেও রাষ্ট্রের লাভবান হইবার কথা এবং হিসাবের কোন গরমিল হইবার কথা নহে। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব-আদায়কারীদেরও কোন কারসাজি করিবার সুযোগ বিশেষ থাকিত না। কিন্তু অনুর্বর জমির কৃষকদের উপর পূর্বের গড় নির্ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী রাজস্বের ভার একটু বেশী পড়িত, তিনভাগের একভাগ না হইয়া প্রায় অর্ধেকের মতো। ইহা দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে একটু বেশী হইত।

হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার ১৫৫৫

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জালাল 'ইসলাম-শাহ' নামে প্রায় নয় বছর (১৫৪৫-৫৪) রাজত্ব করেন। ইসলামের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বাদশ বছরের পুত্র ফিরুজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। শের শাহের ভাই মুবারিজ খাঁ (আদিল শাহ) বালক ফিরুজকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তারপর অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যেও সিংহাসন লইয়া রেষারেষি আরম্ভ হয়। এই সময় হুমায়ুন ভারত আক্রমণ করেন (নভেম্বর ১৫৫৪)। ফেব্রুয়ারি মাসে (১৫৫৫) লাহোর অধিকার করিয়া জুলাই মাসের মধ্যে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন। কিন্তু ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। বালক আকবর ও তাঁহার অভিভাবকের উপর আফগানশক্তি নিশ্চিহ্ন করার ভার পড়ে।

QUESTIONS

1. "Babur emerges as immensely likeable, a very vigorous, artistic personality." Discuss the statement with reference to Babur's achievements and character.

2. "Sher Shah was an outstanding administrator to Moslem India." Discuss the statement with reference to Sher Shah's revenue and administrative measures.

3. Write notes on :
   (a) First Battle of Panipat 1526
   (b) Rana Sangram Singh.

একবিংশ অধ্যায়

আকবর। জাহাঙ্গীর। শাহজাহান

পাঞ্জাবের একটি উদ্যানে (কালনৌরের) চোদ্দ বছরের বালক আকবরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হয় (১৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬)। হুমায়ুনের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান শেষ করার সিদ্ধান্ত করেন আকবরের অভিভাবক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈরাম খাঁ। পাছে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহাসন দাবী করিয়া বসেন তাই বৈরাম বিলম্ব করেন নাই। আকবর কিশোর নাবালক ছিলেন বলিয়া রাজ্যের পরিচালক হইয়াছিলেন বৈরাম খাঁ।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬

অভিষেকের কয়েক মাসের মধ্যেই আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু বহু গজারোহী ও সৈন্যসামন্ত লইয়া দিল্লী অভিযান করিলেন। দিল্লীর প্রদেশ-শাসক তর্দী বেগ তুঘলকাবাদে পরাজিত হইলেন। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল সৈন্যদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। অশ্বারোহী মোগল তীরন্দাজদের প্রচণ্ড আক্রমণে হিমুর হাতীঘোড়া, সৈন্যসামন্ত সব ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। হিমু নিজেও তীরবিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বন্দী হিমুকে আকবরের কাছে ধরিয়া আনিয়া বৈরাম হত্যা করিতে বলিলে তিনি তাহা করেন নাই। শেষে বৈরাম নিজেই তরবারি দিয়া হিমুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলেন। হিমুর পরাজয়ে মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও আফগানশক্তির অবসান ঘোষিত হয়। ইহাই হইল পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) মোগলদের অভ্যুদয় হয় বটে, কিন্তু স্থির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর সময় কাটিয়া যায় এই নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে। প্রধানত পাঠানদের বিরোধিতাই এই প্রতিষ্ঠার অন্তরায় ছিল, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তাহা প্রায় দূর হইয়া যায়।

CHAPTER—XXI : Akbar—Conquests and annexations. Rajputana-Bengal, the Deccan. Akbar's reforms, court, religion, building, activities. Jahangir and Nur Jahan. Shah Jahan—North Western and Central Asian Policy, Deccan Policy, patronage of Art. War of Succession.

বৈরামের বিদায়

বাবর ও হুমায়ুনের অধীনে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম করিয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে কৃতিত্ব দেখাইয়া বৈরাম খাঁ তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। আকবরের অভিষেকের পর তিনি তাঁহাকে শত্রুমুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে ক্রমে তাঁহার কর্তৃত্ব সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিল। আকবরের আত্মীয়-বন্ধুরা এই সময় তাঁহাকে বৈরামের দায়মুক্ত হইতে উপদেশ দেন। আকবর একদিন বৈরামকে ডাকিয়া বলেন (১৫৬০) যে এখন তিনি সাবালক হইয়াছেন, রাজকার্য নিজেই দেখাশুনা করিতে পারিবেন, বৈরাম অবসর লইয়া মক্কায় চলিয়া যান। মক্কায় যাইবার পথে গুজরাটে একজন আফগান আততায়ীর হাতে বৈরাম নিহত হন (১৫৬১)।

আকবরের রাজ্যজয়

বৈরামের বিদায়ের পর আরও বছর দুই আকবরকে টাল সামলাইতে হইয়াছিল। তারপর আকবরের অবিরাম রাজ্যজয়ের অভিযান আরম্ভ হয়। বৈরামের অভিভাবকত্বের সময় গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর মোগলদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মালব-জয়ও শেষ হয় ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে **অম্বরের** (জয়পুর) রানা বিহারীমল বিনাযুদ্ধে আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আকবর তাঁহাকে পাঁচহাজারের মনসবদারী দিয়া তাঁহার পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র বিখ্যাত মানসিংহকে মোগল সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। কেবল তাহাই নহে, রাজপুতরাজ বিহারীমলের কন্যা যোধবাইকে বিবাহ করিয়া আকবর আত্মীয়তা স্থাপন করেন। ইহা কেবল আত্মীয়তা স্থাপন নহে, মোগল-রাজপুত সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ঘটনা।

রাজপুতনায় একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আকবর **গণ্ডোয়ানা** ('গণ্ড' জাতির দেশ, বর্তমান জব্বলপুর অঞ্চল) অভিযান করেন (১৫৬৪)। নাবালক রাজা বীরনারায়ণের পক্ষে রানীমাতা দুর্গাবতী মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অল্প সৈন্য লইয়া বীরের মতো যুদ্ধ করেন এবং পরাজয় নিশ্চিত বুঝিয়া নিজে ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করেন। যুদ্ধে বীরনারায়ণও প্রাণ বিসর্জন দেন।
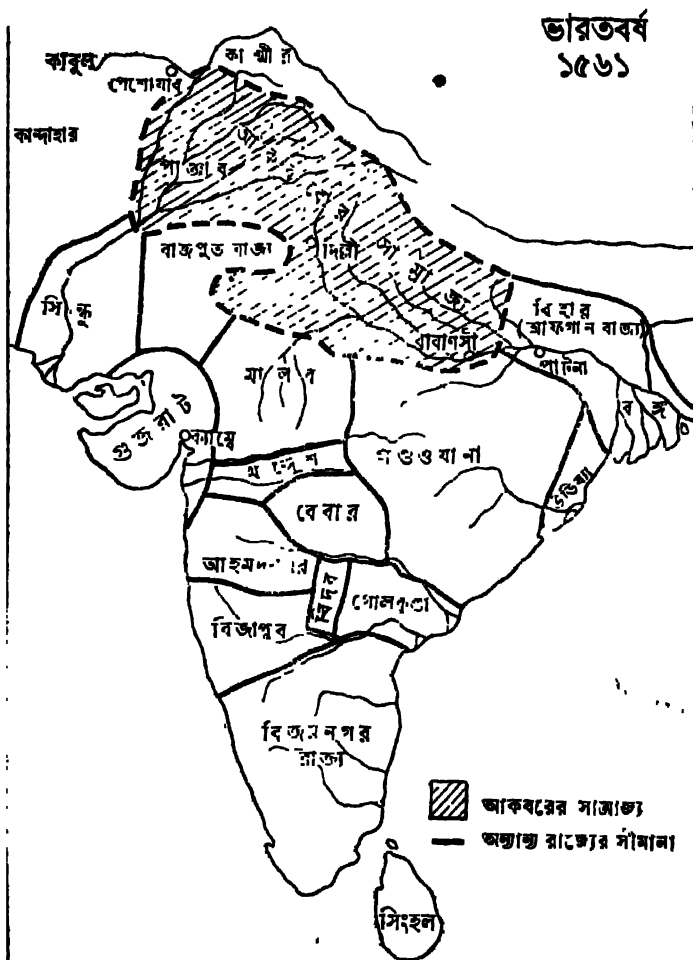
আকবরের পরবর্তী অভিযান **চিতোর** (অক্টোবর ১৫৬৭)। উত্তরভারতে রাজপুতশক্তিকে খর্ব করিতে হইলে মারওয়াড়ের মার্তা, মেবারের চিতোর ও বুন্দীর রণথম্বর দখল করা আবশ্যক। মার্তা পূর্বেই দখল করা হইয়াছিল। এইবার মেবারের রানা উদয়সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইল। রানা নিজে আরাবল্লী পর্বতে আত্মগোপন করাতে জয়মল ও পাত্তা

সিংহের উপর প্রতিরোধের ভার পড়িয়াছিল। প্রচণ্ড প্রতিরোধের পরে জয়মল যুদ্ধে নিহত হইলে রাজপুতদের পরাজয় ঘনাইয়া আসে। অবরুদ্ধ চিতোরের পতন হইলেও মেবারের রাজপুতরা সহজে মাথা হেঁট করেন নাই। পরে উদয়সিংহের পুত্র রানা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের সংগ্রাম তাহার প্রমাণ।

মার্তা ও চিতোরের পর **রণথম্বরেরও** পতন হয় (১৫৬৯)। এইবার রাজপুতানা হইতে পশ্চিম ভারতের দিকে আকবরের অভিযান আরম্ভ হয়। **গুজরাটের** অপদার্থ সুলতান আত্মসমর্পণ করেন (১৫৭২) এবং **সুরাট** অধিকৃত হয় (১৫৭৩)। তারপর ক্যাম্বেতে পর্তুগীজদের সহিত চুক্তি করিয়া তিনি রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে ফিরিয়া আসেন। ফিরিবার পরেই শুনিতে পান যে, 'মীর্জা' বলিয়া পরিচিত একদল মোগল আমীরের উস্কানিতে গুজরাটে
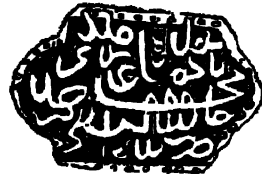
আকবরের মুদ্রা

আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া ঝড়ের বেগে আকবর কিছু সৈন্য লইয়া নয়দিনে আমেদাবাদ উপস্থিত হন (প্রায় ৬০০ মাইল পথ)। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় (সেপ্টেম্বর ১৫৭৩)। এই দ্বিতীয় অভিযানের সাফল্যের পর গুজরাট-বিজয় শেষ হইয়া যায়। পশ্চিম-উপকূলের বন্দর মোগলদের অধীনে আসে এবং তাহার ফলে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সুযোগ প্রশস্ত হয়।

গুজরাটের পর আরম্ভ হয় **বাংলাদেশে** অভিযান (১৫৭৪-৭৬)। শূরবংশের পাঠানদের পর কররানীবংশের সুলেমান কররানী বাংলার সুলতান হন (১৫৬৪)। আকবরের শাসন-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে সুলেমান কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর (১৫৭২) পর কনিষ্ঠপুত্র দাউদ সিংহাসনে অগ্রজের উত্তরাধিকারী হইয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ করিয়া মুদ্রা (coins) পর্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করেন। আকবর যখন গুজরাটে ছিলেন, দাউদ তখন মোগল ঘাঁটি দখল করিবার চেষ্টা করেন। দাউদের ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য আকবর বাংলাদেশ অভিমুখে

যুদ্ধযাত্রা করেন (১৫৭৪)। সুদক্ষ সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মুঙ্গের, ভাগলপুর ও তেলিযাগেড়ি দখল করেন। তারপর রাজধানী তাণ্ডায় (গৌড় হইতে সুলেমান কররানী তাণ্ডাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন) প্রবেশ কবিলে দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। সেখানে তুকারোই-এর (বালাসোর জেলায়) যুদ্ধে দাউদ খাঁ পবাজিত হন (মার্চ ১৫৭৫)। দাউদ আত্মসমর্পণ করিলে, তোডরমল্লের উপদেশ না শুনিয়া মুনিম খাঁ তাঁহাকে উড়িষ্যাব শাসনভাব দেন। কয়েকমাসের মধ্যেই দাউদ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন। রাজমহলেব যুদ্ধে (জুলাই ১৫৭৬) দাউদ পরাজিত ও নিহত হন।

বাংলাদেশেব পর আবাব রাজপুতদের লইয়া সমস্যা দেখা দেয। মেবারের **রানা প্রতাপসিংহ** রাজা হইয়া (১৫৭২) মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে তাঁহাব ঐতিহাসিক সংগ্রাম আরম্ভ কবেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বানা প্রতাপের মৃত্যু পযন্ত প্রায পঁচিশ বছব ধবিযা এই বিরোধিতা ও সংগ্রাম চলিতে থাকে। আকবরের বীর সেনাপতি মানসিংহ হলদিঘাট বা গোগণ্ডার বিখ্যাত যুদ্ধে বানা প্রতাপকে পরাজিত কবেন। কিন্তু পরাজিত হইলেও প্রতাপ পরাজয স্বীকার করেন নাই। পার্বত্য অঞ্চলে চলিয়া গিযা দীর্ঘকাল তিনি মোগলেব বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাইযাছিলেন। কথিত আছে, এই প্রতিরোধের সময় মেবারেব কোন গৃহে প্রদীপ পর্যন্ত জলে নাই।

পূর্বদিককে শান্ত করিবাব ব্যবস্থা করিযা আকবর নিজে **কাবুল** অভিযান পবিচালনা করেন (১৫৮১), কাবুলের শাসক হাকিম পাহাড অঞ্চলে পলায়ন কবেন। তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত (১৫৮৫) আকবর তাঁহাকে কাবুল শাসনের অনুমতি দেন, তারপব মানসিংহ শাসনকাযের ব্যবস্থা কবেন।

কাবুল অধিকারের পর **উত্তরপশ্চিম সীমান্তের** দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। সেখানকার দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতিগুলিব নেতাদেব ভাতা-মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া আকবব তাহাদেব শান্ত ও খুশী করাব চেষ্টা করেন। কাবুলের উপর অধিকার বজায় বাখিতে হইলে কান্দাহার দখল করাও প্রয়োজন। বিনা যুদ্ধে পারসী শাসক **কান্দাহার** আকবরকে সমর্পণ করেন (১৫৯৫)। এই সময় **বেলুচিস্তানও** মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। তাহার আগে **কাশ্মীর** (১৫৮৬) ও সিন্ধুও (১৫৯০--৯১) যুক্ত হইয়াছিল।

উত্তরভারতে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আকবর

দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করেন। আকবরের রাজত্বের শেষদিকে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি মুসলমান স্বলতান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল—খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর, বিদর ও গোলকুণ্ডা। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে কোন অঞ্চল দখল করার আগ্রহ আকবরের বিশেষ ছিল না। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদর বাদে বাকি চারটি রাজ্যের স্বলতানদের কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি জানিবার চেষ্টা করেন যে তাঁহারা মোগল শাসন মানিতে রাজী আছেন কিনা। খান্দেশের স্বলতান রাজা আলি খাঁ আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু আহম্মদনগরের স্বলতান বুরহন-উল-মুলক করিতে চান না। আহম্মদনগর অবরোধ করা হয় (১৫৯৫) এবং চাঁদবিবি অপূর্ব বীরত্বের সহিত মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। মোগল সেনাপতিরা সন্ধি করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। পরে আবার যুদ্ধ হয়। চাঁদবিবি এই সময় নিহত হন। আহম্মদনগর আক্রমণ করা হয় (১৬০০)। সমগ্র আহম্মদনগর মোগলের পক্ষে দখল করা সম্ভব হয় নাই, তাহার কিছুটা অংশ শেষ পর্যন্ত স্বলতানবংশের শাসনাধীনে ছিল।

আকবরের সাম্রাজ্যনীতি

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরিয়া (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) আকবর মোগল-সাম্রাজ্যের বিস্তার, নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহাতে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে মুসলমানযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যজয়ী শাসক বলা যাইতে পারে। একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "a strong and stout annexationist before whose sun the modest star of Lord Dalhousie pales." ব্রিটিশযুগে ডালহৌসির সাম্রাজ্য প্রসারনীতির সহিত আকবরের তুলনা করিলে মনে হয় যেন মোগল বাদশাহ ভারতের আকাশে প্রখর সূর্যের মতো দীপ্তিমান, আর ডালহৌসির ক্ষুদ্র তারাটি তাহার পাশে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ইহা আপাতদৃষ্টিতে অতিশয়োক্তি মনে হইলেও স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিলে সত্য বলিয়াই মনে হয়।

আকবরের শাসনসংস্কার ও হিন্দুনীতি

আকবরের শাসননীতি তাঁহার হিন্দুনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই আকবরের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে একটি 'national monarchy' বা 'জাতীয় রাজতন্ত্র' স্থাপন করা। তাহা করিতে হইলে যে ভারতের বৃহত্তম সম্প্রদায়
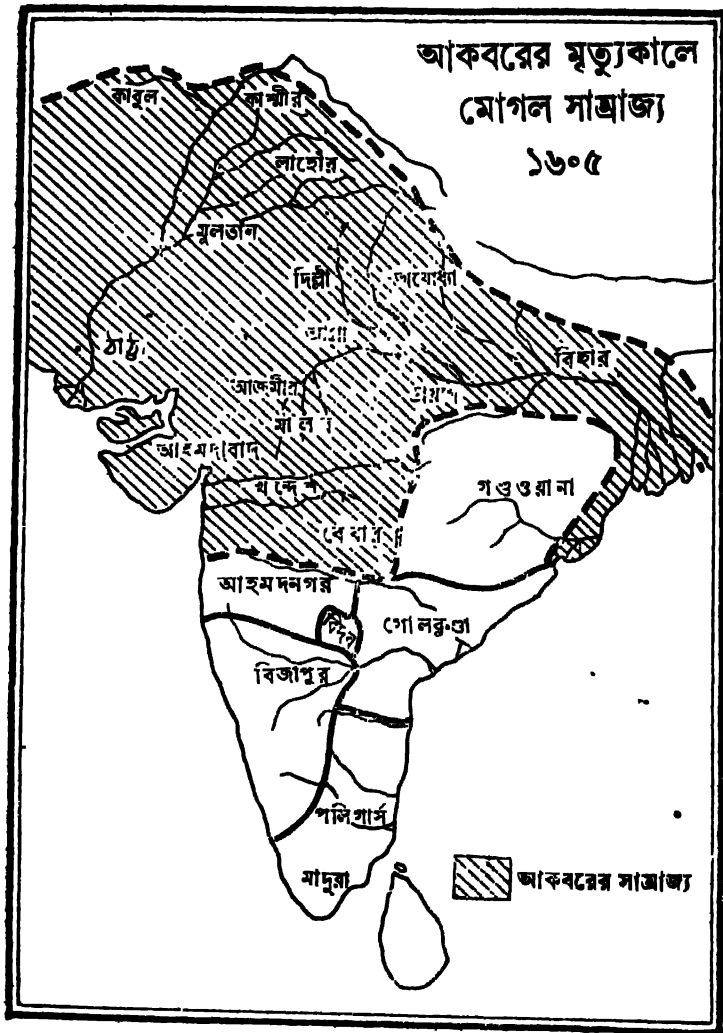
হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মে সহযোগিতার প্রয়োজন, আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুতদের সহিত তাঁহার মৈত্রী-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজশক্তির সহযোগিতা লাভ করা। মানসিংহ, তোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারীদের তিনি শুধু যে যোগ্য রাজমর্যাদা

দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের উপর যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস্য মনে হয়। পূর্বে পাঠান সুলতানদের আমলে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল না। আমলাতন্ত্রের নিম্নস্তরে হিন্দুর সংখ্যা বরাবরই বেশী ছিল, হিন্দু আমলরাই সেখানে আধিপত্য করিতেন। মুসলমানদের দিয়া তখন সাধারণ স্তরের কাজকর্ম (রাজস্ব ও অন্যান্য বিভাগের) চালানোও সম্ভব ছিল না। আকবরের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি একপুরুষের মধ্যে মোগল রাষ্ট্রকে বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে একটি "জাতীয় রাষ্ট্রে" পরিণত করিয়াছিল।

আকবরের চরিত্র ও প্রতিভা

আকবর কেবল রাজপদের মর্যাদা দিয়াই হিন্দুদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। অম্বর-রাজ বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর হইতে করের বোঝা তুলিয়া দিয়া তিনি কুখ্যাত জিজিয়া কর (poll tax) আরোপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন (১৫৬২-৬৩)। তীর্থযাত্রীদের উপর 'কর' তুলিয়া দেওয়ার আদেশ তিনি অন্যতম হিন্দুতীর্থ মথুরা হইতেই জারী করিয়াছিলেন। এই আদেশ জারী করার সময় বারাণসী, হরিদ্বার, গয়া, আজমীর প্রভৃতি তীর্থস্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। অনমনীয় চরিত্র, অদম্য সৎসাহস, অসাধারণ উদারতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে কোন দেশের কোন ধর্মাবলম্বী সম্রাটের পক্ষে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করা যে সম্ভব নহে তাহা বলাই বাহুল্য। বার্তোলি (Bartioli) বলিয়াছেন যে, "He was great with the great, lowly with the lowly." তাঁহার জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল অদম্য, বিষয়বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। কামান গোলা-বারুদের যান্ত্রিক বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য, কাব্য, জীবনদর্শন, ধর্ম প্রভৃতি অযান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল গভীর ও আন্তরিক। উদার মনোভাব লইয়া সর্ববিষয়ে আলোচনা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। কোন বিষয়ে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মতামত, উভয়ের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার পোষকতায় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

আকবরের ধর্মমত

আকবরের রাষ্ট্রনীতির মতো আকবরের ধর্মনীতিও অসাম্প্রদায়িক জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল। যদিও আজীবন তিনি ইসলামধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার ধর্মচিন্তা এই ব্যক্তিগত আচরণের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক উর্ধ্বে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের জন্য দিগন্তে পক্ষ বিস্তার করিয়াছিল। ফতেপুর-সিক্রীতে ধর্মালোচনার জন্য তিনি একটি 'ইবাদৎখানা' বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান উলামারা, বৌদ্ধ জৈন হিন্দু পার্সী খ্রীষ্টান ইহুদী প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী আচার্য ও সাধুরা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনার জন্য মিলিত হইতেন। ইবাদৎখানার পশ্চাদ্‌পটে বেদ গীতা রামায়ণ মহাভারত কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বাণী ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা ছিল। ইবাদতখানার মুক্ত পরিবেশে আচরিত সকল ধর্মের মূলগত ঐক্যের সন্ধান করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

আকবরের পূর্বেই অবশ্য ইসলামের সংঘাতে ভারতের ধর্মচিন্তার বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। রামানন্দ কবীর দাদূ নানক শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকদের আন্তরিক ভক্তিবাদ ও সমন্বয়বাদ, মুসলমান সাধকদের সুফিবাদ আকবরের চিন্তাধারাকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সুফি সাধকদের মধ্যে তখন "ওয়াহদৎ-উল-উজুদ" বা 'জীবের একাত্মতার' আদর্শ অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। আকবর নিজে যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা **দীন-ই ইলাহী** নামে পরিচিত। এই দীন-ই ইলাহী ধর্মমত সুফীদের প্রবর্তিত 'ওয়াহদৎ-উল-উজুদ বা জীবের একাত্মতা ও সর্বজীবে সমভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই ধর্ম-মতের সমর্থকরা নিজেদের 'ইলাহীয়া' বলিয়া পরিচয় দিতেন।

আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের জন্য রাষ্ট্রনীতির তিনটি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন—(১) জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ, (২) হিন্দুদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শ এবং (৩) ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ। এই তিনটি নীতি ও আদর্শের মাপকাঠিতে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রথম দুইটি নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান, আন্তরিকভাবে না হইলেও অন্তত বাহ্যত, পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজীব ইচ্ছা করিয়া

প্রত্যেকটি নীতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল পরে ঔরঙ্গজীব প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিব।

জাহাঙ্গীর ১৬০৫-২৭

আকবরের মৃত্যুর পর (১৭ অক্টোবর, ১৬০৫) তাঁহার পুত্র সলিম 'জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজা হন। আকবরের অন্য দুই পুত্র দানিয়াল ও মুরাদের আগেই মৃত্যু হইয়াছিল, সলিম ছিলেন একমাত্র জীবিত বংশধর। ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে বা কৃতিত্বে কোনদিকেই তিনি পিতার যোগ্য সন্তান ও উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য তাঁহার জীবনে বেগম নূরজাহানের প্রভাবও ছিল গভীর। এই প্রভাব রাজনীতিক্ষেত্রে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান

নূরজাহানের ('নূর' = আলো, 'জাহান' = পৃথিবী, পৃথিবীর আলো) নাম ছিল 'মেহেরুন্নিসা'। তিনি ছিলেন পারসীবংশজাত। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করেন। অসাধারণ রূপসী নূরজাহান, পাঠান সর্দার শের আফগান হইতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনে পর্যন্ত প্রবল ঝড় তুলিয়াছিলেন। কত কাহিনী ও কিংবদন্তী যে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। কেবল রূপ নয়, নূরজাহানের গুণও ছিল অসাধারণ। বুদ্ধির জ্যোতিতে তাঁহার অসামান্য রূপ চারিদিকে জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করিত এবং সেই জাদুস্পর্শে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত অবশ ও অক্ষম হইয়া গিয়াছিলেন। অন্তঃপুর হইতে দরবার পর্যন্ত নূরজাহান স্বচ্ছন্দে তাঁহার জাদুজাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় রাজশক্তি স্বভাবতঃই নূরজাহান দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পর্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রচারিত মুদ্রার একপিঠে খোদাই করিয়া দেওয়া হইল—"সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রচারিত এই মুদ্রায় সম্রাজ্ঞী বেগম নূরজাহানের নাম সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইহার স্বর্ণজ্যোতি শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।" নূরজাহানের পিতা ইতমদ্‌উদ্দৌলা, ভাই আসফ্ খাঁ ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল হইলেন। আসফের কন্যা, নূরজাহানের ভাইঝি মমতাজের সহিত যুবরাজ খুররমের বিবাহ দেওয়া হইল (১৬১২)। সবদিক দিয়া মোগল দরবারের পারসীকরণ (Persianisation) সম্পূর্ণ হইল নূরজাহানের প্রভাবে। কিন্তু ইতমদ্‌উদ্দৌলার মৃত্যুর পর (১৬২২) বিরোধ

বাধিল শাহজাহানর সহিত নূরজাহানের। শের আফগান ও নূরজাহানের কন্যা লাদিলা খাঁর সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার বিবাহ দেওয়া হইল। নূরজাহান চেষ্টা করিতে লাগিলেন শাহজাহানের বদলে শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিতে।

বিদ্রোহী শাহজাহান বিলোচপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (মার্চ ১৬২৩)। মাণ্ডু হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন, পারভেজ ও মহবৎ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া শাহজাহানের এই বিদ্রোহের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের খুবই অনিষ্ট হয়। অবশেষে জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের বিরোধ মিটিয়া যায়, পারভেজের মৃত্যু হয় (১৬২৬) এবং জাহাঙ্গীরও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (অক্টোবর ১৬২৭)। দাক্ষিণাত্য হইতে শাহজাহান তাঁহার রাজসিংহাসনের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

শাহজাহান ১৬২৭-৫৮

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রায় চারমাস পরে শাহজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (ফেব্রুয়ারি ১৬২৮)। সিংহাসনে বসিয়া রাজবংশের পুরুষ উত্তরাধিকারীদের নির্মূল করিবার আদেশ দেন। অভিষেককালে তাঁহার এই নির্মম নিষ্ঠুরতার ফলস্বরূপ শেষজীবনে তাঁহাকেও পুত্র ঔরঙ্গজীবের কাছে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বাংলাদেশে হুগলী দখল ১৬৩২॥ ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে ঘাঁটি করিয়া বসে। 'হুগলী' ছিল তাহাদের প্রধান ঘাঁটি। ক্রমে হুগলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে। পর্তুগীজরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর বেশী শুল্ক ও কর আদায় করিয়া জোরজুলুম করিতে থাকে এবং বালকদের ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া খ্রীষ্টান করিতে আরম্ভ করে। বাংলার সুবাদার কাশিম আলি খাঁ, শাহজাহানের আদেশে, হুগলী অবরোধ করিয়া দখল করেন। বহু পর্তুগীজ যুদ্ধে নিহত হয় এবং দলে দলে তাহাদের বন্দী করিয়া আগ্রায় পাঠানো হয়।

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি॥ পিতা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর অভিযানে কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি 'শাহজাহান' উপাধি পাইয়াছিলেন (১৬১৭)। তারপর দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের বিরুদ্ধে একাধিক

অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য এবং দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্য শাহজাহানের রাজত্ব-কালে স্বভাবতঃই দাক্ষিণাত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে :

প্রথম পর্ব ১৬৩৩। আহম্মদনগরের নিজাম শাহী সুলতানদের পতন।

দ্বিতীয় পর্ব ১৬৩৪-৩৬। বিজাপুরের আদিল শাহী ও গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী সুলতানদের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়া মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় পর্ব ১৬৩৬-৪৪ এবং ১৬৫২-৫৭। দাক্ষিণাত্যে পুত্র ঔরঙ্গজীবের শাসন ও সুবাদারী, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের যুদ্ধ।

প্রথম পর্ব। শাহজাহানও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি আহম্মদনগর আক্রমণ করা স্থির করেন। বিদ্রোহী মারাঠা নায়কদের সহিত সহযোগিতা করিয়া তিনি মোগলদের শক্তি দৃঢ় করেন। খান জাহানের বিদ্রোহ দমন করা হয়, মহবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক নিযুক্ত হন। রাজধানী দৌলতাবাদ দখল করিয়া হুসেন শাহকেও বন্দী করা হয় (১৬৩৩)। নিজাম শাহী সুলতানদের শেষ প্রদীপ নিভিয়া যায়, আহম্মদনগরে শাহী রাজত্বের অবসানের পর মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্ব। নিজাম শাহীবংশের পতনের সুযোগ লইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানরা আহম্মদনগর রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। শিবাজীর পিতা শাহজী একজন নিজাম শাহী রাজা দাড় করাইয়া তাঁহার নামে একাংশ গ্রাস করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। বিজাপুরের আদিল শাহ তাঁহাকে উৎসাহ দেন। নিজাম শাহীদের পারেন্দা দুর্গ বিজাপুরের হস্তগত হয়। মহবৎ খাঁ তাহা পুনরায় দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ব্যর্থতার জন্য শাহজাহানের কাছে তিরস্কৃত হইয়া মনোকষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৩৪)। শাহজাহান নিরুপায় হইয়া নিজে দাক্ষিণাত্যে আসেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৩৬)। তিনটি মোগলবাহিনী (প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণে নিযুক্ত করা হয়, আর একটি সেনাদল (প্রায় ৮ হাজার) জুন্নার, পুনা, কোঙ্কন প্রভৃতি শাহজী-শাসিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়। গোলকুণ্ডার আবদুল্লা কুতুব শাহ প্রতিরোধে অক্ষম হইয়া আত্মসমর্পণ করেন এবং আটলক্ষ টাকা বাৎসরিক রাজকর দিবার

অঙ্গীকারে মোগল কর্তৃত্ব মানিয়া লন। বিজাপুরের সুলতান প্রতিরোধ করেন। মোগল সৈন্যরা তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করে। বাকি অংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বিজাপুরীদের সাহায্যে মোগল সৈন্যরা শাহজীকে ঘিরিয়া ফেলে এবং উত্তর-কোঙ্কনে মাহুলিতে তিনি ধরা দিতে বাধ্য হন। সমস্ত দুর্গ ও রাজ্যাংশ তিনি মোগলদের ছাড়িয়া দেন এবং বিজাপুরের অধীনে পুনা জেলায় একটি ছোট জায়গীর লইয়া সন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় পর্ব। দাক্ষিণাত্যের সমস্যা সমাধান করিয়া শাহজাহান রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব হইলেন দাক্ষিণাত্যের শাসক। কিন্তু কেবল রাজ্যশাসন করিয়া ঔরঙ্গজীবের ক্ষুধা মিটিতেছিল না। তিনি একটা কিছু করিতে চাহিতেছিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অস্তিত্ব তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না। দুইটি রাজ্যের অফুরন্ত ধনসম্পদও তাঁহার কাছে লোভনীয় ছিল। গোলকুণ্ডা (রাজধানী হায়দারাবাদ) পৃথিবীর হীরা ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র এবং তাহার শাসক কুতুব শাহ পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি হইলেও দুর্বল ও অপদার্থ। বিজাপুরের শাসক মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৫-৫৬) পশ্চিমে আরবসাগর হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উপদ্বীপান্তর্গত রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আঠার বছরের যুবক (১৬৫৬) দ্বিতীয় আদিল শাহের শাসনকালে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঔরঙ্গজীব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণ দখল করিবার জন্য প্রলুব্ধ হন। তারপর বিখ্যাত মীর জুমলার ব্যাপার লইয়া বিরোধ চরমে পৌঁছায় এবং যুদ্ধ বাধে (১৬৫৬)।

মীর জুমলা। মীর জুমলার আসল নাম মহম্মদ সৈয়দ, 'মীর জুমলা' তাঁহার গোলকুণ্ডা রাজ্যের উপাধি। পারস্যের সৈয়দবংশের সন্তান ইস্পাহানের তৈলব্যবসায়ীর পুত্র, শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মহম্মদ সৈয়দ গোলকুণ্ডায় পৈতৃক ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধানে আসিয়া ক্রমে ঘটনাচক্রে কুতুব শাহীদের প্রধানমন্ত্রী হন। কর্ণাটকের কুতুব শাহীদের রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া তিনি এক বিস্তৃত রাজ্যের হর্তাকর্তা হইয়া বসিয়াছিলেন, গোলকুণ্ডার সুলতানকে বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার শক্তির উৎস ছিল একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, প্রধানত গোলন্দাজ-বাহিনী এবং গোলন্দাজরা ছিল ইউরোপীয়। এই ইউরোপীয় গোলন্দাজদের কামানের গোলার মুখে সহজে শত্রুরা কেহ দাঁড়াইতে

পারিত না। কুতুব শাহের সহিত প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলার বিরোধ স্বভাবতঃই বাধিল, সুলতান তাঁহার পুত্র মহম্মদ আমিনকে উদ্ধত আচরণের জন্য কারাগারে বন্দী করিলেন (নভেম্বর ১৬৫৫)। ঔরঙ্গজীবের সুযোগ আসিল। মীর জুমলাও মোগলদের সহিত বন্ধুত্ব করার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শাহজাহান গোলকুণ্ডা আক্রমণেরও অনুমতি দিলেন পুত্রকে। এই অনুমতিই ঔরঙ্গজীবের পক্ষে যথেষ্ট, তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৫৬)।

কুতুব শাহের প্রতিনিধি দিল্লীতে আসিয়া শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোর মধ্যস্থতায় সন্ধির সম্মতি লাভ করেন। তৎক্ষণাৎ অবরোধ তুলিয়া গোলকুণ্ডার সহিত শান্তি স্থাপনের আদেশ দেওয়া হয় এবং আদেশ অনুসারে শান্তিও স্থাপিত হয় (মার্চ ১৬৫৬)। মীর জুমলাকে দিল্লীতে তলব করিয়া আনিয়া পরলোকগত সাদুল্লা খাঁর পদবীতে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়। গোলকুণ্ডার সহিত শান্তি স্থাপিত হইলেও একটি অশান্তির বীজ শেষ পর্যন্ত রহিয়া যায়। কুতুবশাহ কর্ণাটকের অংশটুকু নিজের রাজ্য মনে করিতেন, আর মোগলরা মনে করিতেন উহা মীর জুমলার জায়গীর। মোগল-কুতুব শাহী বিরোধের এই বীজটুকু রহিয়া যায়।

মীর জুমলা দিল্লীর প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিবার পর বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ বাধিল। শাহজাহান বিজাপুর আক্রমণে সম্মতি দেন এবং তৎপর ঔরঙ্গজীব বিলম্ব না করিয়া তাহাই করেন (১৬৫৭)। বিদর ও কল্যাণীর পতনের পর বিজাপুরের পথ বাধাবন্ধনহীন হইয়া যায়। দারা শুকোর মধ্যস্থতায় বিজাপুরের সুলতানও, গোলকুণ্ডার মতো, সম্রাটের কাছ হইতে শান্তি স্থাপনের সম্মতি আদায় করেন। কিছুদিনের মধ্যে শাহজাহান পীড়িত হন, মোগল রাজ্যে গোলযোগ আসন্ন মনে করিয়া বিজাপুরীরা দুর্গ সমর্পণ করিতে রাজী হন না। বিরোধের বীজ বিজাপুরেও থাকিয়া যায়। বিরোধের বীজ থাকিয়া গেলেও শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি যে সফল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে নিজাম শাহী, কুতুব শাহী ও আদিল শাহী বংশের সুলতানদের রাজত্ব ও প্রভুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করিয়া শাহজাহান নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সংগ্রামে তাঁহার দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা দুই-ই প্রকাশ পাইয়াছে। এই দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-পরিচালনায় সাফল্যের জন্য তিনি তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরের

কাছ হইতে 'শাহজাহান' উপাধি পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর যে যোগ্য বংশধরকেই এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শাহজাহান তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

মধ্যএসিয়া নীতি

মোগলদের অভ্যুত্থানের আদিকালের স্মৃতি মধ্যএসিয়ার সহিত জড়িত বলিয়া ভাবতের মোগল সম্রাটরা তাহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য-সীমানা বিস্তারের কল্পনা করিতেন। বল্‌খ ও বাদকশান বাবরের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য এবং তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দও বাবরের প্রথম জীবনের উত্থান-পতনের সহিত জড়িত বলিয়া তাহার উপর অন্য কাহারও কর্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই, একথা মোগল সম্রাটরা মনে করিতেন। শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হইলেন তখন মধ্য-এসিয়ার কথাও তাঁহার মনে পড়িল। বল্‌খ-বাদকশানের শাসক ছিলেন তখন নজর মহম্মদ। তিনি আদৌ কৃতি শাসক ছিলেন না। তাঁহার পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অসহায় বোধ করিয়া নজর মহম্মদ মোগল সম্রাট শাহ-জাহানের সাহায্য ভিক্ষা করেন। রাজকুমার মুরাদের অধীনে মোগল সৈন্যরা অভিযান করে (১৬৪৬) এবং বল্‌খ ও বাদকশান দখল করে। নজর

জাহাঙ্গীরের মুদ্রা

ইস্পাহানে গা-ঢাকা দেন। মুরাদ মধ্যএসিয়ার পরিবেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসেন, ঔরঙ্গজীব খান আলি মর্দনকে সঙ্গে লইয়া। নজরের পুত্র আজিজ বিরোধিতা তো করেনই, দুর্ধর্ষ উজবেকরা অক্ষুনদী পার হইয়া আসিয়া মোগলদের উত্যক্ত করিতে থাকে। অবশেষে শাহজাহান বল্‌খ-বাদকশান জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন।

এই অভিযানের জন্য প্রায় চারকোটি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু মোগলদের পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মধ্যএসিয়ার একইঞ্চি জমিও লাভ হয় না। শাহজাহানের মধ্যএসিয়ানীতি ব্যর্থ হয়।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত নীতি॥ উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ভারত ও পারস্যের পথের উপর কান্দাহারের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। জাহাঙ্গীরের সময় এই কান্দাহারের জন্যই পারস্যের শাহ ভারতের সহিত দূত-বিনিময়ের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কান্দাহার দখলও করিয়াছিলেন পারস্যের শাহ। কান্দাহারের উপর মোগলদের মর্যাদা নির্ভর করিত, কিছুতেই তাহা ছাড়া যায় না। সাদুল্লা খাঁকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে ঔরঙ্গজীব কান্দাহারে যুদ্ধযাত্রা করেন, (মে ১৬৪৯), কিন্তু যাত্রা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। দ্বিতীয়বার ঔরঙ্গজীব আবার সাদুল্লার সহিত অভিযান করেন (১৬৫২), কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। কান্দাহারে তৃতীয় অভিযানের নেতা হন দারা শুকো (এপ্রিল ১৬৫৩)। প্রথমে তিনি কিছুটা সফল হন, কিন্তু পরে তাঁহাকেও ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হয়। কান্দাহারের যুদ্ধে মোগলদের বারংবার ব্যর্থতার কারণ পারসীদের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র ও রণ-কৌশল। কান্দাহার যুদ্ধে ভারত সম্রাটের প্রায় দশকোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং তাহার ফলে লাভ হয় নাই কিছু, শুধু মোগলদের মর্যাদা ও গৌরব ম্লান হইয়াছিল পারস্যের কাছে।

মোগল-সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিকাশ॥ কোন সম্রাটের রাজনীতির ইতিহাস কেবল নিরবচ্ছিন্ন গৌরবময় সাফল্যের ও কৃতিত্বের ইতিহাস নহে। সম্রাট শাহজাহানও সেইরকম কৃতিত্ব ও গৌরব দাবী করিতে পারেন না। তাঁহার সাম্রাজ্যনীতি যেমন সফলতায় ও সার্থকতায় গৌরবান্বিত, তেমনি ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার জয় হইয়াছে, কিন্তু মধ্যএসিয়ায় ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তে তাঁহাকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও, ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, "his reign marks the climax of the Mughal dynasty and empire."

শাহজাহানের শিল্পানুরাগ

বাদশাহ শাহজাহানের ঐশ্বর্যবিলাস, স্থাপত্যপ্রীতি, প্রাসাদ-দুর্গ, বিশেষ করিয়া তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করিয়া দিয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, "The brightest feature in his character as a man is

his intense love for Mumtaz Mahall"—মমতাজের প্রতি গভীর অনুরাগই তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তিনি হীরা মণিমুক্তার ময়ূর সিংহাসন গড়িয়াছিলেন, দিল্লীর লাল কেল্লা, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস নির্মাণের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তাজ-মহলের মতো একটি সমাধি গড়িয়াছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী কবিদের তিনি পোষকতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁহার বৃত্তি ভোগ করিতেন, কবি সুন্দর দাস 'মহাকবি' উপাধিতে ভূষিত হন, কবি চিন্তামন তাঁহার অন্তরঙ্গ ও প্রিয় হইয়া ওঠেন। গোঁড়া মুসলমান হইয়াও হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বসন্ত পঞ্চমী হোলি, দশহরা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের অনুষ্ঠান দরবারে বন্ধ করেন নাই। ক্যাম্বে অঞ্চলে তিনি গোহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় হিন্দুদের কাছে পবিত্র ময়ূর বধ করাও তাঁহার আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি পিতামহ আকবরের আদর্শ হইতে এইদিক দিয়া অন্তত বিচ্যুত হন নাই।

উত্তরাধিকারের সংগ্রাম ১৬৫৭-৬০॥ সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম হিন্দুযুগে ও মুসলমানযুগে অনেক হইয়াছে। পাঠান সুলতান ও মোগল বাদশাহদের আমলে এই সংগ্রাম মধ্যে মধ্যে খুবই তীব্র হইয়াছে। কিন্তু শাহজাহান হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে (৬ সেপ্টেম্বর ১৬৫৭) তাঁহার সিংহাসন লইয়া চার পুত্র যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সেরকম দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। চার পুত্র চারটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দারা ছিলেন এলাহাবাদ, পাঞ্জাব ও মুলতানের শাসক এবং ৪ হাজার অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ। কিন্তু পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে। দ্বিতীয় পুত্র শুজা ১৬ বছর বাংলাদেশের শাসক ছিলেন, কিন্তু কর্মবিমুখতা ও আলস্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীবের চরিত্র ছিল ঠিক ইহার বিপরীত, যেমন তীক্ষবুদ্ধি, তেমনি স্থিরধীর ও হিসেবী। শাহজাহানের পারিষদরা জানিতেন যে এই তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হইবেন। চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক। কোনদিক দিয়া তিনি ঔরঙ্গজীবের সমকক্ষ ছিলেন না। শাহজাহানের

অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া প্রথমে তিন ভাই জ্যেষ্ঠ দারার বিরুদ্ধে হাত মিলাইলেন।

অন্তর্বিরোধের প্রথম বিস্ফোরণ হইল বারাণসীর কাছে বাহাদুরপুরে (ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৬৫৮)। এখানে দারার সৈন্যদের কাছে শুজা পরাজিত হন। দারার পুত্র সুলেমান শিকো ও অম্বরের রাজা জয়সিংহ মোগলসৈন্যের পরিচালক। মুরাদ ও ঔরঙ্গজীবের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য মোগলসৈন্য পাঠানো হয় যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খাঁর নেতৃত্বে। উজ্জয়িনীর কাছে ধর্মাটে রাজসেনার সহিত বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হয় (১৫ এপ্রিল ১৬৫৮)। ঔরঙ্গজীব যুদ্ধে জয়ী হন। দারার মর্যাদা ও সিংহাসনের আশা ধর্মাটের প্রথম আঘাতেই প্রায় ধূলিসাৎ হইয়া যায়। আগ্রার কাছে সামুগড়ের প্রান্তরে হয় পরবর্তী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দারা নিজে প্রায় ৫ হাজার সৈন্যসহ ঔরঙ্গজীব-মুরাদের সম্মুখীন হইলেন (২৯ মে ১৬৫৮)। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। ঔরঙ্গজীবের জয় হইল। বোধ হয় এরকম জয় আর কোন যুদ্ধে তাঁহার হয় নাই। সামুগড়ের যুদ্ধে উত্তরাধিকারের সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছিল বলা চলে।

বাকি যাহা ছিল তাহা গল্পের মতো বলা যায়। দারা পাঞ্জাবে পলাতক হইলেন, ঔরঙ্গজীব আগ্রায় প্রবেশ করিলেন; হতভাগ্য শাহজাহানের করুণ কারাজীবন আরম্ভ হইল (জুন ১৬৫৮)। জুন মাসেই মুরাদ বন্দী হইলেন, অবশেষে মুরাদের ধড় হইতে মুণ্ডটিকেও বিচ্ছিন্ন করা হইল। ঔরঙ্গজীব খাজুয়ার যুদ্ধে (এলাহাবাদের কাছে) শুজাকে পরাজিত করিলেন (৫ জানুয়ারি ১৬৫৯)। পলাতক দারাকে ঔরঙ্গজীবের হাতে সমর্পণ করা হয়। দারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (৩০ আগস্ট ১৬৫৯), এবং প্রিয়পুত্র দারার ছিন্নমুণ্ড কারাবন্দী শাহজাহানের কাছে পাঠানো হয়। ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ গোপনে শুজার সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন বলিয়া বাকী জীবন তাঁহাকে কারাগারে কাটাইতে হয়। আগ্রার শাহবুরুজ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় ভারত-সম্রাট শাহজাহান ১৬৬৬ সনের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর আগেই ঔরঙ্গজীব 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ-সিংহাসনে দুইবার অভিষিক্ত হন।)

QUESTIONS

1. "Akbar was a strong and stout anexationist', Discuss the statement critically with reference to the expansion of the Mughal Empire under Akbar.
2. Akbar's policy towards the Hindus "converted the Mughal Empire in one generation from a foreign government into a national state" Discuss the statement critically.
3. Give a brief account of Akbar's religious policy.
4. Why Akbar was called 'the Great Mughal'? Give an estimate of Akbar's character and personality.
5. How far Nur Jahan exercised her influence over Jahangir's administration ?
6. Give a brief account of Saha Jahan's career and achievements as an Emperor.
7. "Shah Jahan's reign marks the climax of the Mughal dynasty and empire." Discuss the statement critically,
8. Give a comparative estimate of the Deccan policy of Akbar and Shah Jahan.
9. Give a short account of the War of Succession during Shah Jahan's reign.
10. Write notes on :
    (a) Malik Ambar
    (b) Din-i-Ilahi
    (c) Second Battle of Panipat, 1556

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঔরঙ্গজীব। শিবাজী

শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই ঔরঙ্গজীবের দুইবার রাজ্যাভিষেক হয় (জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯)। শাহজাহানের মৃত্যুর পর তৃতীয়বার ঔরঙ্গজীব মহাসমারোহে আগ্রার দুর্গে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (মার্চ ১৬৬৬)। তিনবার অভিষেক কোন মোগল সম্রাটের হয় নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজীব যে মোগল সম্রাটদের মধ্যে বহু দিক হইতে অদ্বিতীয় হইবেন, একাধিক অভিষেক হইতে তাহারই আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

ঔরঙ্গজীবের রাজত্ব

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালকে মোটামুটি দুইটি পর্বে ভাগ করা যায়। দুইটি পর্বই সময়ের দিক দিয়া ২৪-২৫ বছর করিয়া প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্বের (১৬৫৮-৮১) রাজনৈতিক কার্যকলাপ উত্তরভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তরপূর্ব সীমান্ত, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও রাজপুতানা ছিল এই পর্বে মোগলদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। দক্ষিণভারতের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। সেই সুযোগে দক্ষিণভারতের ইতিহাসে মারাঠা বীর শিবাজী এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল মারাঠাদের মধ্যে নয়, সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁহার নবজাগরণের শঙ্খধ্বনিতে নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব তখন উত্তরভারতের রাজনৈতিক আবর্তে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। পরে যখন দক্ষিণভারতের দিকে তিনি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইলেন তখন ইতিহাসের ধারা মোগলযুগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নূতন খাতে বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। জীবনের শেষ পঁচিশটি বছর তিনি যথাসর্বস্ব পণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ধারা নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

CHAPTER XXII: (1) Aurangzeb—his orthodoxy—Hindu reaction—Satnami rebellion. Sikhs, Rajput.

(2) Bijapur, Golconda, Marathas. Shivaji—his conquests and administration, birth of a Nation.

কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ব্যর্থতার স্তূপের মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই তিনি তাঁহার জীবনাদর্শ ও রাষ্ট্রনীতির সহিত সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজীব নিজেকে ইসলামধর্মের আদর্শ সেবক বলিয়া মনে করিতেন এবং রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। সেইজন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলামধর্মবিরুদ্ধ।

সম্রাট হইবার আগে ঔরঙ্গজীব যখন গুজরাটের শাসক ছিলেন (১৬৪৪) তখন আমেদাবাদের চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করিয়া তিনি সাড়ম্বরে তাহা মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গুজরাটে আরও বহু হিন্দু দেবালয় তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তারপর আরও একটি আদেশ জারী করিয়া তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল-চতুষ্পাঠি দেবদেউল ধ্বংস করিতে বলেন। সেই আদেশ অনুসারে হিন্দুদের বড় বড় তীর্থস্থানে বিখ্যাত সব মন্দির ধ্বংস করা হয়—যেমন সোমনাথের মন্দির, বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশব রায়ের মন্দির ইত্যাদি। মুসলমানরাষ্ট্রে হিন্দুদের বাস করিতে দেওয়া হইতেছে বলিয়া মুসলমান সম্রাটরা হিন্দুদের মাথাপিছু 'জিজিয়া কর' দিতে বাধ্য করিতেন। ক্রীতদাস, নারী ও চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের 'কর' দিতে হইত না। বাৎসরিক গড়পড়তা আয়ভেদে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিনভাগে হিন্দু জনসাধারণকে ভাগ করিয়া 'কর' নির্ধারণ করা হইত। ভারতবর্ষ যাহাদের চিরকালের মাতৃভূমি সেই হিন্দুদের পরদেশবাসীর মতো অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা জিজিয়া-কর দিতে হইত এদেশে বাস করিবার জন্য। ইতিহাস এতবড় নিষ্ঠুর পরিহাস কখনও সহ্য করে না। মুসলমানযুগের এই কলঙ্ক আকবর দূর করিয়াছিলেন (১৫৬৪), জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আকবরের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ না মানিলেও এই নীতি অমান্য করেন নাই, কিন্তু ঔরঙ্গজীব করিয়াছিলেন। নূতন করিয়া জিজিয়া প্রবর্তনের পর দিল্লীর বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনতা সম্রাটের কাছে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাতে বিচলিত হন নাই। উপরন্তু তিনি জনতার উপর দিয়া হাতী চালাইয়া তাহাদের পদদলিত করিয়া পিষিয়া মারিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

কেবল জিজিয়া-কর নহে, অন্যান্য উপায়েও তিনি হিন্দুদের উপর অর্থনীতিক অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহার আমলে প্রথমে হিন্দু ব্যবসায়ীদের মুসলমানদের অপেক্ষা দ্বিগুণ পণ্যদ্রব্যের মাশুল (duty) দিতে হইত। ফরমান জারী করিয়া (১০ এপ্রিল ১৬৬৫) তিনি হিন্দু বণিকদের পণ্যদ্রব্যের মাশুলের হার ৫% এবং মুসলমানদের তাহার অর্ধেক করিয়াছিলেন। পরে আর-একটি ফরমান জারী করিয়া (৯ মে ১৬৬৭) তিনি মুসলমান বণিকদের মাশুলের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়া হিন্দু বণিকদের হার আগের মতোই রাখিয়াছিলেন। এইভাবে হিন্দুদের উপর অর্থনীতিক চাপ দেওয়া হইয়াছে ধর্মান্তরিত করার জন্য।

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান। সৎনামী-বিদ্রোহ

হিন্দুদের উপর পীড়ন ও নির্যাতন এইভাবে যখন সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখন হিন্দুদের ধৈর্য ও সহ্যের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারত জুড়িয়া হিন্দুরা মরিয়া হইয়া বাদশাহের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্রোহ আরম্ভ হইল বিচ্ছিন্ন আকারে। আগ্রা ও দিল্লীর মধ্যে পড়িয়া মথুরাকে হিন্দু বিদ্বেষের অত্যাচার ও আঘাত সর্বাপেক্ষা বেশী সহ্য করিতে হইয়াছে। মথুরার জাঠ কৃষকেরা প্রথমে বিদ্রোহ করিল ১৬৬৯ সনে। তিলপতের গোকুলা হইলেন তাহাদের নেতা। মথুরার ফৌজদার বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হন। বিজয়ী গোকুলা সাদাবাদ পরগণা লুট করেন, আগ্রা জেলাতেও বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। ঔরঙ্গজীব আরও দক্ষ সেনাপতির অধীনে সুসজ্জিত বাছাই সৈন্য প্রেরণ করেন বিদ্রোহ দমনের জন্য। মোগলদের সহিত বিদ্রোহী হিন্দু কৃষকদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, কিন্তু শত্রুর কামানের গোলার মুখে বিদ্রোহীরা দাঁড়াইতে পারে না।

দিল্লী হইতে প্রায় ৮৫ মাইল দূরে নারনোল জেলায় **সৎনামী সম্প্রদায়ের** প্রধান ঘাঁটি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৫৪৩) বীরভান এই সম্প্রদায় গঠন করেন। সৎনামীরা একটি হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়, লোকে তাঁহাদের 'মুণ্ডিয়া' বলিত। তাঁহারা মাথা মুণ্ডন, গোঁফদাড়ি ও ভ্রূ পর্যন্ত মুণ্ডন করিতেন বলিয়া 'মুণ্ডিয়া' নামে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ফকিরের মতো পোশাক পরিতেন, কিন্তু চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্যও করিতেন। একটি

ছোট ঘটনা হইতে সৎনামীদের অন্তরের চাপা আগুন প্রকাণ্ড বিদ্রোহের ভয়াবহ মূর্তিতে জ্বলিয়া ওঠে। একজন পিয়াদার সহিত একদিন একজন সৎনামী চাষীর বচসা হইতে পিয়াদার মাথায় ডাণ্ডা মারিয়া চাষীটি তাহাকে মারিয়া ফেলে। স্থানীয় শিকদার কয়েকজন পিয়াদা পাঠাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে সৎনামী কৃষকরা দলবদ্ধ হইয়া বাধা দেয় এবং পিয়াদাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া নেয়। তারপর বিবাদ ধর্মবিরোধে পরিণত হয়। বাদশাহের হিন্দুনির্যাতন নীতিতে বিক্ষুব্ধ সৎনামীরা একডাকে রাজবিদ্রোহের জন্য জীবনপণ করিয়া দাঁড়ায়।

শিখ ও রাজপুতদের বিদ্রোহ

শিখরা গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮) নূতন ধর্মমন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং নানকের পরে তাহাদের ধর্মচেতনা দ্রুত জাতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হইতেছিল। নূতন ধর্মগুরু ক্রমে জাতীয় গুরু হইয়া উঠিতেছিলেন। ঔরঙ্গজীবের আমলে মোগল-শিখ সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তন হয়। জাহাঙ্গীর বা শাহজাহান কেহ শিখদের উপর ধর্মগত কারণে অত্যাচার করেন নাই, শিখগুরুদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য তাঁহাদের শাস্তি দিয়াছেন এবং তাহার ফলে বিরোধ হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন, "Before the reign of Aurangzeb the Sikhs were never persecuted on religious grounds." ঔরঙ্গজীব শিখধর্মের মধ্যে হিন্দুদের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত পাইয়া তাহা ধ্বংস করিতে উদ্‌যোগী হন। নবম গুরু হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুরকে ঔরঙ্গজীব রাজধানীতে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করেন (১৬৭৫)। এই ঘটনায় শিখরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া মোগলদের ঘোর শত্রু হইয়া ওঠে। তাহারা একটি সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। তেগ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র গোবিন্দসিংহ দশম ও শেষ শিখগুরু হন (১৬৭৬-১৭০৮)। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। গুরুগোবিন্দ শিখদের নূতনরূপে সংগঠিত করেন। তিনি **খাল্‌সা** প্রতিষ্ঠা করেন। শিখ 'সিংহ'দের ধর্মসংঘ খাল্‌সা। খাল্‌সাভুক্ত হইতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, দীক্ষিত হইলে সিংহ বলা হইবে। সিংহের মতো দুর্জয় সাহসী ও শত্রুর প্রতি হিংস্র হইতে হইবে

প্রত্যেক দীক্ষিত শিখকে। মাথায় কেশ ও মুখে দাড়ি রাখিয়া ছোরা বহন করিবে শিখ সিংহরা এবং যুদ্ধ করিয়া শত্রুনিধনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। গুরু গোবিন্দের এই দীক্ষায় শিখরা নূতন জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ঔরঙ্গজীবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে রাজপুত শক্তিও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল। মারওয়াড ও মেবারের সংগ্রামের কাহিনী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দাক্ষিণাত্যেও বিরাট হিন্দু পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল নিঃশেষ মারাঠা বীর শাহজী-শিবাজী-শম্ভুজীর নেতৃত্বে। ঔরঙ্গজীব তাঁহার শেষ শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই হিন্দু-অভ্যুত্থানেব উত্তাল তরঙ্গ দাক্ষিণাত্যে রোধ করিতে পারেন নাই এবং দাক্ষিণাত্যেই এই ব্যর্থতার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মারাঠার নবজাগরণ

মারাঠা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন রুক্ষ ও কঠোর, মারাঠাদের জাতীয় চরিত্রও তেমনি ঋজু, দৃঢ় বলিষ্ঠ ও পৌরুষদীপ্ত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়া, কঠোর প্রকৃতির সহিত জীবনধাবণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করিয়া মারাঠাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণের বিকাশ হইয়াছে যাহা ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে বিরল। বাহমনী ও পরবর্তী আহম্মদনগর-গোলকুণ্ডা প্রভৃতি সুলতানবংশের রাজত্বকালে মারাঠারা নিজেদের মাতৃভূমিতে বিধর্মী। বিদেশীদের মতো বিচ্ছিন্নভাবে জীবন কাটাইত। কিন্তু এই সুলতানরাই রাজ্য পরিচালনাব স্বার্থে মাবাঠাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয় নেতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। মোগলদের আধিপত্য বিস্তারে বাধা দিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুলতানবা মারাঠা দলপতিদের সাহায্য গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। উত্তরভারতের মোগল ও দক্ষিণভারতের সুলতানদের পরস্পর বিরোধিতাব সুযোগে মারাঠা দলপতিরা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন শাসনকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাদের শক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে। এই সময় মারাঠাদের মধ্যে এমন একজন শক্তিমান প্রতিভাবান পুরুষের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, যিনি খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মারাঠাদের একজাতির দৃঢবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন: "That genius was Shivaji, the contemporary

and antagonist of Aurangzib." সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সমসাময়িক ও তাঁহার পরম শত্রু শিবাজী হইলেন সেই প্রতিভাবান পুরুষ যিনি বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের তাঁহাব চরিত্রবল ও সংগঠনশক্তির জাদুস্পর্শে একজাতিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

শিবাজী

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল (মতান্তরে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৩০)। জুনারের কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়েকটি মারাঠা পরিবার দাক্ষিণাত্যেব সুলতানদের অধীনে রাজকর্ম করিয়া আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন, তাঁহাদেব মধ্যে 'ভোঁসলে' পরিবার অন্যতম। ভোঁসলেদেব পারিবারিক বৃত্তি ছিল কৃষিকর্ম। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে নিজাম শাহী সুলতানদেব অধীনে কাজ করিয়া তাঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া উঠিলেন। শাহজী পুনা অঞ্চল হইতে জুনার, আহম্মদনগর ত্রিম্বক ও নাসিক দখল করিয়া প্রায় তিন বছব (১৬৩৩-৩৬) সুলতানের নামে রাজত্ব কবেন। জুনার ছিল তাঁহার রাজধানী। কিন্তু মোগলদেব আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া শেষে তিনি এইসব দুর্গ ও রাজ্য সমর্পণ করিয়া বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানদের অধীনে রাজকর্মে যোগ দেন (১৬৩৬)। বিজাপুরের পক্ষে রাজ্যজয়ের জন্য তিনি তুঙ্গভদ্রা অঞ্চলে এবং পবে মাদ্রাজ উপকূলে যাত্রা করেন। মহারাষ্ট্র ছাড়িয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়। যাইবার সময় পত্নী তুকাবাঈকে সঙ্গে লইয়া যান। শিবাজীর জননী (শাহজীর প্রথমা পত্নী) জিজাবাঈ পুত্রকে লইযা দেশেই থাকেন। দাদাজী খোন্দদেব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ শিবাজীব অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার কাছে ও জননী জিজার কাছে বাল্যকাল হইতে শিবাজী রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় মহাকাব্যের বীরগাথা ও কাহিনী শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইতেন। ভারতের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যের এই শিক্ষাই ছিল শিবাজীর চরিত্রের ভিত্তি।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে মহারাষ্ট্রের ভক্তসাধকরা একদেবতা ও জাতিবর্ণ-হীন একজাতির আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহাদের বাণী, সংগীত ও ভাষার মধ্য দিয়া মারাঠা জাতীয়তার বিকাশ হইতেছিল। নামদেব ছিলেন এই সাধকদের অগ্রগণ্য। উত্তরে কবীর, দক্ষিণে নামদেব। নাম-

দেবের পর মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী সাধু ছিলেন তুকারাম। শিবাজীর জন্মকালে তুকারাম কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক ছিলেন। পরে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া শিবাজী নূতন প্রেরণা লাভ করেন। তুকারামের আদর্শে ও জননীর চরিত্র শিবাজীকে মারাঠাজতির ভাগ্যবিধাতা করিয়া গড়িয়া তোলে।

শিবাজীর রাজ্যজয়

সহ্যাদ্রি পবতমালার পাদদেশে সরল সবল কৃষকদের সহিত তিনি প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিতেন এবং তাহারাই হইয়াছিল তাঁহার প্রথম জীবনেব মন্ত্রশিষ্য ও স্বাধীনতার সৈনিক। উনিশ বছর বয়সেই (অথবা ষোল) শিবাজী এই সেনাদলের সাহায্যে তোরণা দুর্গ অধিকার কবেন (১৬৪৬), রাজগড়ে নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকিয়া (১৬৫০-৫৫) শিবাজী দুর্ভেদ্য পুরন্দর দুর্গ ও জাবলী অধিকার করেন (১৬৫৬)। তাহাব ফলে দক্ষিণের পথ বাধামুক্ত হইয়া যায়। ঔরঙ্গজীব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, শাহজাহান ছিলেন ভারত-সম্রাট। বিজাপুর আক্রমণ করিবার সময় (১৬৫৭) ঔরঙ্গজীব শিবাজীর সহিত রফা কবিতে চাহিযাছিলেন, কিন্তু শিবাজী তাহা প্রত্যাখ্যান কবেন। হঠাৎ শাহজাহানেব অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজীব যখন দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন দাক্ষিণাত্যের মোগল কর্মচারীদেব তিনি বলিয়া যান, 'শয়তান শিবাজীব' উপর কড়া নজর রাখিতে।

শিবাজী এই ঐতিহাসিক সুযোগেব অপেক্ষায় ছিলেন। দুই বছরের মধ্যে (১৬৫৭-৫৯) তিনি উত্তর-কোঙ্কনের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। মোগল আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া বিজাপুরীরাও শিবাজীকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। বিজাপুর-সুলতানদের বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সুলতানবা আদেশ করিয়াছিলেন যে ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবে হোক শিবাজীকে বন্দী বা হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু শেষে আফজল খাঁ নিজের ফাঁদে পড়িয়া শিবাজীর হাতে নিহত হইয়াছিলেন। বিজাপুরের শিবির লুণ্ঠন করিয়া শিবাজী দক্ষিণকোঙ্কন ও কোলাপুব অধিকার করেন। শিবাজী সুরাট বন্দর লুট করিয়া (জানুয়ারী ১৬৬৪) প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে ঔরঙ্গজীব শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠান। জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের

ভিতরে শিবাজীর কর্মচারীরা সপরিবারে বাস করিতেন। যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে মনে করিয়া শিবাজী জয়সিংহের সহিত **পুরন্দরের চুক্তি** করেন (জুন ১৬৬৫)। চুক্তি অনুযায়ী তাঁহাকে ২৩টি দুর্গ ও ১৬ লক্ষ টাকা বাৎসরিক রাজস্বের

ভূ-সম্পত্তি দিতে হয় এবং নিজে মোগল আনুগত্যের বিনিময়ে রাজগড়সহ ১২টি দুর্গ ও বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাকা রাজস্বের সম্পত্তি রাখিবার অনুমতি পান।

শিবাজীকে দাক্ষিণাত্য হইতে সরাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় মনে করিয়া জয়সিংহ তাঁহাকে রাজ-দরবারে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মোগল সম্রাট তাঁহাকে সর্বব্যাপারে যোগ্য মর্যাদা দিবেন এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। শিবাজী সম্মত হন এবং জননী জিজাবাঈকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া উত্তরে যাত্রা করেন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আগ্রায় পৌছান। কিন্তু জয়সিংহের কথামতো সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে মর্যাদা দেন নাই বা সমাদর করেন নাই। ইহাতে শিবাজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং প্রকাশ্য দরবারে সম্রাটের সামনে অভিযোগ ও প্রতিবাদ করেন। সম্রাট তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দরবারে আসা বন্ধ করেন এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্তে রাজকর্মে পাঠাইয়া সেখানে তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু শিবাজীকে দেশের লোক 'পার্বত্য মূষিক' বলিত। আগ্রা হইতে হঠাৎ তিনি অন্তর্ধান করিয়া এত দ্রুত দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসেন যে শত্রুমিত্র সকলেই অবাক হইয়া যায়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিবাজী মোগলদের চোখে ধূলা দিয়া রূপকথায় রাজকুমারের মতো স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহার শেষ উইলে লিখিয়া গিয়াছেন : "শয়তান শিবা আমার অনবধানতার জন্য দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যায় এবং তাহার ফলে শেষদিন পর্যন্ত আমাকে হয়রাণ হইতে হয়।"

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শিবাজী কিছুদিন শান্তভাবে থাকেন, মোগলদের সহিত শান্তি স্থাপন করেন। এই সময় (১৬৬৭-৬৯) তিনি তাঁহার শাসন ও সংগঠনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে থাকেন। তারপর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সুরাট বন্দর আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধন-সামগ্রী লুট করেন। মোগল সেনাপতি দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া শিবাজী বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করেন (১৬৭১-৭৩)। রায়গড় দুর্গে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান হয় (৬ জুন ১৬৭৪)। শিবাজী রাজা হইয়া 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় আদিল শাহের মৃত্যুর পর বিজাপুরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। গোলকুণ্ডার সুলতানের হিন্দু উজীর মদন পণ্ডিতের চেষ্টায় এই সময় শিবাজীর সহিত গোলকুণ্ডার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়। শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর হইতে কুদ্দালোর পর্যন্ত অগ্রসর হন (১৬৭৭-৭৮)। মহীশূরের

উত্তরপূর্ব ও মধ্য অঞ্চলও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। দক্ষিণভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া শিবাজী যখন জাতীয় গৌরবের চূড়ায় উঠিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল (৩ এপ্রিল ১৬৮০)।

শিবাজীর রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তরে বামনগর (আধুনিক সুরাটের অন্তর্গত ধরমপুর রাজ্য) হইতে, পর্তুগীজ উপনিবেশ বাদ দিয়া, দক্ষিণে কানাডার বোম্বাই জেলার কারওয়ার বা গঙ্গাবতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের পূর্ব-সীমানা বাগলানা হইতে নাসিক ও পুনা জেলার মধ্য দিয়া সাতারা জেলা বেষ্টন করিয়া কোলাপুর জেলার অধিকাংশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ইহা ছাড়া পশ্চিম-কর্নাটক, বর্তমান মহীশূর রাজ্যের উত্তর, মধ্য ও পূর্বাংশ এবং মাদ্রাজের বেলারী, চিতুর ও আর্কট জেলার কিছু অংশও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। রাজ্যের বাহিরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া শিবাজীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও তাহা তাঁহার শাসনাধীন ছিল না। বাহিরের এই অঞ্চলে তাঁহার মারাঠাবাহিনী হানা দিবে না এই প্রতিশ্রুতি ও নিরপত্তার বিনিময়ে তিনি এই সব অঞ্চল হইতে রাজস্বের চতুর্থাংশ আদায় করিতেন। ইহাকে **চৌথ** বলিত।

কেন্দ্রীয় শাসন শিবাজী-নিযুক্ত আটজন প্রধান বা মন্ত্রী পরিচালনা করিতেন। ইঁহাদের **অষ্টপ্রধান** বলিত। অষ্টপ্রধানদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে **পেশওয়া** বা 'মুখ্য প্রধান' বলিত। অষ্টপ্রধানের পরিচয় এই :

১।	পেশওয়া বা মুখ্য প্রধান	। প্রধানমন্ত্রী
২।	মজুমদার বা অমাত্য	। প্রধান হিসাবরক্ষক
৩।	ওয়াক্-ই-নবীশ বা মন্ত্রী	। রাজার ও পরিষদের দৈনন্দিন কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন
৪।	সুর্নী বা সচিব	। চিঠিপত্রাদির পর্যবেক্ষক
৫।	দবীর বা সুমন্ত	। বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী ও গোয়েন্দাবিভাগের কর্তা
৬।	সর্-ই-নৌবত বা সেনাপতি	। প্রধান সেনাপতি
৭।	পণ্ডিত রাও	। ধর্ম ও জাতিগত বিষয়ের বিচারক
৮।	ন্যায়াধীশ	। প্রধান বিচারপতি

কেবল সেনাপতি ছাড়া বাকি প্রধানরা ছিলেন ব্রাহ্মণবংশজাত। প্রথম ছয়জন প্রধানকে (পণ্ডিত রাও ও ন্যায়াধীশ ছাড়া) প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত। কেরানী ও লিপিকরের (copyist) কাজকর্ম প্রধানত 'প্রভু' বা কায়স্থরা করিতেন এবং সৈন্যবাহিনীর বেতন-ভাতা ইত্যাদির হিসাব রাখিতেন 'সবনিস'বা (ফার্সী 'বক্‌সী'দের মতো)।

অষ্টপ্রধান প্রধানত ছিলেন রাজার উপদেষ্টাগোষ্ঠী। তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে রাজাকে পরামর্শ দিতেন, কিন্তু স্বাধীন কোন নীতি গ্রহণ বা বিধান প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। রাজা নিজেই তাহা করিতেন, তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্তা। তাঁহার আদেশ, নীতি ও বিধান অষ্টপ্রধানকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যকর করিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী 'পেশওয়া' বা মুখ্য প্রধানকে রাজা অন্যান্য প্রধানদের অপেক্ষা বেশী সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তিনি মুখ্য প্রধান বলিয়া অন্যান্য প্রধানদের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। প্রধানরা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব নিজেরাই পালন করিতেন, আবশ্যক হইলে রাজার সহিত পরামর্শ করিতেন, অথবা তাঁহার অনুমতি চাহিতেন। রাজার পরিবর্তে মুখ্য প্রধান বা পেশওয়া তাঁহাদের কোন হুকুম দিতে পারিতেন না। চতুর্দশ ল্যুই ও ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের মতো শিবাজী নিজেই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান পরিচালক ছিলেন।

নূতন জাতির জন্ম

শিবাজী ছিলেন মারাঠা জনসাধারণের কাছে আদর্শ যুগপুরুষ। তাঁহার মৃত্যুর পরে মারাঠাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও তাই তাঁহার নীতি ও আদর্শের বিপর্যয় হয় নাই। চিরদিন তাঁহার স্মৃতি মারাঠার জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, আজও করে। কেবল মারাঠাদের নয়, সারা ভারতের হিন্দুরা জাতীয় বিপর্যয়ের সময় তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া নূতন করিয়া জাগিবার ও মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও (১৯০৫) তাই 'শিবাজী উৎসব' বাঙালীর নবজাতীয়তাবোধ উদ্‌বোধনে প্রেরণা দিয়াছে। ইতিহাসে বড় বড় রাজবংশ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু কোনও জাতি বা 'nation' কখনও লোপ পায় নাই। শিবাজী ও তাঁহার আদর্শ ইতিহাসে অমর হইয়া আছে তাহার

কারণ, পানিক্করের ভাষায় বলা যায়, "what Shivaji had created was not a dynasty but a nation and a state"—শিবাজী কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একটি জাতি এবং রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাজবংশের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জাতির মৃত্যু নাই।

QUESTIONS

1. Give a brief estimate of Aurangzeb's achievements as a ruler.

2. Discuss critically the Deccan Policy of Aurangzeb.

Or

"The Deccan ulcer ruined Aurangzeb." Discuss the statement with reference to Aurangzeb's Deccan Policy.

3 What were the consequences of Aurangzeb's religious bigotry and anti-Hindu measures ?

ঔরঙ্গজীবের হিন্দুবিদ্বেষ ও ধর্মগোঁড়ামি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৎনামী-বিদ্রোহ, শিখ জাঠ মারাঠা ও রাজপুতদের অভ্যুত্থানের কথা লিখিতে হইবে।

4. Discuss critically how far Aurangzeb was responsible for the break-up and decline of the Mughal Empire.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মারাঠাদের বিপর্যয়। মোগলদের পতন

মারাঠা রাষ্ট্রের অষ্টপ্রধানদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে বলিত 'মুখ্য প্রধান' বা **পেশওয়া**। শিবাজী-শম্ভুজীর পরে শাহুজীর আমল হইতে পেশওয়াদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহাদের পেশওয়াগিরিও বংশানুক্রমিক বৃত্তি হইয়া ওঠে। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুকালে তারাবাঈ তাঁহার নিজের পুত্র তৃতীয়-শিবাজীর (১৭০০-১৭১২) পক্ষে মারাঠারাজ্য শাসন করিতেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আজম শাহ্ শাহুজীকে (বা দ্বিতীয় শিবাজী) কারামুক্ত করেন এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে শাহুজী-তারাবাঈয়ের মধ্যে শাসনাধিকার লইয়া বিরোধ বাধিবে। তাঁহার ধারণা সত্য হইয়াছিল। শম্ভুজীর পুত্র শাহুজীর সিংহাসনের দাবী ছিল ন্যায়সংগত, কিন্তু তারাবাঈ তাহা স্বীকার করিলেন না। মারাঠাদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সূচনা হইল। **শাহুজী** সাতারায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে (১৭০৮) তারাবাঈ পানহালা দুর্গে (কোল্‌হাপুর হইতে ১২ মাইল দূরে) রাজধানী স্থাপন করেন। এই গৃহ-যুদ্ধের আগুনে মারাঠারাজ্য ও মারাঠাশক্তি হয়ত নিঃশেষ হইয়া যাইত। কিন্তু এই সংকটের সময়, বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কনের একজন চিৎপবন-ব্রাহ্মণ শাহুজী ও তাঁহার মারাঠারাজ্যকে রক্ষা করিলেন। তিনি শাহুজীর 'পেশওয়া' নিযুক্ত হইলেন (১৬ নভেম্বর ১৭১৬)। তাঁহার পর হইতে পেশওয়াদের বংশানুক্রমিক রাজ্য-পরিচালনায় মারাঠাশক্তির পুনরুজ্জীবন হইল।

CHAPTER XXIII: (1) Maratha kingdom after Shivaji, Sahu and the first three Peshwas. (2) Panipat and the Maratha setback. (3) Decay of the Mughal empire, Bahadur Shah, Faruksiyar—Muhammad Shah—Nadir Shah's invasion—causes of the downfall.

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩-২০

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০) মারাঠা দলপতিদের আত্মপ্রাধান্য খর্ব করিবার জন্য নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করিলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার তিনি 'প্রতিনিধি', 'সেনাপতি', 'সেনা সাহেব' প্রভৃতি মারাঠা নায়কদের ভাগ করিয়া দিলেন। 'সরদেশমুখী'র সমস্ত অর্থ রাজার প্রাপ্য। চৌথের চতুর্থাংশ (২৫%) রাজার প্রাপ্য, শতকরা ৯ ভাগ রাজা যাহাকে খুশী দিতে পারেন, বাকি ৬৬ ভাগ প্রধানদের প্রাপ্য। এই ব্যবস্থার ফলে মারাঠা প্রধানরা কোন রাজ্যাংশের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার পাইলেন না, এবং রাজার সহিত তাঁহাদের বন্ধনও রহিল। প্রধানদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি ও রেষারেষি বন্ধ হইল।

পেশওয়া বাজীরাও ১৭২০-৪০

বালাজীর পর পেশওয়া বাজীরাও (১৭২০-৪০) পেশওয়া-পদে নিযুক্ত হন। বাজী রাও মারাঠারাজ্য দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে বিস্তারে অগ্রণী হন, কৃষ্ণা হইতে সিন্ধুর তীর পর্যন্ত মারাঠারাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। জয়পুর ও বুন্দেলরাজের সহিত এই উদ্দেশ্যে তিনি বন্ধুত্ব করেন। মালব, নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব ও দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত হানা দেন। কিন্তু হঠাৎ **নাদির শাহের** ভারত আক্রমণে ঘটনাস্রোত ঘুরিয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বাজীরাও আবেদন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজী বাজী রাও পেশওয়াত্ব গ্রহণ করেন (১৭৪০-৬১)। ছত্রপতি শাহুজীর মৃত্যু হয় ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। শাহুজীর তরুণ পুত্র রাম রাজাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। তারাবাঈ মনে করিয়াছিলেন যে তিনি অভিভাবকরূপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। সাতারা হইতে পুনায় রামরাজা চলিয়া আসেন, এবং **সাঙ্গোলা চুক্তি** নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া মারাঠা রাজ্যের সমস্ত প্রধান পদ পেশওয়ার নিজের প্রতিনিধিদের অর্পণ করেন (১৭৫০)। সাতারার বদলে পুনা হয় মারাঠা রাজধানী, মারাঠা রাজ্যে ছত্রপতির প্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পেশওয়ারা এই চুক্তির পর মারাঠা-রাজ্যের সর্বময় কর্তা হন।

পেশওয়া বালাজী বাজী রাও ১৭৪০-৬১

রাজ্যবিস্তার নীতি বালাজীও তাঁহার পিতার মতো সোৎসাহে অনুসরণ করেন। কর্নাটক ও কৃষ্ণার দক্ষিণ অঞ্চলে তাঁহার অভিযান চলিল। পেশওয়া-বংশের পরম শত্রু বেরারের মারাঠা-প্রধান রঘুজী ভোঁসলেকে বাংলাদেশে চৌথ ইত্যাদি আদায়ের অধিকার দিয়া তিনি হাত করিয়া ফেলিলেন। রঘুজীর মারাঠা সেনাদের উপদ্রবে (**বর্গীর হাঙ্গামা** বলিয়া কথিত) বাংলার আলিবর্দী খাঁ তাঁহাকে বছরে ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হয়। বালাজী বাজী রাও আহম্মদনগর দুর্গ দখল করেন এবং পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও ভাউ-এর নেতৃত্বে উদ্‌গীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া (১৭৬০) নিজামরাজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। তাঁহার আমলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাশক্তির চরম বিকাশ হয়। এদিকে উত্তর-ভারতে আহম্মদ শাহ আবদালী চতুর্থ অভিযানের পর (১৭৫৬-৫৭) পাঞ্জাবে মারাঠাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করেন। দিল্লীর ১০ মাইল দূরে বরারি ঘাটের যুদ্ধে মারাঠা প্রতিনিধি দত্তজী সিন্ধিয়া নিহত হন এবং দিল্লীতে মলহর রাও হোলকার পরাজিত হন (১৭৬০)। তারপর মারাঠাদের সহিত চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য আবদালী আলিগড়ে অপেক্ষা করিতে থাকেন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১

মারাঠাদের সর্বাধিনায়ক হইয়া আসিলেন দাক্ষিণাত্যে উদ্‌গীরের বিজয়ী বীর সদাশিব রাও ভাউ। দিল্লীতে উপবিষ্ট আফগান সৈন্যদের হাত হইতে তিনি শহরটি ছিনাইয়া লইলেন (আগষ্ট ১৭৬০)। কিন্তু তাহাতে উত্তরের মারাঠা সৈন্যদের খাদ্যসমস্যা মিটিল না, তাহাদের প্রায় চারিদিকে আটক করিয়া ফেলা হইয়াছিল। সদাশিব পাণিপথে আসিয়া পৌছিলেন। ইহার মধ্যে আহম্মদ শাহ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে ও রোহিলা সর্দার নজীব খাঁকে হাত করিয়াছিলেন। মারাঠাদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুরা কেহ তাহাদের বিপদের মুখে সাহায্য করিতে উৎসাহিত হইল না। মারাঠারা মিত্রহীন হইয়া পড়িল, বাহিরের সহিত তাহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। উত্তরভারতে তাহারাই যেন বিদেশী হইয়া দাঁড়াইল। অনাহারের তাড়নায় মরিয়া হইয়া অবশেষে তাহারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য পাণিপথের

প্রান্তরে বাহির হইয়া আসিল (২৪ জানুয়ারী ১৭৬২)। যুদ্ধ হইল সকাল হইতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত। মারাঠাদের ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটিল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে মারাঠাশক্তির ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের আশা ধূলিসাৎ হইল, পেশোয়ার মর্যাদা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইল। মালব, রাজপুতানা, দোয়াব অঞ্চল মারাঠাদের হাতছাড়া হইল, দক্ষিণে হায়দারাবাদের নিজাম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। পেশওয়া মাধব রাও-এর নেতৃত্বে আবার মারাঠারা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলেও, উদীয়মান ব্রিটিশ রাজশক্তির জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিহাসের ধারা তখন নূতন পথে বাঁক ফিরিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরেই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠা-শক্তির বিপর্যয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যতম প্রতিবন্ধক অনেকটা অপসারিত হয় এবং ব্রিটিশের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত হয়।

পাণিপথ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এইজন্য যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) লোদীরাজবংশের বিপর্যয়ে ও বাবরের জয়ে মোগল রাজশক্তির উদয়ের আভাস পাওয়া যায়। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুর পরাজয়ে হিন্দু ও আফগানশক্তির বিরোধিতার অবসান হয়, আকবরের মোগলসাম্রাজ্য গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মোগল ও মারাঠাশক্তির অবসান এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয় সূচীত হয়। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে 'পাণিপথ' যেন ভাগ্যবিধাতা হইয়া ওঠে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ১৭০৭-১৮৫৮

(ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর আরও প্রায় ১৫০ বছর মোগল শাসনের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শাসকদের অকর্মণ্যতা, দুর্বলতা, বিলাস-প্রিয়তা ও অন্তর্বিরোধের জন্য তাহার প্রাণশক্তি ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব জীবিত থাকিতেই ভারতে নূতন ইউরোপীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহারই হাতে যে রাজদণ্ড যাইবে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছিল। ঔরঙ্গজীবের পুত্রদের মধ্যে শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি লইয়া সম্রাট হইলেন (১৭০৭-১২)।

বাহাদুর শাহের দুর্বলতা ও আরামপ্রিয়তার জন্য উজীরদের আধিপত্য বাড়িল এবং দুই উজীরের মধ্যে (মুনিম খাঁ ও আসাদ খাঁ) ক্ষমতার লড়াই

বাধিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের গৃহযুদ্ধে পুত্রদের মধ্যে **আজিম-উশশান** খুন হইলেন, আর দুই পুত্রের একই পরিণতি হইল, সম্রাট হইলেন অপদার্থ **জাহান্দার শাহ** (১৭১২-১৩), কিন্তু একবছরের মধ্যে আজিম-উশ-শানের পুত্র **ফররুক-সিয়ার** সৈয়দবংশীয় দুই ভাই হাসান আলি ও হুসেন আলির সাহায্যে তাঁহাকে খুন করিয়া রাজা হইলেন (১৭১৩-১৯)। তাঁহার রাজত্বে স্বভাবতঃই ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হত্যা করা হইল। কিছুদিনের মধ্যে আলি ভাইরাও ডুবিয়া গেলেন এবং বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহ **মহম্মদ শাহ** উপাধি লইয়া সম্রাট হইলেন (১৭১৯-৪৮)। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যেটুকু বাকি ছিল তাহা মহম্মদ শাহের আমলে শেষ হইল।

মহম্মদ শাহের উজীর নিজাম-উল-মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইতে স্বাধীন শাসক হইয়া উঠিলেন, হায়দারাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সাফাবীবংশ উচ্ছেদ করিয়া তুর্কী **নাদির শাহ** পারস্যের রাজা হইয়া (১৭৩৬) ভারত আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আঘাতে মোগল সাম্রাজ্যের জীর্ণ মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল। সুবাদাররা চারিদিকে স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইলেন— অযোধ্যায় সাদৎ খাঁ, বাংলাদেশে আলিবর্দী খাঁ, রোহিলখণ্ডে আফগানরা। মারাঠারা মালব, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বেরার, উড়িষ্যা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। নাদীরশাহের পরে **আহম্মদশাহ আবদালির** ভারত-অভিযানে এই ধ্বংসের কাজ শেষ হইল। মহম্মদ শাহের পরে **আহম্মদ শাহ** (১৭৪৮-৫৪), **দ্বিতীয়-আলমগীর** (১৭৫৪-৫৯), **দ্বিতীয় শাহ আলম** (১৭৫৯-১৮০৬), **দ্বিতীয় আকবর** (১৮০৬-৩৭), ও **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ** (১৮৩৭-৫৮) সম্রাট হইয়া সিংহাসনে পুতুলের মতো বসিয়াছিলেন মাত্র। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে, দ্বিতীয়-আলমগীরের রাজত্বকালে। তাহার একশত বছর পরে (১৮৫৭-৫৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আমলে জাতীয় বিদ্রোহ হয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনপর্ব শেষ হইয়া ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ভারতবর্ষে।

মোগল সাম্রাজ্যের ভিত দৃঢ় করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বাদশাহ আকবর। তাঁহার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল—ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির বন্ধনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় (national)

রাষ্ট্রের সৌধ নির্মাণ করা। এমন একটি রাষ্ট্রসৌধ, যাহার ভিত্তিতে কোনোদিন ফাটল ধরিবে না। তাঁহার পরবর্তী বংশধর জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান চরিত্রগুণে তাঁহার সমকক্ষ না হইলেও এই মূলনীতির নোঙর ছিন্ন করিয়া দূরে ভাসিয়া যান নাই। ঔরঙ্গজীব এই জাতীয় ঐক্যের মূলনীতিকে পদদলিত করিয়া এমন নিষ্ঠুরভাবে হিন্দুবিদ্বেষনীতি অনুসরণ করেন যে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত ভাঙিয়া যায়, রাজ্যের মধ্যে চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। জাঠ ও সৎনামীরা বিদ্রোহ করে, শিখ ও রাজপুতরা বিদ্রোহ করে এবং দক্ষিণভারতে বিপুল শক্তি লইয়া নূতন মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান হয়। পরিষ্কার বোঝা যায়, মোগলদের পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। মোগল বাদশাহরা শাসনব্যবস্থার সংস্কার করিয়াছিলেন বটে, তাহা বাহিরের দরবারী (courtly) সংস্কার। মূল অর্থনীতিক ব্যবস্থার কোন সংস্কার বা উন্নয়ন তাঁহাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু অবিরাম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও গৃহযুদ্ধের ফলে যে ধনক্ষয় হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণের আর্থিক কষ্টের বোঝা আরও বাড়িয়াছে। বাদশাহ ও আমীরচক্র বিলাসিতার জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহার সামান্য অংশও রাজ্যের প্রজাদের অভাব মোচনের জন্য করেন নাই। ইহার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট ও অসন্তোষ বাড়িয়াছে এবং রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যে অবনতির ও পতনের ইহাও একটি বড় কারণ।)

এই অবস্থায় যখন ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হইল (১৭০৭) তখন তাঁহার অপদার্থ উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনে বসিয়া রাষ্ট্রের হাল ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, নিজেরা হানাহানি করিয়াই তাঁহারা ক্ষীয়মান শক্তির আরও অনেকটা ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। এমন সময় পারস্যের দুর্ধর্ষ নাদির শাহ এবং তাঁহার পরে আহম্মদ আবদালির প্রচণ্ড আঘাতে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য জীর্ণ অট্টালিকার মতো ভাঙিয়া পড়িল। ইহার আগে হইতেই ভারতে নূতন ইউরোপীয় রাজশক্তির অভ্যুদয় হইতেছিল। আহম্মদ শাহ আবদালি চতুর্থবার দিল্লী অভিযান করেন নভেম্বর ১৭৫৬ সনে। বাংলাদেশে তখন সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের শক্তির লড়াই চলিতেছে। আবদালি ভারত-লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া যান এপ্রিল ১৭৫৭ সনে। তাহার কয়েকদিন পরে বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধে (জুন ১৭৫৭) ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পাট

আভাস পাওয়া যায়। অস্তগামী মোগল আমলের গোধূলি-রঙে পলাশীর আকাশ রঞ্জিত হইয়া ওঠে।

QUESTIONS

1. Give a brief sketch of the career of Shivaji.

2. "To the Hindu world in that age of renewed persecution Shivaji appeared as the star of a new hope, the protector of their religion." Discuss the statement critically.

3. "What Shivaji had created was not a dynasty but a nation and a state." Discuss the statement.

4. Give a brief estimate of Shivaji's character and personality.

5. Give a short account of Shivaji's administrative system.

6. Trace briefly the history of the Marathas from the death of Shivaji (1680) till the Third Battle of Panipath (1761).

7. What were the causes of the downfall of the Mughal Empire ?

8. What was the historical background and significance of the Third Battle of Panipat ? What were the causes of the defeat of the Marathas, and what were its consequences ?

9. Write notes on .
   (a) Balaji Biswanath
   (b) Balaji Baji Rao
   (c) Satnami rebellion
   (d) Nadir Shah and Ahammad Shah Abdali
   (e) Jezya

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মোগলযুগের শাসন, সমাজ ও শিল্পকলা

মোগল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রবর্তক বাদশাহ্ আকবর। তাঁহার পূর্বে বাবর বা হুমায়ুনের রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিশেষ অবকাশ হয় নাই। মোগল রাজ্য কোন রকমে পুনরুদ্ধার করিবার পর হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। আকবর দীর্ঘকাল অবিরাম সংগ্রাম করিয়া বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মাণ করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হয়। আকবরের অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা ছিল, খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ থাকিত। তাই কেবল বিশাল সাম্রাজ্যগঠন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। তাহা সুশাসনের সুব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে, স্মিথ বলিয়াছেন, ইংরেজ শাসকরা অন্ধকারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে আকবরের শাসনব্যবস্থাই কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোগল শাসনব্যবস্থা

ইসলামের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র হইল সামরিক রাষ্ট্র এবং সম্রাট তাহার সর্বাধিনায়ক। তিনি কাহারও আদেশ ও উপদেশ মানিতে বাধ্য নহেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ কোন অন্যায় তিনি করিতে পারেন না। আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের এই সর্বময় কর্তৃত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উজীর বৈরাম খাঁর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সম্রাটের অধীনে উজীর বা দেওয়ান কাহারও উপর নিশ্চিন্তে কর্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত নহে। তাই সম্রাটের অধীনে রাজকীয় ও প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মীদের মধ্যে

CHAPTER XXIV—(1) Mughal administrative system—Mughal army—social and economic life, Literature. Accounts of foreign travellers—Bernier, Tavernier, Manucci, Art, Roe etc.

ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মোগল শাসন প্রধানত এই আটটি বিভাগে বিভক্ত ছিল :

১। **দেওয়ান-ই-আলা :** বড় দেওয়ান বা উজীর : রাজস্ববিভাগের প্রধান ইহার দুইজন সহকারী—(ক) দেওয়ান-ই-তন্ (তন্‌খা বা বেতনের দায়িত্ব লইতেন) ও (খ) দেওয়ান-ই-খালসা (রাজার খাস্ ভূসম্পত্তি তদারক করিতেন)।

২। **খান-ই-সামান :** পদমর্যাদায় প্রধান দেওয়ানের পরবর্তী কর্মচারী। সম্রাটের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারের যাবতীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের খিলাৎখানা ও কারখানায় তদারকের, কারিগর দাসদাসী পরিচারিকা ইত্যাদি নিয়োগের দায়িত্ব ইনি পালন করিতেন। ইহা যে কত বড গুরুদায়িত্ব তাহা সহজে অনুমান করা যায়। সম্রাট যেখানে যান খান-ই-সামান তাঁহার সঙ্গে যান। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য কেহ কেহ খান-ই-সামান হইতে উজীর হইয়াছেন।

৩। **মীর বক্সী**। সামরিক বিভাগের বেতন ঠিক করিতেন। বক্সী কেবল সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যদের বেতনের বিল তৈরী করিতেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দেওয়ান তাঁহাদের বেতন দিতেন। যুদ্ধের সময় বেতন দিতেন বক্সী।

৪। **কাজী উল-কুজাৎ** এবং ৫। **সদর-ই-কুল** হইলেন বিচার-বিভাগের দুই প্রধান। কাজীর বিচার ধর্মগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ইসলামধর্মের ন্যায়শাস্ত্রানুসারে তিনি মুফতীর (একালের বি এল-দের মতো) নির্দেশে বিচার করিতেন। প্রধান কাজী বা কাজী-উল-কুজাৎ সম্রাটের সঙ্গে সর্বত্র যাইতেন এবং শহরে, জেলায় ও গ্রামে কাজী নিয়োগের ভার থাকিত তাঁহার উপর। 'সদর' সম্রাটের দান খয়রাতের সম্পত্তি (মদদ-ই-মাস বা আয়মা, ধার্মিক ও পণ্ডিতদের যাহা দান করা হইত) তদারক করিতেন এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত কিনা বিচার করিতেন। টাকা পয়সাও সম্রাট যাহা দান করিতেন (রমজানের দিন বা অন্যান্য উৎসব পার্বণের দিন) তাহা 'সদর' দেখাশুনা করিতেন। প্রধান 'সদর'কে সদর ই-জাহান বা সদর-ই-কুল বলিত। প্রত্যেক প্রদেশেও একজন করিয়া 'সদর' থাকিতেন।

৬। **মুহ্‌তাসিব**। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের অভিভাবক। ইসলামের নীতি অনুযায়ী মুসলমানের কোনরকম মাদকের নেশা নিষিদ্ধ; ভাং, সুরা ইত্যাদি পান শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মুহ্‌তাসিবরা বিভিন্ন অঞ্চলে একদল সিপাহী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং মদ চোলাইয়ের ঘাটি বা দোকান, ভাঙের আড্ডা, নেশা ও জুয়াখেলার আড্ডা ইত্যাদিতে হানা দিতেন। ঔরঙ্গজীবের আমলে হিন্দুদের দেবালয় ধ্বংস করাও ইহাদের কাজ হয়।

এই ছয়জন ছাড়া পদমর্যাদার একটু নিম্নস্তরের আরও দুইজন রাজকর্মচারী ছিলেন।

৭। **মীর অতীশ** বা দারোগা-ই-তোপখানা। নাম হইতেই বুঝা যায় ইনি তোপখানার দারোগা।

৮। **দারোগা-ই-ডাকচৌকি**: ডাক ও সংবাদ বিভাগের প্রধান কর্মচারী।

এই ছয়জন বা আটজন প্রধানরা কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না। প্রধান দেওয়ান বা উজীরের পদমর্যাদা অন্যদের তুলনায় অধিক হইলেও কোন বিভাগের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব করা চলিত না। সম্রাট নিজে প্রত্যেক বিভাগের কাজকর্মের কৈফিয়ৎ তলপ করিতেন এবং তিনিই ছিলেন সকলের হর্তাকর্তা বিধাতা। বিভাগীয় প্রধানরা আবশ্যক হইলে তাঁহার আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

প্রাদেশিক শাসন

প্রত্যেক 'সুবা' বা প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুকরণে গঠিত ছিল। আকবরের আমলে ১৫টি, জাহাঙ্গীরের আমলে ১৭টি এবং ঔরঙ্গজীবের আমলে ২১টি সুবা বা প্রদেশ ছিল। কেন্দ্রের মতো প্রদেশ বা সুবাতেও নাজিম বা সুবাদার, দেওয়ান, বক্সী, কাজী, সদর ছিলেন, কেবল খান-ই-সামান ছিলেন না।

সুবাদার ও দেওয়ান। সুবাদার বা 'নাজিম' ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকার্যে প্রধান পরিচালক। সম্রাটের আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করা, রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। পদমর্যাদায় দেওয়ান তাঁহার পরবর্তী স্তরে ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি

সুবাদারের আজ্ঞাধীন ছিলেন না। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্তা, কেন্দ্রীয় উজীর বা প্রধান দেওয়ান তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন এবং তাঁহার অধীনেই তিনি প্রাদেশিক রাজস্ববিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে নাজিম বা সুবাদার ও দেওয়ানের মধ্যে সর্বদাই একটা রেষারেষি মনোভাব থাকিত এবং কেহই অন্যের দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না।

ফৌজদার। সুবাদারের শাসনকার্যে সহকারী ছিলেন ফৌজদাররা। ফৌজদারদের অধীনে সৈন্যদল থাকিত এবং তাঁহারা মহকুমা ও বড় বড় অঞ্চলের বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করিতেন। কেবল সুবাদারের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নহে, প্রাদেশিক দেওয়ানের রাজস্ব আদায়ের কাজেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত।

কোতওয়াল। নগর ও শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার।

দেওয়ানের অধীনে রাজস্ববিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা কাজ করিতেন। যেমন—

ক্রোড়ী। জেলার রাজস্ব কর্মচারী। সাধারণতঃ 'এক ক্রোড় দাম' বা আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্বের অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া (আকবরের আমলে) ইঁহাদের 'ক্রোড়ী' বলা হইত। পরে অবশ্য রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়কারীদের সাধারণভাবে 'ক্রোড়ী' বলা হইত।

আমিন। আমিনের প্রধান কাজ ছিল রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত কোন গণ্ডগোল হইলে তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার ও মীমাংসা করা।

কানুনগো। রাজস্ববিভাগের 'কানুন' বা আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জমিজমা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা, রাজস্বের ও জমির পরিমাণ, জরিপ ইত্যাদি তদারক করা এবং সঠিক হিসাব রাখা ছিল ইহাদের প্রধান কাজ।

এই সব রাজকর্মচারী ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে বক্সী কাজী ও সদর নিযুক্ত হইতেন।

সংবাদ বিভাগ। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজকর্মচারীরা কিভাবে কাজ করিতেছেন, রাজ্যের ও প্রজাদের অবস্থা কি, এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোন রাষ্ট্রই শাসন করা সম্ভব নহে। মোগল সম্রাটরা এই সংবাদ

সংগ্রহের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যখন ছাপাখানা সংবাদপত্র ইত্যাদি ছিল না, তাহা জানিতে না পারিলে মোগল শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অজানা রহিয়া যায়। কেন্দ্রীয় সংবাদ বিভাগের চারজন কর্মচারী থাকিতেন—

১। ওয়াক্-ই-নবীশ বা ওয়াক-ই-নিগার ও ২। সওয়ানি-নিগার। দুইজনে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, বর্তমানে রিপোর্টারদের মতো কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠাইতেন। দুইজনের মধ্যে শুধু একটু তফাৎ ছিল যে 'সওয়ানি নিগার' সাধারণত গোপন সংবাদাদি পরিবেশন করিতেন।

২। খুফিয়া-নবীশ। ইহাকে secret writer বা confidential reporter বলা যাইতে পারে। গোয়েন্দার মতো গোপনে ছদ্মবেশে থাকিয়া খুফিয়া-নবীশ যেসব সংবাদ সংগ্রহ করিতেন তাহা কেবল সম্রাটেরই কানে পৌছাইত, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিত না। ঔরঙ্গজীবের আমলে খুফিয়া নবীশদের ভয়ে লোকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত।

সমস্ত সংবাদ 'দারোগা-ই-ডাকচৌকির' কাছে লিখিয়া শীল করিয়া দেওয়া হইত, দারোগা তাহা উজীর বা প্রধান দেওয়ানের হাত দিয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইতেন।

৩। হরকরা। হরকরারা ঘুরিয়া বেড়াইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত, সাধারণত গোপনে, এবং উপরের কর্মচারীদের সেই খবর মুখে বলিত (লিখিয়া নহে)। কদাচিৎ লিখিত সংবাদও হরকরারা পাঠাইত।

এই শাসনিক ব্যবস্থা মোগল রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। ইহার প্রভাব সেকালের হিন্দুরাজাদের রাজ্যে এবং শিবাজীর শাসনকালের প্রথম দিকে মারাঠারাজ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল। শিবাজীর 'অষ্টপ্রধান'দের সহিত মোগলরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অষ্টপ্রধান তুলনীয়। শিবাজী পরে অবশ্য বিভাগীয় প্রধানদের নাম ও পদবীতে হিন্দুভাব আনিবার জন্য তাহার সংস্কৃত-রূপ দিয়াছিলেন। এই মোগল শাসনিক ব্যবস্থার মূল কাঠামটি ইংরেজরাও তাহাদের শাসনকার্যের গোড়ার দিকে কাজে লাগাইয়াছিলেন।

মোগল সেনাবাহিনী

ইসলামের নীতি অনুযায়ী মুসলমান রাষ্ট্রের স্বরূপ হইতেছে সামরিক। তাহার পদবিন্যাস ও মর্যাদার স্তরভেদ সামরিক রীতিতে করা হইত। মোগল

সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের মতো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তে বা প্রত্যক্ষ তদারকে থাকিত না। সম্রাটের আদেশে রাষ্ট্রের আমীর ওমরাহ, প্রধান ও নায়করা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিজেদের অধীনে রাখিতে পারেন, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের উপর থাকিত, সম্রাটের কাছ হইতে তাঁহারা সৈন্যসংখ্যা অনুপাতে বেতন বাবদ টাকা পাইতেন। ইহাকেই 'মনসব' দেওয়া বলিত। যাঁহাদের দেওয়া হইত তাঁহাদের বলা হইত **'মনসবদার'**। মনসবদারদের অধীন সৈন্যরা তাঁহাদেরই প্রভু বলিযা মান্য করিত, কিন্তু সম্রাটের আদেশে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইত। সম্রাটের নিজের অধীনে একদল ভাল সৈন্য মজুত থাকিত, তাহাদের বলা হইত **'আহদী'**। ইহাদের 'অভিজাত সেনা' বলা যায়। মনসবদারদের অধীন মোট সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা আহদীর সংখ্যা অনেক কম থাকিত।

মনসবের সৈন্যসংখ্যার দ্বারাই রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারিত হইত। আমীর ও প্রধানদের মনসব দশজন বিশজন সৈন্য হইতে সাত হাজার সৈন্য পর্যন্ত হইত। দশজন সৈন্যের রক্ষককে 'মীর-দহ' বা 'মীর দশ', বিশজনের 'মীর-বিস্তি', একহাজারের হাজারী, পাঁচহাজারের 'পাঁচহাজারী', সাত হাজারের সাতহাজারী 'মনসবদার' বলা হইত। রাজবংশের কুমারদের সাধারণত দশ-হাজারের মনসব দেওয়া হইত, তাহাদের বলা হইত 'দশহাজারী' মনসবদার।

মোগলযুগের সমাজ ও অর্থনীতি

সবার উপরে সর্বশক্তিমান সম্রাট, ধর্মাবতার ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি—মধ্যের স্তরে ছায়ামূর্তির মতো মনসবদার, আমীর-ওমরাহ-উলামা ও রাজকর্মচারীরা—নিম্নস্তরে লক্ষ লক্ষ কৃষক—মোগলযুগের সমাজের এই চিত্রই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। এই তিনটি স্তরের মধ্যে উপরে রাজা ও নীচে অসংখ্য কৃষিজীবী প্রজা ছাড়া মধ্যবর্তী মনসবদার আমীর-ওমরাহদের স্তরটির কোন স্থায়ী সামাজিক সত্তা ছিল না। কেন ছিল না?

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে। মোগলযুগে কোন মনসবদার আমীর-ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বৈধ অধিকার স্বীকৃত হইত না। সম্রাট যে সব ভূসম্পত্তি বা মর্যাদাসূচক ধনদৌলত দান করিতেন, মৃত্যুর পরে তাহা ভোগের
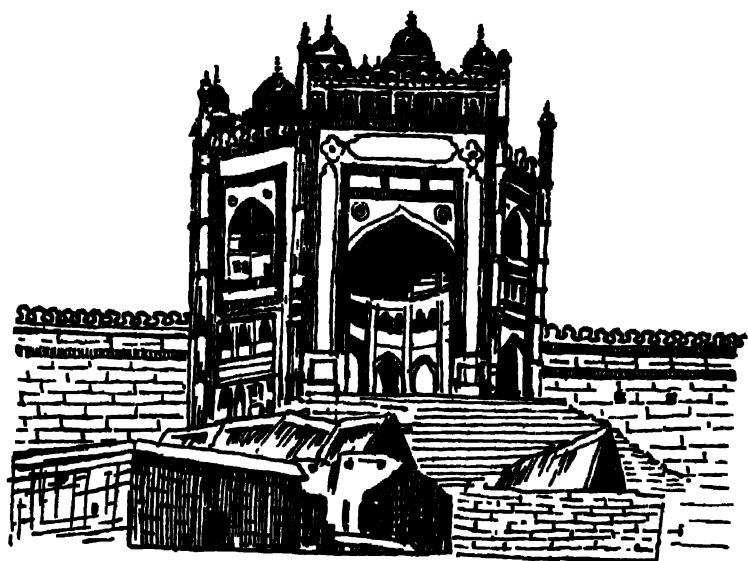
'বুলন্দ দরওয়াজা'
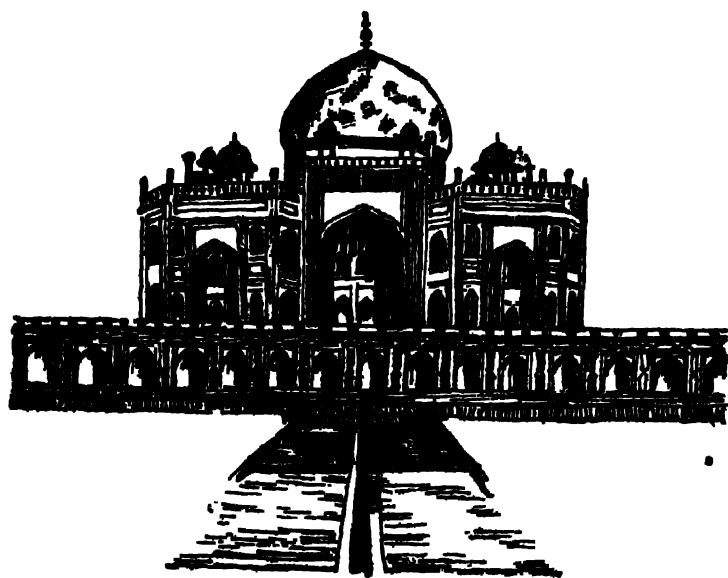
অধিকার লোপ পাইত, উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা বর্তাইত না। এই রীতি যদিও বা সমর্থন করা যায়, ব্যক্তিগত বা স্বোপার্জিত সম্পত্তির ও ধনের অধিকার হইতে মালিককে বঞ্চিত করার রীতি মনে হয় অযৌক্তিক ও অসংগত। কিন্তু মোগলযুগে ইহাই সংগত মনে করা হইত। মোগল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে "বৈয়ৎ-উল-মাল" নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, যাহার কাজ ছিল মৃত আমীর-ওমরাহ মনসবদারদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখা। হকিন্স, বার্নিয়ের, মনুচ্চি প্রমুখ বৈদেশিক পর্যটকরা এই বিচিত্র প্রথার প্রচলন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং বার্নিয়ের ইহাকে 'বর্বর অসভ্য প্রথা' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

কৃষিজীবী সমাজে কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সম্রাটরা কেবল 'রাজস্ব', 'কর' ইত্যাদি আদায় করিয়া তাহাদের শোষণ করিতেন, তাঁহার কর্মচারীরা তাহাদের উপর আরও বেশী নির্যাতন করিতেন। তাই দুর্ভিক্ষ মহামারী লাগিয়াই থাকিত। আকবরের আমলে ১৫৫৫-৫৬ ও ১৫৯৫-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। শাহজাহানের আমলে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে (১৬৩০-৩২) হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষ অনাহারে মারা যায়। ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধবিগ্রহ, জিজিয়া-কর, আবওয়াব ইত্যাদির চাপে সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ উচ্ছন্নে যায়।

মোগল শিল্পকলা

সুলতানী আমলের স্থাপত্যে ও শিল্পকলায় ভারতীয় হিন্দু রীতি বা স্টাইলের সহিত ইসলামিক রীতির (বাগদাদ, মেসোপোতামিয়া, পারস্য) মিশ্রণ ও সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল। মোগল আমলে রাজকীয় উৎসাহে ও পোষকতার ফলে শিল্পকলা ও সাহিত্যে প্রসার ও সমৃদ্ধির সহিত হিন্দু-মুসলমান রীতি-সমন্বয়ের পথ আরও প্রশস্ত হয়। মোগল দরবারে পারস্যের শিল্পীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া শিল্প-সমালোচকরা এই যুগের শিল্পরীতিকে **ইন্দো-পারসিক** রীতি বলিয়া থাকেন। মোগল স্থাপত্যে ও চিত্রশিল্পে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আকবরের রাজত্বকালে মোগল শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা হয় এবং হিন্দুদের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্য তাঁহার আমলে হিন্দু শিল্পরীতির প্রয়োগ

আকবরের সমাধির কারুকার্য

আগ্রার তাজমহলের কারুকার্য

ইসলামিক রীতির সহিত অবাধে হইতে থাকে। আগ্রার কেল্লার 'জাহাঙ্গীর মহল' (নাম 'জাহাঙ্গীর মহল' হইলেও আকবরের সময় গঠিত) দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে ইহা কোন হিন্দু রাজার জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। আগ্রার কেল্লায় অন্যান্য সৌধ শাহজাহান ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পারস্যের প্রবল প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আকবরের আমলে শিল্পীরা যে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান রীতির বিকাশে মনোযোগী হইয়াছিলেন তাহা দিল্লীর 'হুমায়ুন-স্মৃতিসৌধ' দেখিলে বোঝা যায়। এই সৌধের মূল গড়নরীতি পারসিক হইলেও, সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার এবং রঙিন চিত্রিত টাইল না ব্যবহার করা হইতে পারস্যের প্রভাবমুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই হুমায়ুন-স্মৃতি-সৌধের 'মডেলে' পরে বিখ্যাত 'তাজমহল' নির্মাণ করা হয় বলিয়া ইহার গুরুত্ব আছে।

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্যের এই ইন্দো-পারসিক ধারাই অক্ষুণ্ণ থাকে। সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যবিলাস কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার আমলে এই ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির চূড়ান্ত বিকাশ হয়। আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল (১৬৩২-৫৩), মতি মসজিদ (১৬৪৬-৫৩) এবং দিল্লীর লাল কেল্লা ও প্রাসাদ তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্বেত মার্বেল পাথর এবং যথাসম্ভব কম রঙিন টালি ব্যবহার করিয়া শাহজাহান বিশুদ্ধ পারসিক রীতির সংস্কার করেন। বিশালতার সহিত যে কত স্বচ্ছন্দে সরলতা গাম্ভীর্য ও মনোহর মাধুর্যের মিশ্রণ হইতে পারে স্থাপত্যশিল্পে, সম্রাট শাহজাহান তাহা তাজমহল, মতি মসজিদ ও দিল্লীর প্রাসাদ নির্মাণে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ের তাজমহল নির্মাণ শুরু ও শেষ হওয়া (১৬৩২-৫২) স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। প্রায় ২২ বছর লাগিয়াছিল তাজ-মহল নির্মাণ করিতে, প্রতিদিন গড়ে ২০ হাজার কারিগর কাজ করিত এবং ব্যয় হইয়াছিল প্রায় ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা।

চিত্রকলা

ভারতের মোগল চিত্রকলাকে সূক্ষ্ম চিত্রকলা বা 'miniature painting' বলা যায় এবং ইহার প্রেরণার প্রধান উৎস পারস্যের সূক্ষ্ম চিত্রকলা। শের শাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন যখন কিছুদিন তাব্রিজের রাজদরবারে ছিলেন তখন দুইজন প্রতিভাবান শিল্পী সৈয়দ আলি ও সামাদএর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আকবরনামার চিত্র—বসবন অঙ্কিত

হয়। কাবুলে হুমায়ুন ইহাদের সঙ্গে লইয়া আসেন এবং 'আমীর হামজা' কাহিনীর চিত্রায়ণের কাজে নিযুক্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের দরবারে মীর সৈয়দ আলি শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করেন। আলি ও সামাদের হাতে মোগল চিত্রশিল্প প্রথমে পারসিক রীতি হইতে আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় পরিবেশে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে থাকে। প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট এবং ভারতীয় ফুল লতাপাতার রূপায়ণে ইহারা ক্রমে পারসিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে থাকেন। তারপর হিন্দু শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহাদের পারসিক চিত্ররীতির যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি হিন্দু শিল্পরীতিতেও পারসিক রীতির প্রভাব পড়িতে থাকে। আকবরের আশ্রিত হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দশবন্ত (জাতিতে কাহার বা পাল্কি বেয়ারা) ও বসবন। মহাভারত রামায়ণের ফার্সী অনুবাদের পুঁথি আকবর শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আকবরনামা, হামজানামা ইত্যাদির পুঁথিচিত্র মোগল চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রাজপুত শিল্প

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত রাজাদের পোষকতায় তাঁহাদের রাজ দরবারেও শিল্পীরা বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোগল দরবারের মতো তাঁহাদের দরবারেও শোভা বর্ধন করিতেন শিল্পীরা। রাজপুত শিল্পকলা হিন্দুভাব-প্রধান, জনপ্রিয় ও আধ্যাত্মিক। মোগল শিল্পকলা মুসলমানভাব প্রধান, দরবারী ও জাগতিক। কিন্তু রাজপুত ও মোগল শিল্পকলার রীতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং উভয়ের মধ্যে পারসিক রীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। আনন্দ কুমারস্বামী রাজপুত শিল্পকে 'রাজস্থানী' ও 'পাহাড়ী' (হিমালয় অঞ্চলের) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পাহাড়ী রীতির কাংড়া অঞ্চলের একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। স্মিথের মতে পাহাড়ী কাংড়া শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য "their flowing line and westernized drawing of foliage and landscape" —অর্থাৎ রেখার সাবলীল ধারা বা টান এবং কতকটা পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে গাছ লতাপাতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপায়ণ। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য রাজপুত শিল্পের মধ্যে পাহাড়ী কাংড়া শিল্প বিখ্যাত।

জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি

মোগল যুগের প্রধান গৌরব জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি। সর্দার পানিক্কর বলিয়াছেন, "Indeed, after the great days of Kalidasa no century was so productive of the highest literature in India as the period of the great Moghuls." কালিদাসের কালের পরে ভারতের ইতিহাসে আর কোন কালে মোগল আমলের মতো সাহিত্যের চরম বিকাশ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ও তাহার সহিত ফার্সীর চর্চা মোগল যুগে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি জাতীয় মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যেব যেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হইয়াছিল তেমন আর অন্য কিছুর হয় নাই। তুলসীদাসেব রামায়ণ, সুরদাসের সংগীত, বামদাসের কীর্তন ও পৃথ্বীরাজের কাব্য তাহার কযেকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাত্র। তুলসীদাস-সুরদাস রামদাসের এই ধারাব সহিত বাংলার শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিধাবা এই সময মিলিত হইয়া সারা ভাবতবর্ষে ছড়াইয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য লোকসাহিত্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। বাংলা দেশে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষার অনুশীলনের ফলে মাতৃভাষাই লাভবান হয় বেশী। সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী, সংস্কৃতের অনুশীলনে বাংলার ঐশ্বর্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালী সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের সহিত মোগল দরবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে ফার্সীর অনুশীলন বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা ভাষা ফার্সীকে যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির কাজে অগ্রসব হয়। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ফার্সী পণ্ডিত রায়গুণাকর ভাবতচন্দ্রের কাব্য এই বাংলা ও ফার্সীর মিশ্রণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে মোগলযুগের সমাজচিত্র

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যেসব বিদেশী ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সেবাস্তিপ্রাণ সাধু মানরিক (Manrique, ১৬১২) ইংরাজ উইলিয়াম হকিন্স (১৬০১-১২), টমাস রো (১৬১৫-১৯), ইতালীয় পিযেত্রো দেল ভালে (১৬২৩), বার্ট ও কার্টরাইট (১৬৩২), ফরাসী বার্নিয়ের (১৬৫৯-৬৬), তাভার্নিয়ের (১৬৪০-৬৭), ফ্রায়ার (১৬৮১-৮২),

ওভিংটন (১৬৮৯-৯২), ইতালীয় ক্যারেরী (১৬৯৫) ও মনুচ্চি (১৭০৪) অন্যতম। এই বিদেশী পর্যটকরা মোগল সম্রাটের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁহার রাজদরবারের চিত্র নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন, বিশেষ করিয়া হকিন্স, রো ও বার্নিয়ের। কিন্তু কেবল রাজকীয় জীবনের চিত্র আঁকিয়াই তাঁহারা কর্তব্য শেষ করেন নাই, মোগল আমলের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের বাস্তব পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মানরিক বলিয়াছেন বাংলাদেশের কথা। গাঙ্গেয় ভূমির উর্বরতা, গঙ্গানদী ও গরুর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা, কার্পাসবস্ত্র, পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা ও গঙ্গাসাগর যাত্রীদের আত্মদান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার বিবরণ হইতে সেকালের সমাজের কথা জানা যায়। হকিন্স সেকালের মনসবদারীপ্রথা এবং জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবনের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো-কে রাষ্ট্রদূতরূপে পাঠান। রো-সাহেবের দিনপঞ্জী মোগল যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাদানের মূল্যবান আকরগ্রন্থ। ইতালীয় দেল্ল ভাল্লে বলিয়াছেন যে হিন্দুদের সতীদাহপ্রথার বিরোধী ছিলেন মোগল সম্রাটরা এবং তাঁহাদের চেষ্টায় সুরাট ও ক্যাম্বে অঞ্চলে সতীদাহ অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ বণিক বার্টন ও কার্টরাইট বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই দেশের লোকরা চমৎকার কলাকুশলী, হাতের কাজে খুব দক্ষ কারিগর, যে কোন শিল্প নিদর্শন সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে। ফ্রায়ারের বিবরণ হইতে শিবাজীর সময় মারাঠাদের কথা কিছু জানা যায়। ওভিংটন সুরাটের ইংরেজ বণিকদের মুখে শুনিয়া দেশের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব মূল্যবান না হইলেও নগণ্য নহে। ক্যারেরী সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পান, সেই সময়ের অনেক বিষয় তাঁহার বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। মনুচ্চি কিছুদিন দারা শিকোর অধীনে, কিছুদিন জয়সিংহের অধীনে কাজ করেন। তাঁহার বিবরণে অনেক রাজকাহিনী ও সামাজিক তথ্য আছে।

মোগলযুগের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনের চিত্র সুদক্ষ পর্যবেক্ষক ও শিল্পীর মত আঁকিয়াছেন ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের। তাঁহাদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য ও সত্যবাদিতার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। মোগলদের রাজস্ব-ব্যবস্থা, দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা, খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ, রীতিনীতি, সংস্কার প্রথা, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, শহরনগরের বাড়ীঘরের অবস্থা পর্যন্ত কোন বিষয়ই বার্নিয়ে ও তাভার্নিয়েরের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বার্নিয়ের শাহজাহানের পুত্রদের (ঔরঙ্গজীব-সহ) চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আমীর-ওমরাহদের বিলাস-ব্যসনের কথা বলিয়াছেন, প্রজাদের দুঃখদুর্দশা, শহরের বাজারহাট ঘরবাড়ী ও বাণিজ্যের বিবরণ দিয়াছেন। অর্থনীতিক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে সম্রাটের অধিকার সম্বন্ধে বার্নিয়ের বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া কার্ল মার্ক্সের মতো মনীষীও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলির কথা, দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি শহরের কথা এমনকি খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা পর্যন্ত বার্নিয়ের তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বার্নিয়ের বলিয়াছেন যে সম্রাট যদি সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক না হইতেন, ব্যক্তিগত মালিকানা যদি স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের আরও অনেক আর্থিক উন্নতি হইত। অর্থাৎ দেশের ধনসঞ্চয় ও মূলধন বাড়িত এবং তাহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীন বিকাশ হইত। সাধারণ কৃষকদের অকথ্য অত্যাচার, অবিচার, শোষণের কথাও তিনি নির্ভয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে সেনাবাহিনী, মনসবদারী ও রাজদরবারের জাঁকজমকের ব্যয়ভার বহন করিয়াই হিন্দুস্থান সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বাজার প্রসঙ্গে বার্নিয়ে বলিয়াছেন যে যতরকমের ভণ্ড, বুজরুক, হাতুড়ে বৈদ্য, জাদুকর, গণৎকার সব বাজারে আসিয়া ভিড় করে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। একজন পোর্তুগীজ গণৎকারের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এ কথাও বলিয়াছেন যে রাজা-বাদশাহরা সকলে জ্যোতিষী, গ্রহাচার্য ও গণৎকারদের সর্বপ্রকারে পোষকতা করেন।

দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি শহরে রাজপ্রাসাদ, কেল্লা আর সমাধি ছিল ইট পাথরের বড় বড় ইমারত, বাকি অধিকাংশই মাটি ও খড়ের চালাঘর। এইজন্য ঘন ঘন এইসব শহরের ঘরে আগুন লাগিত এবং শহর জুড়িয়া আগুন জ্বলিতে থাকিত।

কারখানা ও কারিগর প্রসঙ্গে বার্নিয়ের বলিয়াছেন যে বড় বড় হলঘরে ছিল কারখানা প্রতিষ্ঠিত। সূচিশিল্পী, স্বর্ণকার, মণিকার, চর্মকার, দরজী, সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন কারিগররা, বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে। ওস্তাদ ও

দারোগারা তাহা পর্যবেক্ষণ করেন। সকালে উঠিয়া কারিগররা কারখানায় কাজ করিতে যায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসে। একই কারুশিল্প হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কারিগররা বংশানুক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকে। বার্নিয়ের এই বিবরণ হইতে বোঝা যায়, হিন্দুসমাজের পেশাগত বর্ণভেদ ও জাতিভেদ মুসলমান সমাজেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি সমাজ-জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়া মোগলযুগের সমাজচরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

QUESTIONS

1. Give a brief account of the Mughal administrative system.

2. Bring out the strong and weak points of Mughal administration.

3. Write what you know of the social and economic life of the people of India under the Mughal rule.

4. Describe the condition of India in the 17th century as derived from the accounts of the foreign travellers.

5. Give a brief account of the development of Art and Architecture in the Mughal Period.

6. What was the contribution of the Mughals to the development of vernacular literature ?

7. Write notes on
   (a) Rajput painting
   (b) Mughal painting

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইউরোপীয়দের আগমন

এতদিন ভারতে বিদেশী জাতিরা রাজ্যলোভে অভিযান করিয়াছে উত্তরপশ্চিমের স্থলপথে। গ্রীক পারসী শক পহ্লব হুন পাঠান মোগল প্রত্যেকেই উত্তরের স্থলপথ দিয়া ভারতে আসিয়াছে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে এই ধারার পরিবর্তন হইল। স্থলপথের বদলে ভারতে তাহাদের আগমন ঘটিল সমুদ্রপথে এবং ঠিক সাম্রাজ্য দখলের কোন উদ্দেশ্য লইয়া না আসিয়াও ঘটনাচক্রে বাণিজ্য ও কূটনীতির সুড়ঙ্গপথে প্রায় বিনা যুদ্ধেই তাহাদের মধ্যে ইংরেজ বণিকেরা এদেশের রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হইল এই সময় হইতে।

ভাস্কো ডা গামা। ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ আধিপত্য

দক্ষিণভারতের চোল রাজারা সমুদ্রপথের গুরুত্ব সম্বন্ধে খুবই সজাগ ছিলেন। উত্তর ভারতের তো নয়ই, দক্ষিণভারতেরও আর কোন রাজার চোলদের মতো সমুদ্রবোধ ছিল না। চোলরাজশক্তির পতনের পর বঙ্গোপসাগরে ও ভারতমহাসাগরে ভারতের প্রভুত্ব খর্ব হয় এবং পঞ্চদশ শতকে আরব বণিকরা এই সমুদ্রপথে আধিপত্য বিস্তার করেন। আঞ্চলিক ভারতীয় শাসকদের মধ্যে কালিকটের জামোরিনরা ও গুজরাটের সুলতানরা কিছু কিছু নৌবলের সাহায্যে লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরের সহিত

CHAPTER XXV—(1) Foreign trading companies in India. The English at the west coast, Coromondel and Bengal.

(2) Bengal after Aurangzeb's death. Alivardi and Bargi invasion, growth of Calcutta.

(3) Anglo-French rivalry. Clive and Dupleix.

(4) Political revolutions in Bengal between 1757 and 1760, Quarrel with Mir Kasim over private trade. Buxar. Clive's second period of Governorship—his political settlements—Diwani—its implications.

বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, কিন্তু এই নৌবলের সহিত ভারতের সমুদ্রপথের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই সময় সমুদ্রপথে ভারতের দিকে ইউরোপীয়রা যাত্রা করেন।

আফ্রিকার অন্তরীপ (Cape) ঘুরিয়া পথ আবিষ্কারের কৃতিত্ব পর্তুগালের প্রিন্স হেনরীর প্রাপ্য। এই কীর্তির জন্য তিনি ইতিহাসে Henry the Navigator বলিয়া পরিচিত। হেনরীর মৃত্যু হয় ১৪৬৩ সনে, কিন্তু তাঁহার সাহস দেশবাসীকে উৎসাহিত করে। ১৪৮৭ সনে বার্থোলোমিউ দিয়াজ প্রথম অন্তরীপ ঘুরিয়া পথটি আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার নাম দেন 'ঝঞ্ঝাট অন্তরীপ'। রাজা জন এই নামে খুশী হন নাই, কারণ ইণ্ডিজের নূতন পথ আবিষ্কারের উত্তম আশায় তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এই আশার জন্য অন্তরীপের নাম দেওয়া হইল 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (Cape of Good Hope)।

অবশেষে তাঁহার আশা সফল হইল। সমস্ত খোঁজখবর সংগ্রহ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে লিসবন হইতে তাঁহার পোত ও লোকজন লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার তিনটি ছোট ছোট পোত ছিল, কোনটিই ১২০ টনের বেশী নহে। সঙ্গে লোক ছিল ১৬০ জন। বহু দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের ভিতর দিয়া অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে কালিকটের কূলে আসিয়া পৌঁছান। সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে তাঁহার প্রায় দশ মাস সময় লাগিয়াছিল। কালিকটের রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কিসের জন্য তুমি এসেছ?" ভাস্কো-ডা-গামা দুর্বোধ্য ভাষায় কোনরকমে বুঝাইয়া বলেন, "খ্রীষ্টান ও মশলাপাতি।" অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের ঘাঁটি ও বাণিজ্যের ঘাঁটি দুইই স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ নাবিক বণিক ভাস্কো ডা গামা এদেশে আসিয়াছিলেন, একথা তিনি কালিকটের রাজাকে বুঝাইয়া বলেন।

ডাচ-পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রায় একশত বছর ভারতের সমুদ্রপথে পর্তুগীজদের এই আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কোন নূতন শক্তির স্পর্ধা হয় নাই তাহা 'চ্যালেঞ্জ' করিবার। কিন্তু সমুদ্রপথে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে, ডাচ ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের

ভাস্কো ডি গামার সমুদ্রযাত্রা
প্রাচীন বাণিজ্যপথ
রা শি য়া
পর্তুগাল
জেনোয়া
ভেনিস
কনস্টান্টিনোপল
আলেপ্পো
বাগদাদ
পা র স্য
মিশর
ওরমুজ
সমরকন্দ
পিকিং
চী ন দে শ
ব ঙ্গ
সুরাট
বোম্বাই
গোয়া
কালিকট
মাদ্রাজ
সিংহল
মালাক্কা
উত্তমাশা অন্তরীপ
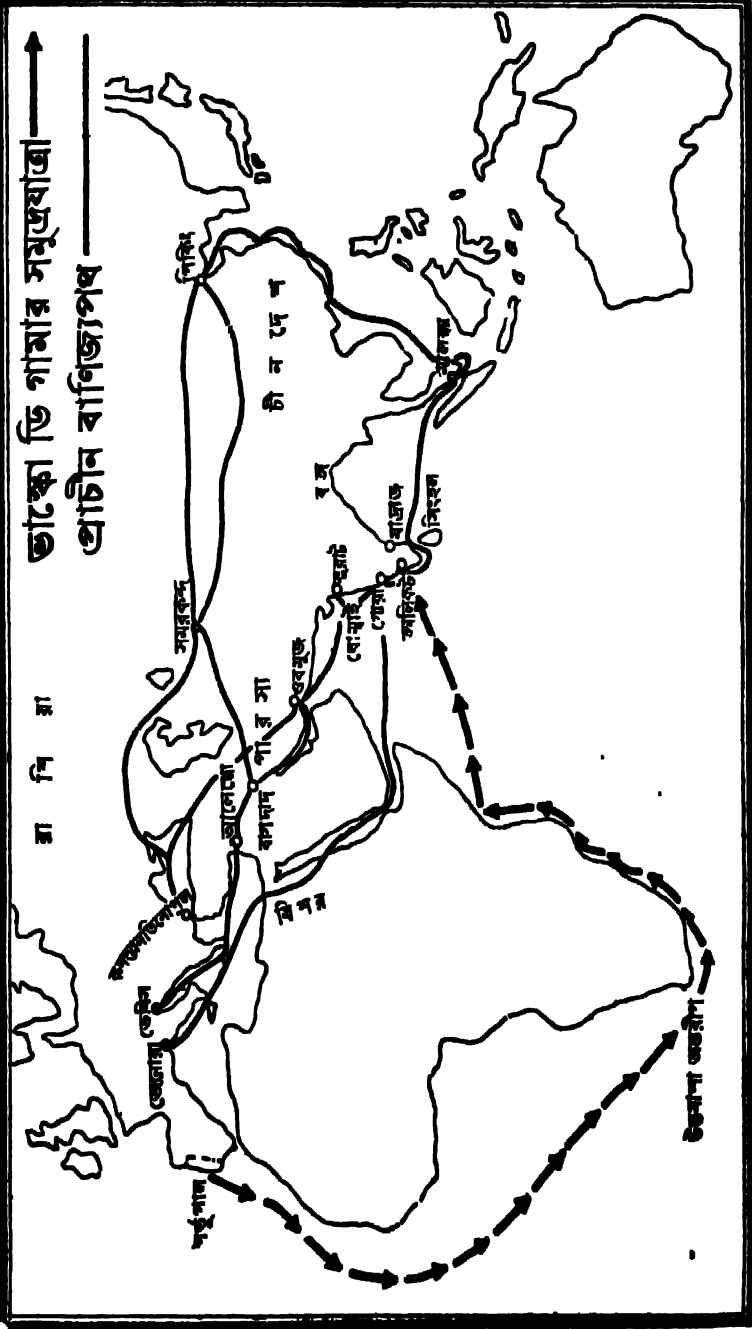
একে একে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পর্তুগীজদের নিরুপদ্রব শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। নৌশক্তির দিক দিয়া একটি সত্য তখন প্রকট হইয়া ওঠে—অতলান্তিক মহাসাগর যাহার আয়ত্তে থাকিবে ভারত মহাসাগরও তাহার অধীন হইবে। অর্থাৎ ইউরোপে যাহার নৌবল প্রবল হইবে ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। স্পেনের নৌশক্তির অহংকার চূর্ণ হইবার পর ইউরোপীয়রা বিশেষ করিয়া ডাচ ও ইংরেজরা বুঝিতে পারেন যে ভারতের সমুদ্রে পোর্তুগীজদের নৌবল প্রতিরোধ করা কঠিন ব্যাপার নহে।

চারটি পোত লইয়া ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ডাচ নৌবহর পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে। পোর্তুগীজদের প্রবল বাধা সত্বেও ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করিতে সক্ষম হন। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা দখল করিয়া তাঁহারা ভারতসমুদ্রের পথ মুক্ত করেন। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বো ডাচরা দখল করেন এবং ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মালাবার উপকূলের অনেক ছোট ছোট বসতি তাহাদের করতলগত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে পোর্তুগীজদের আধিপত্য খর্ব হয় এবং এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সিংহল ডাচদের হস্তগত হইবার পর পর্তুগীজদের রাজনীতিক ক্ষমতাও প্রায় লোপ পাইয়া যায়।

ইংরেজদের আগমন

এখন জানা গিয়াছে যে ফাদার টমাস ষ্টিভেন্স নামে একজন জেসুইট মিশনারী ইংরেজদের মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষে গোয়াতে আসেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। মহারাণী এলিজাবেথের কাছ হইতে বাদশাহ আকবরকে লিখিত একখানি পত্র লইয়া র‍্যালফ ফিচ ও আরও দুইজন ইংরেজ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার কাছে ফতেপুর সিক্রীতে আসেন। প্রায় আট বছর বাহিরে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব দেশের অনেক খবর সংগ্রহ করিয়া ফিচ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রদূতদের মধ্যে র‍্যালফ ফিচ অন্যতম। তাঁহার ইংলণ্ডে ফিরিবার নয় বছর পরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের অনুমতি লইয়া কয়েক জন উদ্যোগী ইংরেজ বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম হকিন্স কোম্পানীর তরফ হইতে বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার জন্য ভারতে সম্রাট

জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। সুরাটে একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের এবং পশ্চিম উপকূলে প্রয়োজনবোধে তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তারের অনুমতি তিনি পান। পরে (১৬১৫) দ্বিতীয়-জেমসের দূতরূপে আসিয়া টমাস রো কুঠির কর্মচারীদের জন্য আরও সুযোগ সুবিধা আদায় করেন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডে নামে একজন সাধারণ ইংরেজ ফ্যাক্টর (ফ্যাক্টরীর বা কুঠির সাধারণ কর্মচারীকে ফ্যাক্টর বলিত) পূর্ব উপকূলে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কুঠি স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতের মাদ্রাজ শহরের মূলকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। তাহার আগে ১৬১৬ সনে মসুলিপত্তনে একটি এবং ১৬২৬ সনে পুলিকটের উত্তরে একটি কুঠি স্থাপন করা হয়। মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের কুঠি করমণ্ডল উপকূলে কোম্পানীর প্রধান ঘাটি হইয়া ওঠে। এদিকে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের কাছ হইতে বিবাহসূত্রে বোম্বাই শহরটি উপহার পান (১৬৬০)। সুরাট হইতে বোম্বাইতে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় (১৬৮৭)।

মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর পর ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির আর-একজন দূরদর্শী কর্মচারী জোব চার্ণক হুগলী নদীর পূর্বতীরে সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করিয়া কলিকাতা মহানগরের গোড়া পত্তন করেন (১৬৯০)। ইহার মধ্যে মহা-নদীর বদ্বীপে হরিহরপুরে হুগলী পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপন করিয়া ইংরেজরা আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগরেও নৌশক্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সমুদ্র-কূলে ইংরেজরা নৌবলে প্রবল শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। ক্রমে কুঠির সহিত দুর্গ স্থাপন করিয়া তাঁহারা সামরিক শক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হন। ইহার পর আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন।

ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দেখা যায় যে অনরেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (সম্পূর্ণ title হইল "The Governor and Company of Merchants of London Trading to the East Indies") ভারতসমুদ্রপথে সর্বত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছেন এবং অন্যান্য প্রতিস্পর্ধী শক্তিগুলিকে পরাজিত

করিয়া নৌবলের আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছেন। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এই সময় দেখা দিলেন ফরাসীরা। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনাল রিচলিউ বুরবন দ্বীপ দখল করিয়া ভারত-সমুদ্রে ফরাসী ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ফরাসীরা করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরি এবং ১৬৮৮ সনে হুগলী নদীর ধারে চন্দননগর অধিকার করিয়া মাদ্রাজে ও বাংলাদেশে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠেন। অবশ্য সেজন্য প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় নাই। ১৭২৫ সনে দুমা নামে (Benoit Dumas) একজন কর্মিতকর্মা ফরাসী শাসক পণ্ডিচেরিতে আসেন এবং ১৭৪২ সনে আসেন আরও একজন সুযোগ্য ফরাসী নায়ক জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপলে (Joseph Francois Dupleix)। দুপলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন এবং বৃহৎ পরিকল্পনা ফাঁদিতে তৎপরও ছিলেন খুব। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্যের রঙিন স্বপ্নে তিনি বিভোর হইয়া গেলেন। ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষও অনিবার্য হইয়া উঠিল।

ইংরেজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ, ফরাসীদের পণ্ডিচেরি, কাজেই বিরোধের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়া ওঠে **কর্ণাটক**। করমণ্ডল উপকূল ও তাহার পাশাপাশি অঞ্চলের নাম কর্ণাটক। আর্কট হইল কর্ণাটকের রাজধানী, তাই কর্ণাটকের শাসক বা নবাবকে আর্কটের নবাবও বলিত। কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের (১৭৪৬-৪৮) ফল হইল এই : (১) দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন একথা ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই বুঝিয়াছিলেন ; (২) ইউরোপীয় সৈন্যদের কাছে ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধবিদ্যায় যে অনেক অগ্রসর, ইহাও তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল ; (৩) ভারতের ঘরোয়া রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বে পক্ষপাতিত্ব করিলে যে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল হইতে পারে, ইহাও তাঁহাদের কাছে পরিষ্কার বোধগম্য হইয়াছিল ; (৪) এই যুদ্ধে তাঁহারা আভাসও পাইয়াছিলেন যে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে ভাঙন ধরিয়াছে। এই কারণে কর্ণাটকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে এই প্রথম সংঘর্ষের বাহ্যত বিশেষ কোন গুরুত্ব না থাকিলেও, একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কর্নাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪) আরম্ভ হয় ঘরোয়া রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বে পক্ষপাতিত্ব হইতে। ডুপ্লে মাদ্রাজ শহর ইংরেজদের প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হন নাই। নূতন করিয়া তিনি ইংরেজদের সহিত বিরোধ বাধাইবার অজুহাত খুঁজিতেছিলেন। অজুহাত মিলিয়া গেল হায়দারাবাদ ও কর্নাটকের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারদের লইয়া। হায়দারাবাদের জন্য মুজফ্ফর জঙ্গ ও কর্নাটকের জন্য চাঁদা সাহেবের পক্ষে ফরাসীরা এবং যথাক্রমে নাজীর জঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষে ইংরেজরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চাঁদা সাহেব

আর্কটের নবাব হন এবং নাজীর জঙ্গ আততায়ীর হাতে নিহত হইলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ হায়দারাবাদের গদিতে বসেন। এই সময় একজন দূরদর্শী সাহসী ইংরেজ মাদ্রাজের গবর্ণর হইয়া আসেন, তাঁহার নাম সণ্ডার্স (Saunders)। তিনি ত্রিচিনপল্লীতে আশ্রিত মহম্মদ আলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হন। সণ্ডার্সের কৃতিত্ব হইল তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রার জন্য রবার্ট ক্লাইভকে (Robert Clive) খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ক্লাইভের বয়স তখন ২৬ বছর। প্রথমে তিনি মাদ্রাজকুঠির একজন সামান্য 'ফ্যাক্টর' বা কেরানী ছিলেন, পরে মেজর লরেন্সের অধীনে যে ইংরেজ সেনাদল গঠিত হয় তাহাতে তিনি যোগদান করেন। চাঁদা সাহেবের কর্নাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করিয়া ক্লাইভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উদ্‌যোগপর্বে অপ্রত্যাশিত গৌরব অর্জন করিয়াছেন। মাত্র ২০০ ইউরোপীয় ও ৩০০ এদেশী সিপাহী লইয়া ক্লাইভ আর্কট অধিকার করেন। নবাবের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ৫৩ দিন ধরিয়া তিনি আর্কট রক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ৪৫ জন ইউরোপীয় ও ৩০ জন সিপাহী নিহত হয়। ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য জয়ের পথ ক্লাইভ অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়া দেন। দ্বিতীয় কর্নাটক যুদ্ধে ইংরেজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের বিপর্যয় এই পথ সুগম করিয়া দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ

মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর ভারতের প্রায় সর্বত্র যখন রাজনীতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছিল, তখন ঘটনাক্রমে বাংলাদেশের অপ্রত্যাশিত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় ছিল দুইজন কৃতকর্মা সুশাসকের জন্য—একজন **মুর্শিদকুলি খাঁ** ১৭০০-১৭২৭, আর একজন **আলিবর্দি খাঁ** ১৭৪০-৫৬। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) যদি বাংলার নবাবী আমল শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে একথা বলা যায় যে দীপ নিভিবার আগে একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। দেওয়ান ও নবাব মুর্শিদকুলি কেবল যে তাঁহার নামে নূতন **মুর্শিদাবাদ** রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, নূতন জমিদারী ব্যবস্থা ও রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলির রাজস্বব্যবস্থাই পরে ইংরেজ শাসকরা গ্রহণ করেন এবং তাহাই ঢালিয়া সাজিয়া **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** প্রবর্তিত হয়।
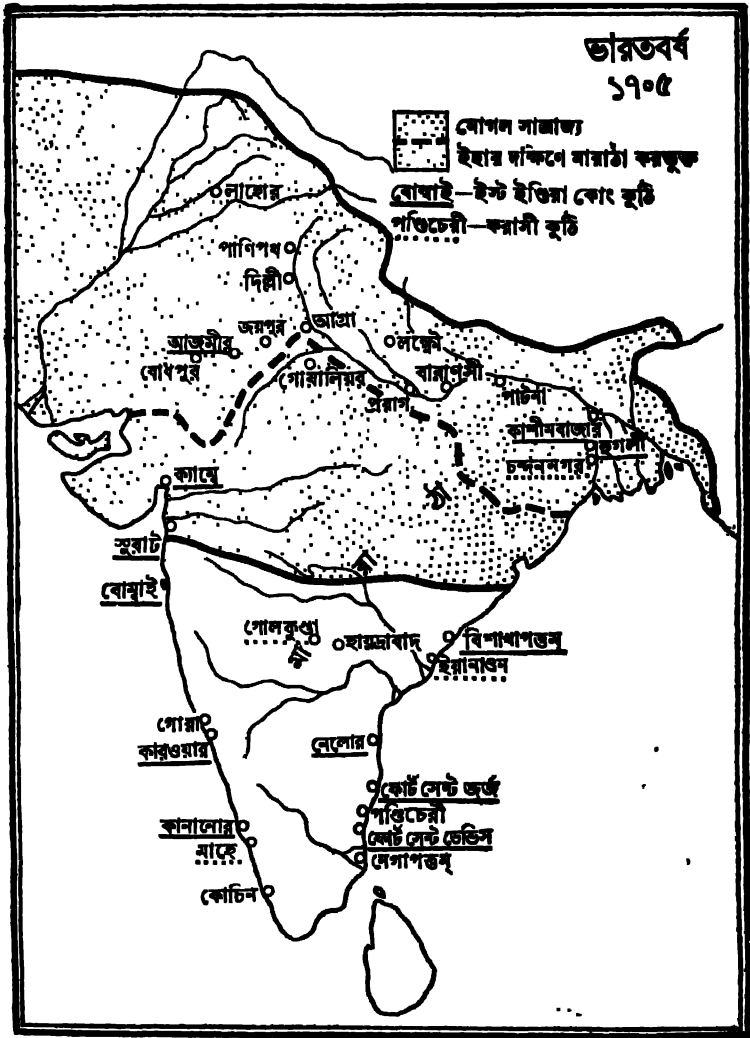
আলিবর্দির আসল নাম মির্জা বান্দা, পুরা নাম মির্জা মহম্মদ আলি। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ যখন সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন আলিবর্দি বিহারের নায়েব-নাজিম বা Deputy Governor নিযুক্ত হন। **সরফরাজ খাঁ** তখন বাংলাদেশের নবাব। সরফরাজ ছিলেন দুর্বল চরিত্রের শাসক। বাংলার নবাবের এই চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আলিবর্দি মুর্শিদাবাদের মসনদ

দখলের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। **গিরিয়ার যুদ্ধে** (এপ্রিল ১৭৪০) নবাবের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়, সরফরাজ নিজেও নিহত হন। আলিবর্দি বাংলার নবাবপদে মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ১৪ বছর তাঁহার শাসনকালে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মুর্শিদের আমলের শাসনব্যবস্থা আরও কার্যকর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় বাংলার শান্তিভঙ্গ করে মারাঠা লুণ্ঠনকারীরা এবং আলিবর্দির জীবনেব অধিকাংশ সময় এই মারাঠাদের দমন করিতে কাটিয়া যায়।

বর্গীর হাঙ্গামা ১৭৪২-১৭৫১

মারাঠা লুঠেরাদেব 'বর্গী' বলা হইত। এইজন্য মারাঠাদের লুণ্ঠনাভিযান এদেশে 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলিয়া পরিচিত। ১৭৪২ সন হইতে মারাঠা বর্গীদের ক্রমাগত অভিযান আরম্ভ হয় বাংলাদেশে। বর্ধমান, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মারাঠাসৈন্যের সহিত নবাবসৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় একাধিকবার। উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম রুস্তম জঙ নানাকাবণে আলিবর্দির প্রতি প্রীত ছিলেন না, আলিবর্দিব উড়িষ্যা জয়ের প্রচেষ্টাও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার সহযোগী **মীর হবিব** বিশ্বাসঘাতকতা কবিয়া প্রকাশ্যে মারাঠা বর্গীদের সহিত হাত মেলান। মারাঠা নায়ক **ভাস্কর পণ্ডিত** লুটতরাজ কবিয়া নাগপুবে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হবিব তাঁহাকে বাংলার ধনসম্পদ ও সিংহাসনের লোভ দেখাইযা অভিযান চালাইতে বলেন। হবিবের সহযোগিতায় মারাঠারা বাংলার বহু গ্রাম ও নগব লুট করিয়া, ধ্বংস করিযা ত্রাসের সঞ্চাব করে, এমন কি রাজধানী মুর্শিদাবাদেব শহরতলীতে পর্যন্ত হানা দেয়। বর্ধমানের মহাবাজার সভাপণ্ডিত **বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার** ও **গঙ্গারাম** মাবাঠা বর্গীদের এই ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গারামের কাহিনীকাব্য **মহারাষ্ট্র পুরাণ** এই বিবরণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৪৩ সনে রঘুজী ভোঁসলে নিজে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। আলিবর্দি তাঁহাকে ২২ লক্ষ টাকা দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া নেন যে মারাঠারা আর এদিকে হানা দিবে না। কিন্তু মারাঠারা অঙ্গীকার পালন না করিয়া আবার ১৭৪৪ সনে অভিযান করে।

১৭৫০ সন পর্যন্ত এই অভিযান চলিতে থাকে। অবশেষে ১৭৫১ সনের মে মাসে আলিবর্দি মারাঠাদের সহিত শান্তিচুক্তি করেন। মারাঠাদের বছরে ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিবার শর্তে চুক্তি হয়। বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত বাংলা দেশে স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। ১৭৫৬ সনে আলিবর্দির মৃত্যুর পর এক বছরের মধ্যেই প্রায় পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হইয়া ওঠেন ব্রিটিশ শাসকরা।

কলিকাতা শহরের বিকাশ

উড়িষ্যার বালাসোরে, বাংলার কাশিমবাজারে এবং বিহারের পাটনায় ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। কাশিমবাজার কুঠির একজন কর্মচারী ছিলেন **জোব চার্ণক**। চার্ণক হিজলি হুগলি উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান দখলের চেষ্টা করিয়া অবশেষে গঙ্গার পূর্বতীরে **সুতানুটি** গ্রামে (বর্তমান ষ্ট্র্যাণ্ড রোড অঞ্চলে গঙ্গাতীরে এই গ্রাম ছিল) একদিন দ্বিপ্রহরে অবতরণ করেন। সেখানেই নূতনকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়। সেই দিনটি হইল **২৪ আগস্ট ১৬৯০, রবিবার**। এই দিনটি কলিকাতা শহরের প্রতিষ্ঠার দিন। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা—এই তিনটি গ্রাম এবং গঙ্গার উভয়তীরে নূতন কুঠি হইতে আরও ৩৮টি গ্রামের জমিদার হইবার অধিকার পান **ইংরেজরা**। ১৬৯৮ সনের এই জমিদারী ও বাণিজ্যকেন্দ্র হইতেই ধীরে ধীরে এই বিশাল কলিকাতা মহানগরের বিকাশ হইয়াছে।

১৭০০ সনে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি বলিয়া ঘোষিত হয়, আগে মাদ্রাজ কুঠির যে প্রাধান্য ছিল তাহা আর থাকে না। বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় কলিকাতা। ইংরেজদের জমিদারী ও বাণিজ্যকর্ম কলিকাতা কেন্দ্র করিয়াই চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই লোকজনের সমাগম হইতে থাকে কলিকাতায়। ১৭০৪ সনে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫,০০০, কিন্তু ১৭৫০ সনের মধ্যে ইহা বাড়িয়া প্রায় একলক্ষে পৌছায়। বর্তমান কলিকাতায় অর্ধকোটি লোকের তুলনায় মনে হয় ইহা কিছুই নহে, কিন্তু দুই শতাধিক বছর আগেকার কলিকাতায় এই লোকসংখ্যা ভারতের যে-কোন বড় নগর ও রাজধানী অপেক্ষাও বেশী ছিল।

বাংলার রাজনীতি ১৭৫৭-৬০

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ আলিবর্দি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র ২৩ বছরের যুবক সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার মসনদে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গেলেন। আলিবর্দির তিন কন্যা ছিলেন, সিরাজ ছিলেন কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র। অন্য দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম, ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী; আর একজন ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার স্ত্রী। নবাবী মসনদের প্রতি ইঁহাদের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল, কাজেই সিরাজের মনোনয়নে ইঁহারা ঈর্ষান্বিত হইলেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ ও ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। এই স্বর্ণ সুযোগ সুচতুর ইংরেজরা ছাড়িবার পাত্র নন। প্রথম হইতেই তাঁহারা সিরাজের কর্তৃত্ব অবমাননা করিতে লাগিলেন এবং সিরাজবিরোধী চক্রান্তে গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িলেন।

দুর্গ পরিখা ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া ইংরেজরা কলিকাতার ঘাঁটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে প্রস্তুত হন। সিরাজের নিষেধাজ্ঞা তাঁহারা নির্বিবাদে অমান্য করেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিয়া (জুন ১৭৫৬) কুঠি ও দুর্গ দখল করেন, ইংরেজরা ফলতায় পলাইয়া যান। শতাধিক (১৪৬) ইংরেজকে বন্দী করিয়া একটি ছোট কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে নাকি দমবন্ধ হইয়া অনেকে মারা যায়। ইহাকে **অন্ধকূপ হত্যা** বলে। এই হত্যার কাহিনী অতিরঞ্জিত মিথ্যা কাহিনী, সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিবার জন্য প্রচারিত।

কলিকাতার দুঃসংবাদ পাইয়া ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে ওয়াটসনকে সঙ্গে লইয়া বাংলাদেশে উপস্থিত হন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে (১৭৫৭) কলিকাতা পুনরাধিকার করেন। এদিকে সিরাজের বিরুদ্ধে ঘরোয়া চক্রান্ত ক্রমে বেশ ঘনীভূত হইয়া ওঠে। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর মুর্শিদাবাদের অবাঙালী শেঠ-সম্প্রদায়ের জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে নিজদলভুক্ত করিয়া চক্রান্তের নায়ক হইয়া ওঠেন। কলিকাতার প্রতিপত্তিশালী অবাঙালী বণিক উমিচাঁদও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ক্লাইভ ইহাদের সহিত হাত মিলান। গোপন চুক্তিতে ঠিক হয় যে চক্রান্ত সফল হইলে উমিচাঁদ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য প্রচুর অর্থ পাইবেন, ক্লাইভ ও তাঁহার ইংরেজ কোম্পানি

অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা পাইয়া লাভবান হইবেন এবং মিরজাফর হইবেন বাংলার নবাব। সিরাজ এই ভয়ংকর আত্মঘাতি চক্রান্তের মধ্যে অসহায়ের মতো ইংরেজদের উদ্ধত আচরণ ও প্রকাশ্য শত্রুতা প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা পুনরধিকার করিবার পর সিরাজের সহিত ইংরেজদের যে চুক্তি হয় তাহাতে ইংরেজরা বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পান এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের ও নিজেদের সিক্কা মুদ্রা প্রচলনের অনুমতিও পান। কিন্তু ইহাতে ইংরেজরা নিশ্চিন্ত হন নাই এবং সিরাজও স্বস্তি পান নাই। মিরজাফরের সহিত ইংরেজদের চক্রান্ত পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে এবং শেষে কাশিমবাজার কুঠির অধিনায়ক উইলিয়ম ওয়াট্স অত্যন্ত গোপনে মিরজাফরের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া (৫ই জুন ১৭৫৭) সিরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধযাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। ১২ জুন ১৭৫৭ ওয়াট্স ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরা পূর্ব ব্যবস্থা মতো মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন। পরদিন (১৩ জুন) ক্লাইভ ৩০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৯ জুন কাটোয়া দুর্গের পতন হয়। ২২ জুন ক্লাইভ কাটোয়া হইতে গঙ্গা পার হইয়া অপর তীরে সসৈন্যে পলাশীতে মধ্যরাত্রে উপস্থিত হন। নবাবের সৈন্য আগেই পলাশীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্লাইভ যুদ্ধের জন্য তাহাদের সামনে উপস্থিত হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭

ক্লাইভ লক্ষবাগে (লক্ষ গাছের উদ্যান) শিবির স্থাপন করিলেন। নবাবের সেনাপতিদের মধ্যে মিরমদন মোহনলাল কাশ্মীরী, মিরজাফর, ইয়ার লতিফ খাঁ ও রায়দুর্লভ যে যাঁহার স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন। ২৩ জুন ১৭৫৭, বৃহস্পতিবার সকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মিরজাফর 'কোরান' হাতে করিয়া নবাবের কাছে শপথ করিয়াছিলেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া লড়াই করিবেন। কিন্তু মিরজাফর তাহা করেন নাই, বেইমানী করিয়াছিলেন। বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে মিরজাফরের এই বেইমানী চিরদিন একটি অতিকুৎসিত কলঙ্ক বলিয়া দেশবাসী মনে করিবে।
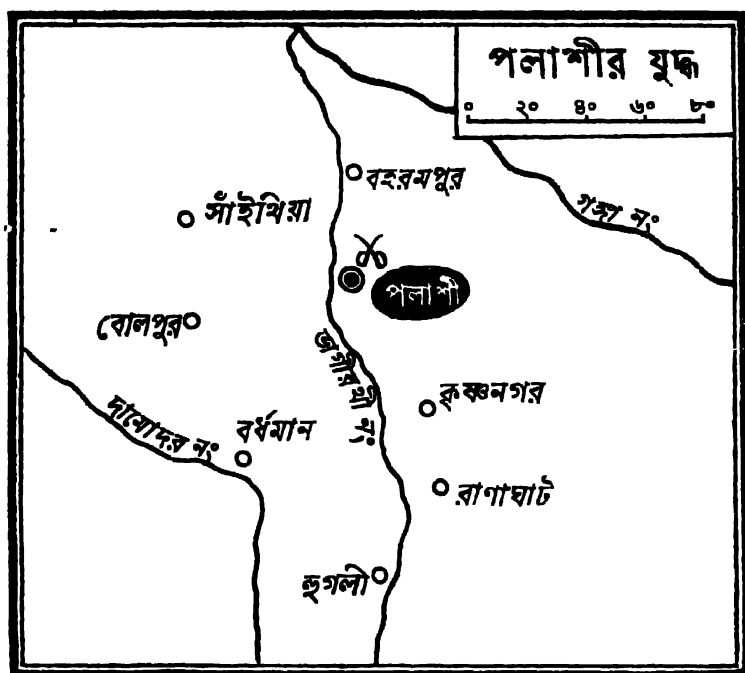
ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন : "On 23rd June, 1757, the Middle Ages of India ended and her modern age began." সর্দার পানিক্কর বলিয়াছেন—"Plassey unimportant as a battle, was politically important···" ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব এই যে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজরা মিরজাফরের সহিত পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী (৩ জুন ১৭৫৭) কলিকাতা ছাড়াও ২৪-পরগণার বিশাল জমিদারীর মালিক হন, কলিকাতায় সামরিক দুর্গ নির্মাণের অধিকার পান, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এই জাতীয় কোন অধিকার লাভ হইতে ফরাসীদের বঞ্চিত করেন এবং বাংলা-দেশের শাসকরা তাঁহাদের হাতে খেলার পুতুলমাত্র হইয়া ওঠেন। কলিকাতার যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর নবাব সিরাজদ্দৌলাও ইংরেজদের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চুক্তিতে কলিকাতায় একটি টাঁকশাল স্থাপন এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি গ্রামের জমিদারী দেওয়া ছাড়া আর কোন শর্তে তিনি আবদ্ধ হন নাই। মীরজাফরের চুক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী।

ইংরেজদের সামরিক দুর্গ নির্মাণের অধিকার দিয়া তিনি বাংলাদেশে মোগল-শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইংরাজদের খেসারত-ক্ষতিপূরণ, সামরিক সহযোগিতার জন্য অর্থসাহায্য ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি পরোক্ষে ইংরেজদের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া নিজে তাঁহাদের হাতে ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। এই অধিকার পাইবাব পব ইংরেজদের পক্ষে এদেশে জমিদারেব আসন হইতে রাজাব সিংহাসনে বসিতে বেশী দেরী হয় নাই। প্রথমে বণিক, পরে জমিদাব এবং শেষে ইংবেজবা বাজা হইয়াছিলেন।

মিরজাফর ১৭৫৭-৬০

২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশীব যুদ্ধ শেষ হয়, ২৮ জুন ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের মসনদে মিবজাফবকে নবাবরূপে প্রতিষ্ঠিত কবেন এবং তাহার চারদিন পরে মিবজাফবপুত্র মিরন সিবাজকে বন্দী করিয়া পাষণ্ডের মতো হত্যা করেন। ইতিহাসেব রঙ্গমঞ্চে একটি যুগেব যবনিকাপাত হয। সেই যুগটিকে মধ্যযুগ বা মুসলমান শাসকেব যুগ বলা যায।

হতভাগ্য মিরজাফর নবাব হইয়াও বেশীদিন সুখে থাকিতে পারিলেন না, অল্পদিনেব মধ্যেই বেইমানীব পুরস্কার পাইলেন। ইংরেজদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য তাঁহার মতো পুতুলের পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব হইল না। যাহারা দুর্বলচিত্ত ও বেইমান হয় তাদের পক্ষে বেইমানী করাটাই অভ্যাস হইয়া ওঠে। মিরজাফরও তাঁহাব প্রভু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছুদিনের মধ্যে গোপনে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং চুঁচুড়ার ডাচ বণিকদের সহিত হাত মিলাইলেন।, ক্লাইভ এই খবর পাইয়া বিদেরার যুদ্ধে ডাচদের পরাজিত করিলেন (১৭৫৯)। ১৭৬০ সনে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলে ভ্যানসিটার্ট হইলেন বাংলার গভর্ণর। মিবজাফর মসনদচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার জামাতা মিরকাশিম বাংলার নবাব হইলেন।

মিরকাসিম ১৭৬০-৬৪

মিরজাফর অপেক্ষা মিরকাশিম অনেক বেশী সজাগ ও সুদক্ষ নবাব ছিলেন। তাঁহার আমলে বাংলার রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ইংরেজদের ধারদেনাও তিনি অনেক পরিশোধ করেন। কিন্তু 'কলিকাতা কাউন্সিলের' ইংরেজ সদস্যরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, মিরজাফরের আমলে ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যের দিক দিয়া ইংরেজরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ

করিতেন তাহা মিরকাশিমের আমলে ভোগ করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য লইয়া বিরোধ

ইংরেজরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে এদেশে ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা করিয়াও নিজেরা ব্যক্তিগত ব্যবসা (private trade) করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জন করিতেন। কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে ইহা তাঁহাদের করিবার অধিকার ছিল না, ইহা অবৈধ ছিল। এদেশী গোমস্তা ও মহাজনরা অনেকে এই ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহিত যোগসাজস করিয়া অবৈধ বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজদের ক্ষমতার মর্যাদা এদেশের সাধারণ লোকের কাছে যথেষ্ট বাড়িয়াছিল, সুতরাং গ্রাম্য কারিগর ও কৃষকদের ধমক দিয়া, শাস্তির ভয় দেখাইয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে জুলুম করিয়া তাঁহারা যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে জিনিসপত্র আদায় করিতেন এবং তাহার জন্য নবাবকে কোন শুল্ক বা কর (duty, tax) না দিয়াই ব্যবসা চালাইয়া মুনাফা করিতেন। ইহার ফলে এদেশের বণিকদের খুব ক্ষতি হইতেছিল, কারণ তাঁহাদের বাণিজ্যের জন্য মোটা 'কর' দিতে হইত, অথচ ইংরেজদের বা তাঁহাদের গোমস্তাদের তাহা দিতে হইত না। মিরকাশিম ইংরেজদের এই অবৈধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য, দস্তকের (লাইসেন্স বা ছাড়পত্র) অপব্যবহার ও জুলুমনীতি বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন ইংরেজদের গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। নবাব মিরকাশিম গবর্ণরকে একটি পত্র লিখিয়া (১৭৬২) বিষয়টি জানাইলেন।

ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাঁহাদের এদেশী গোমস্তাদের জুলুম-জবরদস্তি যে কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল তাহা মিরকাশিম এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত চুক্তি করিলেন এই মর্মে যে বাহিরে জাহাজে করিয়া যে-সমস্ত পণ্য লেনদেন হইবে তাহার জন্য শুধু কোম্পানির দস্তকেই (ছাড়পত্র) কাজ হইবে। কিন্তু দেশের ভিতরে যে সব পণ্যের বাণিজ্য চলিবে (inland trade) তাহাতে শুধু কোম্পানির দস্তকে হইবে না, নবাবের দস্তকও দরকার হইবে। উপরন্তু তাহার জন্য ইংরেজদের শতকরা ৯% শুল্ক (duty) দিতে হইবে।

ভ্যান্সিটার্ট এই চুক্তিতে আপত্তি করিবার কোন সংগত কারণ খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের ইংরেজ সদস্যরা এই চুক্তি মানিতে

চাহিলেন না। তাঁহারা দাবী করিলেন যে ইংরেজ বণিকরা কোন শুল্ক দিবেন না, অবাধে ব্যবসা করিবেন। মিরকাশিম এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিলেন এদেশী ব্যবসায়ীদেরও শুল্কদানের বাধ্যতা হইতে মুক্তি দিয়া। অর্থাৎ তিনি এদেশী বণিকদেরও সমান সুযোগ করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংরেজরা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের স্পর্ধার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। দেশের নবাব দেশের লোককে কোন সুবিধা দিতে পারিবেন না, তাঁহার কোন কাজ করিবার অথবা আদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। এই অবস্থায় নবাব মিরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধ বাধিল।

বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪

পাটনাকুঠির বড়সাহেব এলিস হঠাৎ পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করেন। নবাব মিরকাশিমের রাজধানী তখন মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত। এলিসের হঠকারিতার জন্য উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। নবাবের সৈন্যরা পর পর কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে (১৭৬৩) হারিয়া যায়। ইংরেজরা নবাবের নূতন রাজধানী মুঙ্গের আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন, মিরকাশিম পাটনায় চলিয়া আসেন। তারপর অযোধ্যায় চলিয়া যান। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তিনি যুদ্ধে টানিয়া আনেন। বক্সারের প্রচণ্ড যুদ্ধে সুজাউদ্দৌল্লা সম্পূর্ণ পরাজিত হন (১৭৬৪)। এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন হেকটর মানরো (Hector Munro)। অযোধ্যা বিধ্বস্ত হয়। সম্রাট শাহ আলম ভয় পাইয়া ইংরেজপক্ষে যোগ দেন। অসহায় মিরকাশিম পলাতকের মতো স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। অবশেষে চরম দুর্দশার মধ্যে ১৭৭৭ সনে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মিরকাশিম দেখিয়া যান—ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড পরিষ্কার রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে। নবাবী আমল শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভ ১৭৬৫

মিরজাফরকে আবার বাংলার নবাব করা হইল বটে, কিন্তু মিরকাশিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধে তখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে ইংরেজের ছায়ারূপে থাকা ছাড়া নবাবের আর কিছু করিবার অধিকার নাই। বক্সার যুদ্ধের কয়েকমাস

পরে (মে ১৭৬৫) ক্লাইভ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসেন। আসিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন, যে, "tomorrow the whole of Mogul power will be in our grasp"—"পরদিনই সমস্ত মোগল রাজশক্তি আমাদের করতলগত হইবে।" তাহাই হইল। তিনমাসের মধ্যেই (আগস্ট ১৭৬৫) সম্রাট শাহ আলমের কাছ হইতে ক্লাইভ একটি নূতন ফরমান আদায় করিলেন, তাহাতে মোগল সম্রাট কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী দিলেন। অর্থাৎ ইংরেজরা এই তিনটি প্রদেশের দেওয়ান হইলেন। বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিল্লীর সম্রাটকে দিলেই তাঁহাদেব আর কোন দায় থাকিবেনা—এই শর্তে তাঁহারা দেওয়ানী পাইলেন। বাংলার নবাব 'নাজিম' রহিলেন বটে, কিন্তু নূতন দেওয়ানের রাজত্বে তাঁহাকে একজন বৃত্তিভোগী অসহায় দর্শকে পরিণত করা হইল। ইংরেজ 'দেওযান' কাগত সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন।

'দেওযান' ও 'নাজিম' এই দুই রাজপদের সংশ্লিষ্ট ইতিহাসটুকু না জানিলে ইংরেজের দেওয়ানী-লাভেব তাৎপয বোঝা যাইবে না। দেওয়ানের পদ আকবর সৃষ্টি কবেন ১৫৭৯ সনে। বর্তমানে অর্থমন্ত্রীর (Finance Minister) ও রাজস্বমন্ত্রীর (Revenue Minister) যে দায়িত্ব তখন দেওয়ানেবও সেই দায়িত্ব ছিল। 'নাজিম' ছিলেন প্রকৃত শাসক, শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব তাঁহাব উপর থাকিত। প্রকৃতপক্ষে দেওযান ছিলেন নাজিমের অধীন কর্মচারী। রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্যের দস্তক বা লাইসেন্স ইত্যাদি মঞ্জুর করাব ক্ষমতা ছিল দেওয়ানের। নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে ক্ষমতাব বিরোধ হইত, সম্রাট মধ্যস্থতা করিয়া তাহা মিটাইয়া দিতেন। অবশেষে মুর্শিদকুলি খাঁ নাজিম ও দেওয়ানের উভয় পদে যখন নিযুক্ত হন (১৭০৪), তখন এই বিরোধের অবসান হইয়া যায়, কিন্তু শাসন ব্যাপার বেশ জটিল হইয়া ওঠে। নায়েব-নাজিম ও নায়েব-দেওয়ান (অর্থাৎ নাজিম ও দেওয়ানের ডেপুটি বা সহকারী) পদেরও সৃষ্টি হয় এই সময়।

'১৭৬৫ সনে ইংরেজরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হন, অর্থাৎ তাঁহাদের উপর কেবল রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কোন শাসনক্ষমতা দেওয়া হয় না। দেওয়ানের কোন শাসনক্ষমতা কোনদিনই ছিল না। পূর্বপ্রথা অনুযায়ী যথারীতি শাসনের দায়িত্ব রহিল নাজিমের উপর। কিন্তু নাজিম যে সেই সময় ক্ষমতার দিক হইতে অপদার্থতার কোন স্তরে পৌছিয়াছিলেন

এবং ইংরেজরাই বা তাঁহাকে কি চোখে দেখিতেন তাহা মিরজাফর-মিরকাশিমের নবাবত্বের প্রহসন হইতেই বোঝা যায়। নূতন ব্যবস্থায় দুইজন নায়েব-নাজিম হইলেন—বাংলায় রেজা খাঁ, বিহারে সিতাব রায়। নাজিম নজমউদ্দৌলা আলস্যে দিন কাটাইতেন, নায়েব-নাজিমরা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন ইংরেজদের আঙ্গুলিহেলনে। ক্লাইভ শাসনের ও রাজস্ব আদায়ের কোন দায়িত্বই সরাসরি গ্রহণ করেন নাই, অন্তরালে থাকিয়া চাবিকাঠি নাড়িয়াছেন মাত্র। নায়েব-নাজিমরাই তাঁহাদের পক্ষে দেওয়ানের কাজ করিয়াছেন।

ক্লাইভের এই শাসননীতিকে দ্বৈতশাসন (double government) বলা হয়। তিনি নিজেই ইহাকে মুখোস-অভিনয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল— নিজেদের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নাই, অথচ ফলটুকু ভোগ করিবার অধিকার আছে। দেওয়ানী পাইবার পর ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসকই হইলেন, কিন্তু সামনে শিখণ্ডীরূপে রাখিলেন নাজিম ও তাঁহার নায়েবদের। দেশের লোকের কাছেও ইংরেজদের এই শিখণ্ডী-শাসন ক্রমে গা-সহা হইয়া গেল, তাহারা বুঝিতে পারিল নাজিম নামেই নাজিম, আসল নাজিম ও শাসক নূতন ইংরেজ দেওয়ান।'

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আগে কলিকাতা (১৬৯৮), ২৪-পরগণা (১৭৫৭) এবং বর্ধমান মেদিনীপুর-চট্টগ্রাম (১৭৬০) অঞ্চল লাভ করিয়াছিলেন নিজেদের জমিদারীরূপে। ইহার জন্য তাঁহাদের কোন নির্দিষ্ট রাজস্ব সম্রাটকে দিতে হইত না। কিন্তু ১৭৬৫ সনে তাঁহারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে দেওয়ানী পাইলেন তাহার সহিত পূর্বের এই জমিদারী লাভের পার্থক্য আছে। দেওয়ান একটি রাজপদ, সম্রাট সেই পদে তাঁহাদের নিযুক্ত করিলেন। সম্রাট শাহ আলম নিজেও তখন জানিতেন যে নাজিমের কোন ক্ষমতা নাই, নূতন দেওয়ানের কাছে থাকিবেও না। তাহা সত্ত্বেও কোম্পানীকে দেওয়ান করার-অর্থ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনক্ষমতা পরোক্ষে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করা। এদেশের শাসক হইবার পথে ইংরেজরা তিনটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—প্রথমটি বণিকের, দ্বিতীয়টি জমিদারের, তৃতীয়টি দেওয়ানের। দেওয়ান হইতে নাজিম বা শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই।

QUESTIONS

1. Give a brief account of the Anglo-French rivalry in India in the second half of the 18th century.

2. Give a brief account of the political changes in Bengal between 1757 and 1760.

3. Briefly describe the career and achievements of Robert Clive.

4. Write what you know about British relations with Mir-Jafar and Mir Kasim.

5. Write short notes on:

   (a) Battle of Plassey

   (b) Battle of Buxur

   (c) Dual Government of Clive

   (d) The grant of Dewani, 1765

ষড়বিংশ অধ্যায়

ওয়ারেন হেস্টিংস

ক্লাইভ ও তাঁহার অনুচরদের নির্বিবেক শোষণনীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে বাংলাদেশে ভয়াবহ ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খ্রীঃ, ১১৭৬ বাংলা সন) মন্বন্তর দেখা দেয়। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোনকালে—এমন কি হুন তোড়মান অথবা মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালেও—কোন প্রদেশের লোক এত নির্যাতন সহ্য করে নাই যাহা ক্লাইভের আমলে বাংলাদেশের লোক করিয়াছিল। ১৭৭৪ সনে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। এই বছরেই ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর-জেনারেল হন। তাহার দুই বছর আগে ১৭৭২ সনে হেস্টিংস বাংলার গবর্নর নিযুক্ত হইয়া আসেন। হেস্টিংসের আমল হইতে কোম্পানির শাসনের এক নূতন পর্ব শুরু হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন তখন ভারতবর্ষে দুইটি স্বাধীন রাজশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—**মারাঠা রাজশক্তি** ও হায়দার আলির অধীনে **মহীশূর রাজশক্তি**। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠাদের চরম বিপর্যয় হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল মারাঠারা বোধ হয় আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। কিন্তু বালাজী বাজী রাওয়ের পুত্র পেশওয়া প্রথম মাধব রাওএর নেতৃত্বে (১৭৬১-৭২) মারাঠাশক্তির যে পুনরুজ্জীবন হয় তাহা বিস্ময়কর। উত্তরভারতের মালয়, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্য পুনরধিকার করিয়া মারাঠা সৈন্যরা দিল্লী পর্যন্ত দখল করে এবং ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী পলাতক (এলাহাবাদে) মোগল সম্রাট দ্বিতীয়

CHAPTER XXVI : (I) Warren Hastings Struggle with Haidar Ali and Tipu Sultan upto Treaty of Mangalore. Struggle with the Marathas in the North upto the Treaty of Salbai. Administrative and revenue measures of Warren Hastings. His patronage of oriental literature.

Attempts by British Parliament to control the Company's policy. North's Regulating Act and Pitt's India Act.

শাহ্ আলমকে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৭৭২ সনে মারাঠাশক্তির দিল্লীর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ভারতের রাজনীতিক আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো চমকাইয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া যায়। ১৭৭২ সনে মাধব রাওএর অকালমৃত্যু হয় এবং মারাঠা বাহিনী উত্তরভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসে। ভারতে স্বাধীন ও সার্বভৌম মারাঠা রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যে বছর শাহ আলম দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন এবং মাধব রাওএর মৃত্যু হয় সেই বছর (১৭৭২) ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ গুরুতর ঘটনার সমাবেশ হয় এমনভাবে যে মনে হয় যেন বাহির হইতে কেহ ঘটনাগুলি পরিচালনা করিতেছে।

এদিকে ঘটনাক্রমে সামান্য একজন নায়েক ও ফৌজদার হইতে ভাগ্যান্বেষী **হায়দার আলি** মহীশূরের হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটাইয়া রাজ্যটি দখল করিয়া বসেন (১৭৬১)। পেশওয়া মাধব রাওয়ের প্রতাপের কাছে হায়দার মাথা হেঁট করিতে বহুবার বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হঠাৎ-মৃত্যুর পর হায়দারের সাম্রাজ্যলালসা দ্রুত বাড়িয়া যায়, দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত তিনি রাজ্য দখল করিয়া বসেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পর্বে তিনটি রাজশক্তির সমাবেশ হয় ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে—হিন্দু মারাঠাশক্তি, মহীশূরের নূতন মুসলমান রাজশক্তি এবং উদীয়মান ইংরেজ রাজশক্তি। কোম্পানীর শাসকরূপে ওয়ারেন হেস্টিংস দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু ও মুসলমান রাজশক্তির সম্মুখীন হন।

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

প্রথম হইতেই হায়দারের সহিত ইংরেজদের বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। প্রথমবারের যুদ্ধে হায়দার মাদ্রাজ দখল করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজরা তাঁহার সহিত সন্ধি করেন (১৭৬৯)। ইহাই প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৭৮০ সনের জুলাই মাসে। হায়দার বিশাল এক সেনাবাহিনী লইয়া কর্নাটকে অভিযান করেন এবং আর্কট দখল করেন। হেস্টিংস চাতুর্যবলে হায়দারকে মিত্রপক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন এববং নিজাম (হায়দারাবাদের), ভোঁসলে ও সিন্ধিয়াকে নিরপেক্ষ থাকিতে বলেন। সুযোগ্য

ক্লাইভ ও হেস্টিংসের কীর্তি
অবোধ্যার বেগমের ধনসম্পত্তিচ্যুতি
ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গবর্নর জেনারেল ১৭৭২
বারাণসীর রাজা পদচ্যুত
কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ১৭৭৩
প্রথম মারাঠা যুদ্ধ
ব্রিটিশ বিরোধী
প্রথম মহীশূর যুদ্ধ
দিল্লী
আগ্রা
অযোধ্যা
এলাহাবাদ
বারাণসী
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
হোলকার
সিন্ধিয়া
গুজরাট
মারাঠা
বোম্বাই
নিজাম
উত্তর সরকার
মহীশূর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরি
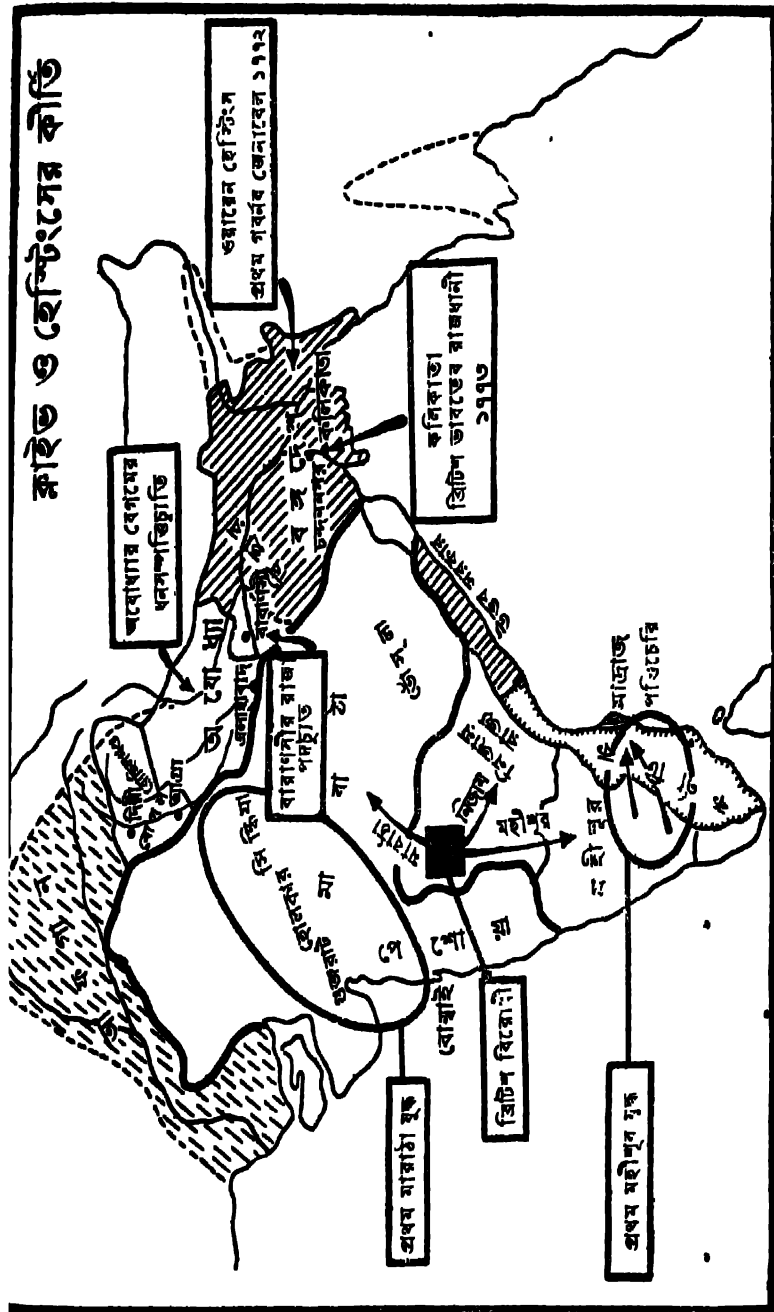
সেনাপতি আয়ার কুটের নেতৃত্বে তিনি বিশাল এক সৈন্যবাহিনী হায়দারের বিরুদ্ধে পাঠান। একা যুদ্ধ করিয়া হায়দার পরাজিত হন এবং হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে (১৭৮২) ইংরেজরা জয়ের সম্ভাবনায় উল্লসিত হইয়া ওঠেন। কিন্তু পিতা হায়দারের মৃত্যুর পর পুত্র টিপু সুলতান নির্ভয়ে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ফরাসীরাও এই সময় মহীশূরের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন বিশ্ব-রাষ্ট্রমঞ্চে আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল (১৭৭৫) এবং ইউরোপে তাহার ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপুল শক্তি সমাবেশ হইয়াছিল! ব্রিটিশ নৌবলের উপর এই যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপ পড়াতে ফ্রান্সের সুযোগ আসিয়াছিল ভারতে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের আশায় ফ্রান্স মহীশূরের পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৭৮৩ সনে। তাহার ফলে ভারতে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়। টিপুর পক্ষে একা সংগ্রাম চালাইয়া জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে। অপরপক্ষে ইংরেজরাও তখন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হেস্টিংস জানিতেন যে এই সময় সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ চালাইলে তাঁহার লাভের সম্ভাবনা বেশী। তাহা সত্ত্বেও তিনি ম্যাঙ্গালোরে টিপুর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হন (১৭৮৪)। দক্ষিণভারতে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের এইভাবে অবসান হয়।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

পেশওয়া মাধব রাওএর মৃত্যুর পর (১৭৭২) মারাঠারা অতিহীন আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রুত নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন। আগে হইতেই পিতৃব্য রঘুনাথ রাওএর সহিত মাধব রাওএর রেষারেষি চলিতেছিল। শুধু মাধবের দূরদৃষ্টির ফলে তখন বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন ঘটিতে গিয়াও ঘটে নাই। মাধবের মৃত্যুর পর যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। তাঁহার ভাই নারায়ণ রাও পেশওয়াপদ লাভ করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত হইলেন। নারায়ণের শিশুপুত্র পেশওয়া-রূপে সম্বর্ধিত হইলে রঘুনাথ দেশত্যাগী হইয়া প্রতিশোধের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। সোজা পথ হইল ইংরেজদের সহিত হাত মিলাইয়া মারাঠাদের জব্দ করা। এই আত্মঘাতী পথে রঘুনাথ রাও পদক্ষেপ করিলেন, বোম্বাই-এর

ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহিত তাঁহারও চুক্তি হইল (১৭৭৫)। ইহাকেই বলে **সুরাটের সন্ধি**। সন্ধিশর্তে ঠিক হইল সাল্‌সেটি ও বেসিন দ্বীপ ইংরেজদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাঁহারা সুরাট ব্রচের আয়ের অংশও লাভ করিবেন। এইভাবে পুনার মারাঠা নায়কদের বিরুদ্ধে বোম্বাইএর ইংরেজরা রঘুনাথের সহিত হাত মিলাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন (১৭৭৫-৮২)।

হেস্টিংস তখন গবর্ণর-জেনারেল হইয়াছেন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর ইংরেজ সরকার তাঁহার অধীনে আসিয়াছে। হেস্টিংস বোম্বাই-সরকারের এই নীতি সমর্থন করিলেন না, রঘুনাথ-তোষণ ছাড়িয়া পুরন্দরে মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৭৬)। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নির্দেশ আসিল যে রঘুনাথের সহিত পূর্বচুক্তি বলবৎ থাকুক এবং সেইভাবে কাজ করা হোক। তলেগাঁওএ মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ বাধিল এবং মারাঠাদের আক্রমণে ইংরেজবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া আত্মসমর্পণ করিল (জানুয়ারি ১৭৭৯) ওয়াডগাঁওএ সন্ধি হইল, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী যে সমস্ত মারাঠা অঞ্চল ইংরেজরা দখল করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতে হইল। হেস্টিংস এই চুক্তি না মানিয়া সেনাপতি গাডার্ডএর অধীনে আবার সৈন্য পাঠাইলেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য। ভোঁসলে ও গায়কোয়াড়কে দলে টানা হইল। ১৭৮০ সনের শেষে ইংরেজরা বেসিন অধিকার করিয়া কোঙ্কন অঞ্চলে মারাঠাদের পরাজিত করিলেন। ১৭৮১ সনে আবার মারাঠাদের হাতে ইংরেজদের প্রচণ্ড পরাজয় হইল। বোম্বাইএর উপকূল হইতে হঠাৎ সিন্দিয়ারাজ্যের কেন্দ্রস্থলে হেস্টিংস গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। ইংরেজ সৈন্য মালব আক্রমণ করিল এবং সিন্দিয়ার শিবিরে অভিযান করিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। মহাদেবজী সিন্দিয়া আপসে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন, তাঁহার মারফৎ পুনা দরবারের সহিত আলাপ আলোচনা চালানো হইবে স্থির হইল। মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশ সিন্দিয়ার মধ্যস্থতায় আপত্তি করিলেন না। ১৭ মে ১৭৮২ সলবইএ মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের সন্ধি নিষ্পন্ন হইল।

সলবই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সালসেটি দ্বীপ ব্রিটিশের হাতে রহিল, কিন্তু পুরন্দরের সন্ধির পর (১৭৭৬) যেসব স্থান ব্রিটিশের অধিকারে আসিয়াছিল তাহা সবই প্রত্যর্পণ করা হইল। ইহাতে উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ মারাঠানায়ক সিন্দিয়াই লাভবান হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উত্তরভারতে তাঁহার

প্রবল ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ হইল। ইংরেজবাহিনীর অনুকরণে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করিয়া তিনি রাজপুতদের শক্তি চূর্ণ করিয়াছিলেন, দিল্লী দখল করিয়া মোগলসম্রাট শাহ আলমকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রণদক্ষতায় চারিদিকে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। একথা প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

আট বছর যুদ্ধ করিয়া ও কূটনীতির খেলা খেলিয়া ইংরেজদের লাভ হইয়াছিল শুধু সালসেটি দ্বীপটি। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ যে অনেকটা অকারণে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং খুব কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করা হয় নাই, সলবই-এর সন্ধিশত হইতে তাহা বোঝা যায়।

ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজরা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিক হইতে একপাও অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাহা না পারিলেও এই দুই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের গভীর তাৎপর্য আছে। পশ্চিমভারতের যুদ্ধের মতো (ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ) দক্ষিণভারতের যুদ্ধও (ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ) যেখানে আরম্ভ হইয়াছিল প্রায় সেইখানেই শেষ হয়। ইংরেজরা কোনরকমে পূর্বে অধিকৃত অঞ্চল দখল করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক এই যুদ্ধের তাৎপর্য শুধু এইটুকু নহে, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এই সময় নানাভাবে যথাসাধ্য আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, তাহা প্রমাণিত হয়। ইহার পর হইতে কোম্পানী কেবল ভারতের একটি রাষ্ট্রীয় শক্তি নহে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তিরূপে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়। ক্ষমতালাভের সূত্রপাত হইতে চূড়ান্ত ক্ষমতাদখলের পথে নিশ্চিত পদক্ষেপ বলিয়া ইহাকে অভিহিত করা যাইতে পারে।

হেস্টিংসের রাজনীতি

হেস্টিংস তাঁহার পূর্বগামীদের কাছ হইতে রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে ইজারাদারি (farming system) ও ঠিকাদারি (contract system) ব্যবস্থা কতকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। ১৭৭২ সনে তিনি পাঁচবছর করিয়া রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। ইহাকে **পাঁচসালা বন্দোবস্ত** বলে। এই বন্দোবস্ত

অনুযায়ী ১৭৭২ সনে যে রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা পাঁচবছরের জন্য বলবৎ থাকিবে বলা হয়। কিন্তু এত উচ্চহারে রাজস্ব বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে অধিকাংশ জমিদার তাহা দিতে অসমর্থ হন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের জমিদারীও বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। ইজারাদারি ব্যবস্থা ছাড়া হেস্টিংস রাজস্ববিভাগ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিবার চেষ্টা করেন। দেওয়ানীলাভের পর মুর্শিদাবাদে ও পাটনায় এক-একজন নায়েব-দেওয়ানের অধীনে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল এবং প্রধানত বিভিন্ন পরগণায় ও জেলায় এদেশী কর্মচারীরাই তাহা আদায় করিতেন। পরে তাঁহাদের কাজকর্ম তদারক করিবার জন্য একজন করিয়া ব্রিটিশ সুপার-ভাইজার' নিয়োগ করা হয়। ১৭৭১ সনে কোম্পানীর ডিরেক্টররা স্থির করেন যে তাঁহারা প্রকৃত দেওয়ানের মতোই কাজ করিবেন। এই নির্দেশ আসিবার পর মুর্শিদাবাদ ও পাটনার নায়েব-দেওয়ানের পদ তুলিয়া দেওয়া হয় এবং কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের ও দেওয়ানী বিচারের (civil justice) ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন। ১৭৭২ সনে হেস্টিংস চারজন সদস্য লইয়া রাজস্ব নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন (Committee of Circuit)। সুপারভাইজারের বদলে প্রত্যেক জেলায় 'কলেক্টর' (Collector) নিযুক্ত করা হয়। মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল তুলিযা দিয়া কলিকাতাতে খালসা (Exchequer) স্থানান্তরিত করা হয়। নূতন রাজস্ব-সংসদের উপর সমস্ত ভার পড়ে। কিন্তু পরের বছরেই আবার জেলায় ইংরেজ কলেক্টরদের বদলে এদেশীয় আমিলদের নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের কাজকর্ম দেখিবার জন্য বর্ধমান মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর ঢাকা ও পাটনাতে পাঁচটি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করা হয়। এই প্রাদেশিক কাউন্সিলের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার থাকে কলিকাতা কাউন্সিলের। ইহার পরেও ১৭৮১ সনে হেস্টিংস এই প্রাদেশিক কাউন্সিল তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় একটি 'কমিটি অফ রেভিনিউ' গঠন করেন চারজন সিভিলিয়ান লইয়া এবং তাঁহাদের উপরেই রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের ভার দেন। রাজস্ববিভাগকে এইভাবে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৭৮৬ সনে 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' গঠিত হইলে এই কমিটি উঠিয়া যায়।

রাজস্বব্যবস্থা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিয়া হেস্টিংস যথাসম্ভব রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭০ সনের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে (ছিয়াত্তরের

মন্বন্তর) বাংলার অর্ধেক গ্রাম জঙ্গলে ও শ্মশানে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও হেস্টিংস রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে কোন উদারতা দেখান নাই। কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেণ্ট' বৃদ্ধি করা এবং মারাঠা ও মহীশূর যুদ্ধের খরচ যোগান দেওয়া তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁহার আমলে রাজস্ববিভাগের বিশেষ উন্নতি হয় নাই এবং তাঁহার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও তেমন কার্যকর হয় নাই, তবে রাজস্বের সহিত অন্যান্য বিভাগেব পুনর্গঠনের ফলে হেস্টিংস পূর্বের তুলনায় একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্লাইভের আমলের দ্বৈতশাসন (dual government) তাঁহার সময়ে উঠিয়া যায় এবং রাজস্ববিভাগের মতো বিচার-বিভাগেও একটি সুপরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।'

শাসন ও বিচারবিভাগের সংস্কার

ভারতের রাজস্ববিভাগেব সহিত দেওয়ানী বিচাববিভাগের (civil justice) চিরকাল ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৭৭২ সনে হেস্টিংসের আমলে এই বিচারব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। প্রত্যেক জেলায় দুইটি করিয়া বিচারালয় বা আদালত স্থাপিত হয়—দেওয়ানী মামলাব জন্য 'দেওয়ানী আদালত' এবং ফৌজদারী মামলার জন্য 'ফৌজদারী আদালত'। ইহাদের উপরে কলিকাতায় দুইটি প্রধান আদালত স্থাপিত হয়—একটি 'সদর দেওয়ানী আদালত', আর একটি 'সদর নিজামৎ আদালত'। জেলার দেওযানী আদালতের বিচারক হইলেন কলেক্টর এবং কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যদের অধীনে রহিল। নিজামৎ আদালতের ভার রহিল এদেশের কাজী-পণ্ডিতদের উপর, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কলেক্টর বা কলিকাতার কাউন্সিল ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৭৭৫ সনে 'সদর নিজামৎ আদালত' কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয় নায়েব-নাজিমের অধীনে।

হেস্টিংসের চরিত্র বিশ্লেষণ

কোম্পানীর সামান্য একজন কেরানী হইতে হেস্টিংস বাংলার গবর্ণর (১৭৭২) এবং পরে গবর্ণর-জেনারেল হইয়াছিলেন (১৭৭৪)। তাঁহার কাউন্সিলের চারজন

সদস্যের মধ্যে ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিং এই তিনজন পদে পদে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কেবল বারওয়েল ছিলেন তাঁহার সমর্থক। ১৭৭৬ সনে মনসনের এবং ১৭৭৭ সনে ক্লেভারিং-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার কাজকর্মের কিছুটা সুবিধা হয়। কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যেও যেভাবে তিনি তাঁহার নীতিগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতো দূরদর্শী স্থিরচিত্ত ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শাসক ক্লাইভের পরে এদেশে কোম্পানীর কর্ণধার হইয়া যদি না আসিতেন তাহা হইলে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সম্ভবত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত।

১৭৮৫সনে অবসর গ্রহণ করিয়া হেস্টিংস ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। দুই বছর পরে কয়েকটি মারাত্মক অপকীর্তির জন্য তাঁহাকে ব্রিটিশ লোকসভার কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। ব্রিটিশ লোকসভায় তাঁহার অপরাধের বিতর্ক চলিয়াছিল প্রায় আট বছর—১৭৮৮ সন হইতে ১৭৯৫ সন পর্যন্ত। এই সময় বারাণসী, বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থান হইতে হেস্টিংসের উদারচরিত্র ও বহু সুকীর্তির সমর্থনে হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে হেস্টিংসের চরিত্রে এমন কতকগুলি ভাল গুণ ছিল যেজন্য এদেশের লোক তাঁহার দোষগুলি ক্ষমা করিয়াছিল ও ভুলিয়া গিয়াছিল।

হেস্টিংসের বিদ্যোৎসাহ

শাসকের এই গুণ ছাড়া হেস্টিংসের আরও একটি বড় গুণ ছিল—তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পূর্বগামী শাসক ক্লাইভ একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া তিনি শুধু অর্ধশুদ্ধ পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। হেস্টিংস এদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতিক ভাষা ফার্সী (Persian) উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত-মুন্শীর সাহায্যে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতভাষাও শিখিয়াছিলেন। উর্দু ও আরবীও তিনি কাজ চালাইবার মতো জানিতেন। এদেশী ভাষা শিক্ষার এই আগ্রহ হইতেই বোঝা যায় তাঁহার বিদ্যোৎসাহের মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতা ছিল।

হেস্টিংস বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের শাসক হইতে হইলে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক আচারপ্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এদেশের হিন্দু আইনের জ্ঞান না থাকিলে যে সুশাসন ও সুবিচার সম্ভব নহে, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। এইজন্য হিন্দু আইনশাস্ত্র তিনি প্রথমে সংস্কৃত হইতে ফার্সীতে অনুবাদ করান এবং ফার্সী হইতে হলহেড তাহা ইংরেজীতে A Code of Gentoo Law নামে অনুবাদ করেন (১৭৭৬)। চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়াম জোন্স ও কোলব্রুক—এই তিনজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ (Orientalist) হেস্টিংসের পোষকতায় সংস্কৃতশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত চর্চাও পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহে উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সনে বাংলাদেশে প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য **এসিয়াটিক সোসাইটি** স্থাপন করেন। পরে ইংলণ্ডে ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই উদ্দেশ্যে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হেস্টিংসের উৎসাহে উইলকিন্স ইংরেজীতে গীতা অনুবাদ করেন। কেবল প্রাচীন হিন্দুবিদ্যা নহে, ইসলামিক বিদ্যারও অনুশীলনের জন্য হেস্টিংস **কলিকাতা মাদ্রাসা** স্থাপন করিয়াছিলেন (১৭৮১)। এদেশের প্রথম আধুনিক মানচিত্রকর রেনেল (Rennell) তাঁহারই উৎসাহে Bengal Atlas রচনা করেন (১৭৮১)। শিল্পকলার প্রতিও হেস্টিংসের গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার সংগৃহীত ভারতীয় চিত্রাবলী ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া অফিসে সযত্নে রক্ষিত আছে, ১৮০৯ সনে এগুলি ৭৫৯ পাউণ্ড মূল্যে কেনা হইয়াছিল। শোনা যায় হেস্টিংস নিজে কাব্যরচনাও করিতেন।

ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন ইংলণ্ডে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সামনে সেই সাম্রাজ্য শাসনের সমস্যাও দেখা দিতেছিল। ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ সনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভের পর এই সমস্যা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে ক্রমেই জরুরী হইয়া উঠিতে থাকে। ভারতে কোম্পানীর শাসননীতি ও বাণিজ্যনীতি নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করেন। সেই উদ্দেশ্যে লর্ড নর্থের মন্ত্রিত্বকালে ইংলণ্ডের ভারতশাসন সংক্রান্ত 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট'

(১৭৭৩) এবং উইলিয়ম পিটের মন্ত্রিত্বকালে 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' (১৭৮৪) পার্লামেণ্টে পাশ করা হয়।

নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ১৭৭৩

নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট বেশ একটি দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহাসিক দলিল। ইহার প্রধান বিধানগুলি এই :

১। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইলে ২৪ জন এবং ইহার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছয়জন প্রতি বছর বিদায় গ্রহণ করিবেন। ডিরেক্টররা নির্বাচিত হইবেন চার বছরেব জন্য।

২। বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য একজন গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের চারজন সদস্য নিযুক্ত হইবেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর কোম্পানীর গভর্নমেণ্ট ইহাদের অধীনে থাকিবে।

৩। কলিকাতায় একজন প্রধান বিচারক ও তিনজন বিচারক লইয়া একটি সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হইবে এবং বৃটিশ আইন অনুযায়ী (ভারতীয় আইন নহে) ভারতের ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদের (ইংবেজ ও ভারতীয় উভয়েবই) অন্যায়-অপরাধেব বিচার করিতে হইবে।

৪। গভর্নর-জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্যরা ও বিচাবকবা সকলেই উপযুক্ত বেতন পাইবেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং উৎকোচ উপঢৌকন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর কাছে প্রশাসনিক ও সামরিক কার্যকলাপের বৃত্তান্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরদের দাখিল করিতে হইবে।

৬। বাংলাদেশের রাজস্বের হিসাব-নিকাশ বছরে অন্তত দুইবার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পরীক্ষার জন্য পেশ করিতে হইবে।

এই রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণবিধির প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্লাইভের আমল হইতে ভারতে যে চরম বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল তাহা সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করাও রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অ্যাক্ট পাশ হইলেও কোন উদ্দেশ্যই বিশেষ কার্যকর হয় নাই। এই অ্যাক্ট

অনুযায়ী ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম বাংলাদেশের গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন, কিন্তু এমন চারজন সদস্য লইয়া তাঁহার কাউন্সিল গঠিত হয় যে তিনজন সর্বদাই তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাহার ফলে হেস্টিংসের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হেস্টিংসের আমলের ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্নমেণ্ট পারতপক্ষে বাংলার গভর্নর-জেনারেলের সর্বময় কর্তৃত্ব কার্যক্ষেত্রে বিশেষ মানিয়া চলিতেন না। অ্যাক্ট অনুযায়ী যে নূতন বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহাতেও এদেশে সামাজিক উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, শাস্তি বা সুবিচার স্থাপিত হয় নাই। হঠাৎ এদেশীয় সমাজে ব্রিটিশ আইন প্রয়োগের ফলে হিতে বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড এবং গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড হইয়াছে। রেগুলেটিং অ্যাক্ট কিছুই 'রেগুলেট' বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার একমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইতেছে—কোম্পানীর ভারতশাসন ব্যাপারে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ইহাতে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

পিটের 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' ১৭৮৪

নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট প্রায় ১১ বছর প্রচলিত ছিল। অবশেষে ইহার ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া ১৭৮৪ সনে উইলিয়ম পিট 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করেন। এই অ্যাক্টের প্রধান বিধানগুলি এই :

১। কাউন্সিলের চারজন সদস্যের বদলে তিনজন সদস্য ও গভর্নর-জেনারেল বাংলা প্রেসিডেন্সির শাসনভার গ্রহণ করিবেন। সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ তিনজনের মধ্যে একজন সদস্যরূপে মনোনীত হইবেন এবং গভর্নর-জেনারেলের নিজস্ব ভোটটি ছাড়াও আরও একটি ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

২। মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবর্নমেণ্টের উপর বাংলা গবর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় হইবে।

৩। ইংলণ্ডের দুইজন মন্ত্রী ও চারজন প্রিভি কাউন্সিলার লইয়া একটি 'বোর্ড অফ কমিশনার্স' (Board of Commissioners for the Affairs of India) গঠিত হইবে। পরে ইহাই 'বোর্ড অফ কণ্ট্রোল' (Board of

Control) নামে পরিচিত হয়। ইহা ছাড়া তিনজন সদস্য লইয়া একটি গোপন মন্ত্রণাসভা (Secret Committe) গঠিত হইবে। এই কমিটি ও বোর্ড একত্রে মিলিয়া ভারতশাসন প্রণালী ও নীতি নির্ধারণ করিবেন এবং কোম্পানীর ডিরেক্টররা তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। ভারত সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র বোর্ডের কাছে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের দাখিল করিতে হইবে এবং বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদের চলিতে হইবে।

ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের এই শেষোক্ত বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিধানবলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর ভারতশাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সামনে রাখিয়া তাহার আড়াল হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতশাসন পর্বের সূচনা হইয়াছে ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট হইতে।

QUESTIONS

1. Give a critical estimate of the contribution of Warren Hastings to the consolidation of British Power in India.
2. "The aim of Warren Hastings' foreign policy was to make the East India company the ruling power in India." Discuss the statement critically.
3. Give a brief estimate of Warren Hastings' character and achievements, with reference to his revenue and judicial reforms.
4. Briefly describe the Anglo-Maratha and Anglo-Mysore Wars till 1784 and their political consequences.
5. Give a brief estimate of the political career of Haider Ali of Mysore.
6. What were the main provisions of North's Regulating Act 1773 ? Why it was superseded by Pitt's India Act 1784 ?

সপ্তবিংশ অধ্যায়

কর্নওয়ালিস ও ওয়েলেসলি

ওয়ারেন হেস্টিংসের পর কর্নওয়ালিশ ও ওয়েলেসলির আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরও প্রসার হয় ভারতবর্ষে। মহীশূর ও মারাঠাশক্তির চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে এই প্রসার সম্ভব হয়।

কর্নওয়ালিস-ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যপ্রসারনীতি

(ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রসারের পথে দাক্ষিণাত্যের তিনটি রাষ্ট্রীয় শক্তি বেশ বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—হায়দারাবাদের নিজাম, মহীশূরের টিপু সুলতান (হায়দার আলির পরে) ও মারাঠারা।) উত্তরভারতেও বিচ্ছিন্ন মারাঠা শক্তির সমস্যা তখনও মিটিয়া যায় নাই। পিটের নূতন 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' অনুযায়ী ভারতের যে কোন রাষ্ট্রশক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন না হইলে এই নিষেধ মানিয়া চলার নির্দেশও ছিল। কর্নওয়ালিস প্রথমে এই নির্দেশ মানিয়াই চলিতেছিলেন, কিন্তু পরে ইহা তিনি ভঙ্গ করেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজামের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষির সুযোগ লইয়া কর্নওয়ালিস মহীশূরের বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সক্রিয় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। (টিপু ইহা বুঝিতে পারেন এবং ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করেন (১৭৮৯)। এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯০-৯২

(নিজাম ও পেশোয়ার সহিত কর্নওয়ালিস অনাক্রমণ মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং পেশোয়া ও নিজাম উভয়েই ইংরেজদের সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিবেন)

CHAPTER XXVII—Expansion under Cornwallis and Wellesley. Anglo-Mysore Wars, Wellesley's war with the Marathas. Moira—Nepal War, Pindari War—destruction of the Maratha power. British Power now paramount in India.

প্রতিজ্ঞা করেন। ইংরেজ নিজাম মারাঠা—এই তিনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিপু অমিতবিক্রমে বীরের মতো প্রায় দুই বছর ধরিয়া যুদ্ধ করেন। অবশেষে তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ হইলে টিপু শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। (১৭৯২)। সন্ধিশর্ত অনুসারে টিপুকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হয় এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিতে হয় অনেক। টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজদের কাছে জিম্মাও রাখিতে হয়।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯৯

মহীশূরের টিপু পরাজিত হইয়াও নিজের স্বাধীনতা সমর্পণ করেন নাই, ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, নিজের দেশে মারাঠা বা নিজাম কাহাকেও তিনি বন্ধু হিসাবে পান নাই। মারাঠারা তখন আত্মকলহে ব্যাপৃত এবং পেশোয়া, ভোঁসলে, সিন্দিয়া—প্রত্যেকেই তখন ইংরেজের মুখাপেক্ষী। সুবিধাবাদী নিজামও প্রায় ইংরেজের আশ্রিত। হতভাগ্য টিপুকে বাহিরে বন্ধু খুঁজিতে হইয়াছিল, ফ্রান্স মরিশাস আবব তুবস্ক কাবুল প্রভৃতি দেশেব কাছ হইতে ইংবেজেব বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করিযাছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাই তাঁহার পতনের কারণ হইল।

এদিকে কর্নওয়ালিসের পর ওয়েলেসলি যখন গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিলেন (১৭৯৮) তখন তাঁহার অধীন-মিত্রতানীতির ফলে (Policy of Subsidiary Alliance) রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হইল। ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলিকে ইংরেজেব মিত্র হইতে হইবে 'অধীনতা' স্বীকার করিয়া, ইহাই ওয়েলেসলির বিখ্যাত 'অধীন মিত্রতানীতি'র তাৎপর্য। কোন রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করিবেন না, তবে সেখানে একজন করিয়া যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকিবেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজকর্ম করিতে হইবে এবং ইংরেজের অনুমতি ছাড়া ভারতীয় বা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া অথবা ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশীদের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত করা চলিবে না। ওয়েলেসলি যে একজন অতি ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন তাহা তাঁহার এই নীতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

(হায়দারাবাদে নিজামের উপর এই নীতি প্রয়োগ করিয়া ওয়েলেসলি সফল হইলেন। নিজামরাজ্যে ফরাসী সৈন্যের স্থলাভিষিক্ত হইল ব্রিটিশ সৈন্য, নিজাম তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।) মহীশূরের টিপুকে এই মিত্রতানীতির ফাঁদে আবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।, এদিকে টিপুর অনুরোধে ফরাসীরা তাঁহাকে সাহায্য কবিবার জন্য ম্যাঙ্গালোরে আসিযা উপস্থিত হইলেন। এই কাজের জন্য টিপুর কাছে কৈফিয়ত দাবী করা হইল, কিন্তু টিপুব জবাব ইংরেজদের মনঃপুত হইল না। উভয়পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। **চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূরযুদ্ধ ১৭৯৯** আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে অভিযান করিয়া ইংরেজ সৈন্যবাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তন বেষ্টন কবিয়া ফেলিল। অবশেষে রাজধানীর পতন হইল (৪ মে, ১৭৯৯), টিপু নিহত হইলেন এবং তাঁহার পুত্রও আত্মসমর্পণ করিলেন। মহীশূরে হায়দার আলির বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিজাম মহীশূর বাজ্যের কিছু অংশ পুরস্কারস্বরূপ পাইলেন, কানাড়া অঞ্চল ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল। সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে একটি বড বাধা ইংরেজরা এইভাবে অপসারিত করিলেন। বাকী রহিল মারাঠাশক্তি।)

মারাঠাশক্তির বিপর্যয় ও বিনাশ

মহীশূরের পবে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বহিল মারাঠাশক্তি, কিন্তু পারস্পরিক কলহ-বিবাদে তখন তাহার অন্তঃসার প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছে। ১৭৮২ সনে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানের পব মারাঠারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্যের সামন্তরা ক্রমে আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইযা উঠিলেন। বরোদার গাইকোয়াড়, বেরারের ভোঁসলে, নিজেদের এলাকায় সবময় কর্তা হইয়া বসিলেন। মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত ইন্দোরের শাসনকার্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু ১৭৯৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাধবজী সিন্দিয়া ছিলেন মারাঠা সামন্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান, কিন্তু ১৭৯৪ সনে তাঁহারও মৃত্যু হয়। ১৮০০ সনে মৃত্যু হয় আরও একজন প্রবল শক্তিশালী মারাঠা নায়ক নানা ফডনবীশের। এদিকে হোলকার নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লোভে সিন্দিয়া ও পেশোয়ার মিলিত বাহিনীকে পুনা শহরের

ভারতবর্ষ
ওয়েলেসলির আমলে
১৭৯৫-১৮০৫
আফগান
শিখ
রাজপুত
সিন্ধু
নেপাল
অযোধ্যা
হোলকার
বুন্দেলখণ্ড
১৮০৩
ভোঁসলে
১৮০৩
উড়িষ্যা
নিজাম
১৭৯৮
মহীশূর
কর্ণাটক
সিংহল
ব্রিটিশ রাজ্য
করদ রাজ্য
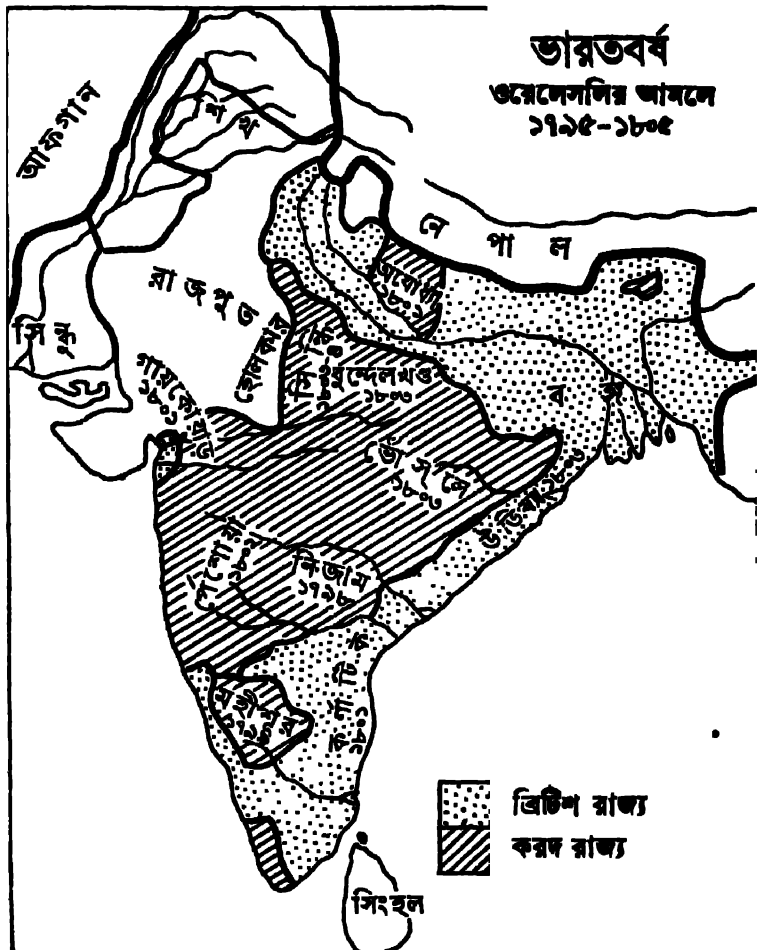
কাছে পরাজিত করেন (১৮০২)। পুনা হইতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও কোঙ্কন উপকূলের দিকে পলায়ন করেন এবং ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হন। ইংরেজরা এই সুযোগের প্রত্যাশায় ছিলেন এবং সুযোগ আসিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা ওয়েলেসলির মিত্রতানীতির ফাঁস পেশোয়ার গলায় পরাইয়া দেন। পেশোয়ার সহিত ইংরেজের চুক্তি হয় বেসিন-এ (১৮০২)। পেশোয়ার রাজ্যে ছয় হাজার ইংরেজ সৈন্য রাখা সাব্যস্ত হয় এবং তাহাদের খোরাক-পোশাকের জন্য তিনি ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের একটি বিশাল অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলিয়া দেন। নিজাম ও গাইকোয়াড় আগেই ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছিলেন, পেশোয়ার সহিত তাঁহাদের দাবীদাওয়ার যে বিরোধ ছিল ইংরেজরা সালিশী করিয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন। ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পঙ্গু পেশোয়া পুনরায় ফিরিয়া গেলেন (১৮০৩)। বেসিন-এর চুক্তি মারাঠাশক্তির গলার ফাঁস হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৮০৩-৫। বেসিন-এর চুক্তির খবর পাইয়া সিন্দিয়া, হোলকার ও ভোঁসলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মারাঠাদের মহাসঙ্কট আসন্ন। হতভাগ্য পেশোয়াও পুনাতে নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতেছিলেন না, কলঙ্ক মোচনের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সিন্দিয়া ও ভোঁসলে নিজামরাজ্যের সীমান্তে সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন, ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। ইহাই দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। ইংরেজপক্ষে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি, যিনি পরে (১৮১৫ সনে) বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া 'ডিউক অফ ওয়েলিংটন' নামে খ্যাত হন। আহমদনগর দখল করিয়া ঔরঙ্গাবাদের উত্তরে অসই-এর যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর ১৮০৩) তিনি সিন্দিয়া ও ভোঁসলের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর সিন্দিয়ার পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। ভোঁসলে যুদ্ধ করিতে থাকেন, কিন্তু অরগাঁও-এর যুদ্ধে তিনিও শেষে পর্যুদস্ত হন (নভেম্বর ১৮০৩) এবং দেবগ্রামের সন্ধির দ্বারা ইংরেজের অধীন-মিত্রতানীতি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। নিজের রাজ্যের অনেকটা অংশও তিনি ইংরেজদের ছাড়িয়া দেন।

এদিকে উত্তরভারতে ইংরেজ সেনাপতি লেক (Lake) আগ্রা ও দিল্লী দখল করিয়া মারাঠাদের আশ্রিত মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরেজের

ভারতবর্ষ
১৮২৩
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
শিখ
দিল্লী
নেপাল
রাজপুতানা
অযোধ্যা
সিন্ধু
গোয়ালিয়র
গঙ্গা নং
সিন্ধিয়া
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
হোলকার
নর্মদা নং
বেরার
গোদাবরী নং
নিজাম
রাজ্য
কৃষ্ণা নং
মহীশূর
মাদ্রাজ
ব্রিটিশ রাজ্য
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
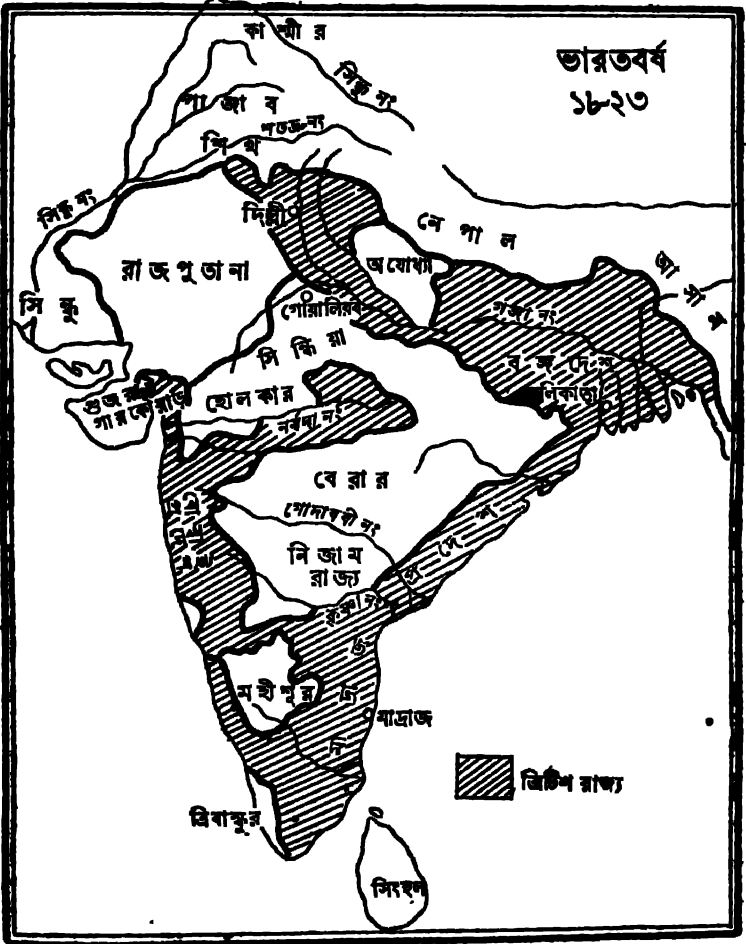
কুক্ষিগত করেন। সিন্দিয়া তখনও যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনিও ব্রিটিশের ফাঁদে পা দেন। তাঁহার রাজ্যের বিরাট এক অংশ এবং কতকগুলি দুর্গ তিনি ইংরেজদের ছাড়িয়া দেন। কেবল হোলকার তখনও পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৮১৭-১৮। ওয়েলেসলির পরে কর্নওয়ালিস (-দ্বিতীয়বার), বার্লো ও মিণ্টো গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। মিণ্টোর পরে ময়রা (মার্কুইস অফ হেস্টিংস বা লর্ড হেস্টিংস বলিয়া পরিচিত) এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮১৩-২৩)। ময়রার আমলে মারাঠাশক্তির উচ্ছেদসাধন সম্পূর্ণ হয়। উত্তরভারতে **পিণ্ডারিরা** তখন চারিদিকে লুটতরাজ ও ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। অবিরাম ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। অবশ্য পেশাদার ডাকাত হইয়া ইহারা যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে। মারাঠা সামন্তদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তাঁহাদের সৈন্যসামন্তরা যখন বেকার হইয়া পড়িল, তখন লুটতরাজ করিয়া বাঁচিয়া থাকা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। পিণ্ডারিরা সকলেই যে বেকার সৈনিক তাহা নহে, খুনে ডাকাতের দলও মধ্যভারতে অনেক ছিল। কিন্তু তাহাদেরও যোগাযোগ ছিল মারাঠা সৈন্যদের সহিত। পিণ্ডারী দমন ময়রার বা লর্ড হেংস্টিংসের অন্যতম কীর্তি (১৮১৭-১৮)। এই পিণ্ডারিদের দমন করিতে গিয়াই তিনি অবশিষ্ট মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন, কারণ সিন্দিয়া ও হোলকারের সহিত পিণ্ডারিরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সিন্দিয়ার সহিত চুক্তি হয় (১৮১৭), তিনি পিণ্ডারি-দমনে ইংরেজদের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। এদিকে পেশোয়া বাজীরাও বেসিনচুক্তির অপমানের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না, প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে অধৈর্য হইয়া তিনি পুনার ব্রিটিশ দূতাবাসে আগুন লাগাইয়া দেন (১৮১৭ নভেম্বর) এবং শহরের চার মাইল দূরে কিরকিতে অবস্থিত ইংরেজ শিবির আক্রমণ করেন। আক্রমণ প্রতিহত হয়, ইংরেজ সৈন্যরা পুনা অধিকার করে। পেশোয়ার বিদ্রোহে অন্যান্য মারাঠাশক্তিও উৎসাহিত হয়। নাগপুরের আপ্পা সাহেব যুদ্ধযাত্রা করিয়া নাগপুরের কাছে পরাজিত হন এবং পাঞ্জাবে পলায়ন করেন (১৮১৭ নভেম্বর-ডিসেম্বর)। এই সময় মহিদপুরের যুদ্ধে হোলকারের সৈন্যরাও

সম্পূর্ণ পরাজিত হন। হোলকারের এই পরাজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুনা হইতে বিতাড়িত পেশোয়ার বাহিনী সোলাপুর ও অন্যান্য অঞ্চলেও পরাজিত হয়, তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি বাপু গোখেল বা গোকলা যুদ্ধে নিহত হন। পেশোয়া আত্মসমর্পণ করেন (জুন ১৮১৮)।

মহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হোলকার আর ইংরেজদের অগ্রগতিতে বাধা দেন নাই। নাবালক হোলকারের সুযোগ্য মন্ত্রী তাঁতিয়া ইংরেজদের সহিত এক চুক্তি করেন (১৮১৮) এবং তাঁহাদের অনেকটা রাজ্য ছাড়িয়া দেন। পেশোয়াবংশ নির্বংশ করিবার জন্য বাজীরাওকে কানপুরের কাছে বিঠুরে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা মাসহারা দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ত্র্যম্বকজী চুনারের দুর্গে যাবজ্জীবন অন্তরীণ থাকেন। মারাঠাশক্তিকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া লর্ড ময়রা নিশ্চিন্ত হন। মহীশূরের পর মারাঠারা নিশ্চিহ্ন হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের পথে প্রধান বাধা দূর হইয়া যায়। সাম্রাজ্য ও শক্তি দুইদিক হইতেই ইংরেজেরা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠেন।

QUESTIONS

1. Give a critical review of Cornwallis and Wellesley's Policy for the expansion of British power in India.
2. Explain Wellesley's policy of Subsidiary Alliance. What were the objects behind the policy ? How far were these achieved ?
3. Describe briefly the causes that led to the downfall of the Maratha power.

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কর্নওয়ালিসের শাসনসংস্কার

প্রশাসনিক ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে কর্নওয়ালিস যে সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে তাহা এদেশের সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার, বাণিজ্যব্যবস্থার সংস্কার, বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং রাজকর্মচারী নিয়োগব্যবস্থার সংস্কার প্রধান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩

কর্নওয়ালিসের অন্যতম কীর্তি হইল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement) প্রবর্তন। ১৭৯৩ সনে তিনি ইহা প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি ইহার প্রবর্তক হইলেও, তাঁহাকে ঠিক 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' উদ্‌ভাবক বলা যায় না। কারণ হেস্টিংসের আমল হইতেই এরকম একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা একদল ইংরেজ রাজকর্মচারী বলিতেছিলেন। বছর বছর অথবা কয়েক বছর অন্তর ভূমিরাজস্ব ইজারা দিবার ফলে আগে হইতেই একদল বিত্তশালী লোক এদেশে আধা-জমিদারে পরিণত হইতেছিলেন। কর্নওয়ালিস তাঁহাদেরই স্থায়ী জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অনেক বড় বড় কথা বলিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছিল। কৃষকদের অবস্থার ও কৃষিকার্যের উন্নতি হইবে, রাজস্বসংগ্রহের বিরক্তিকর কর্ম হইতে বহু কর্মচারী মুক্ত হইয়া শাসনবিভাগের অন্যান্য দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন—এই ধরনের যেসব উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয় কার্যক্ষেত্রে তাহার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়।

প্রত্যক্ষ যে সুফল কর্নওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন তাহা ফলিল না। রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না এই আশায় নূতন জমিদাররা অথবা পুরাতন জমিদার যাঁহারা তখনও ছিলেন তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত রাজস্ব দিবেন—কর্নওয়ালিসের এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হইল। জমিদাররা রাজস্ব জমা দিবার দিনক্ষণের কঠোর আইন বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহাদের এই কাজে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তাহার ফলে জমিদারী নিলাম হইতে লাগিল, বহু জমিদারবংশও উচ্ছন্নে গেল। প্রজাদেরও কোন সুবিধা হইল না।

CHAPTER XXVIII : Cornwallis and Permanent Settlement. His other reforms, Charter of 1813.

কারণ জমিদাররা যখন তাঁহাদের ভূসম্পত্তির সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন, কেবল নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে সরকারী ট্রেজারীতে নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিলেই সমস্ত দায় চুকিয়া যায়, তখন নিরীহ অসহায় প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কথায় কথায় প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি কবা, খাজনা না দিলে ভিটেমাটি হইতে উৎখাত করা—জমিদারদের এই স্বেচ্ছাচারিতা প্রজাদের দুঃখদুর্দশা বাড়াইয়া দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাধু উদ্দেশ্য এইভাবে বাস্তবক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮১৩। বাণিজ্যব্যবস্থার সংস্কার

'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর ১১ জন সদস্য কোম্পানীর মূলধন বিনিয়োগের কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে পণ্যদ্রব্যের 'কনট্রাক্ট' দেওয়ার ভার থাকিত। এই ঠিকাদারীব ব্যাপারে কেবল কোম্পানীর কর্মচারীরা নহেন, বোর্ডের সদস্যরা পর্যন্ত জড়িত হইয়া মোটা টাকা অসঙ্গত উপায়ে উপার্জন করিয়াছেন। কর্নওয়ালিস বাণিজ্যক্ষেত্রে কোম্পানীর এই দুর্নাম দূর করিবেন মনস্থ করিয়া ১১ জনের বদলে ৫ জন সদস্য লইয়া 'বোর্ড অফ ট্রেড' গঠন করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ঠিকাদারীর সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দেন। সোজাসুজি বাহিরের ব্যবসায়ীদের কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য সরবরাহের কনট্রাক্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৯ সনে কর্নওয়ালিস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে কোম্পানী ন্যায্য দরে জিনিসপত্র কেনাবেচা করিবে, কারিগর বা ব্যবসায়ীদের উপর কোনরকম জুলুম-জবরদস্তি করা হইবে না। কর্নওয়ালিসের চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহার সাধু সংকল্প বহু অর্থলোভী ইংরেজদের জন্য বিশেষ সার্থক হয় নাই। কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমেই মন্দার দিকে চলিতে থাকে। তারপর **১৮১৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী** ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। এই কারণে ১৮১৩ সনের সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

কর্নওয়ালিস 'কোড' বা বিধান

কর্নওয়ালিস যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন করেন তাহাই ১৭৯৩ সনের মে মাসের 'Cornwallis Code' বলিয়া ঘোষিত হয়।

ভারতবর্ষ
১৭৯৫
আফগান
নেপাল
অযোধ্যা
কোচ বিহার
বিহার
রাজপুত
মারাঠা রাজ্য
নিজাম রাজ্য
মহীশূর
মাদ্রাজ
ব্রিটিশ রাজ্য
ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য
মারাঠা রাজ্য
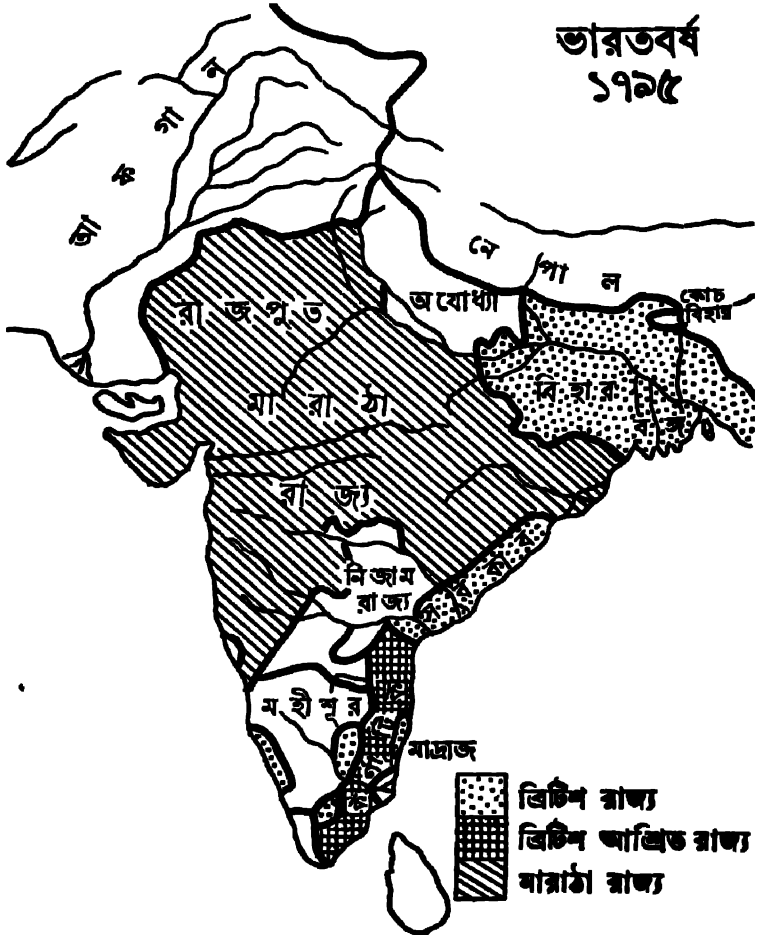
ব্রিটিশযুগের ইতিহাসে এই কর্নওয়ালিস কোডের বা বিধানের গুরুত্ব অসাধারণ। ঐতিহাসিকরা বলেন যে ১৭৯৩ সনের এই কর্নওয়ালিস কোড "formed the steel frame of British-Indian administration"—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইস্পাত-কাঠাম তৈরী করিয়াছে। প্রধানত দুইটি নীতির উপর এই কর্নওয়ালিস-বিধান প্রতিষ্ঠিত। প্রথম নীতি হইল—বিভিন্ন জেলার কলেক্টরদের প্রকৃত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা দেওয়া এবং বিচারসংক্রান্ত কাজকর্ম হইতে মুক্ত করিয়া শাসনকার্যে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করার সুযোগ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় নীতি হইল শাসনসংক্রান্ত কোন দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মে ভারতীয়দের নিযুক্ত না করা। এই দুইটি নীতি হইল কর্নওয়ালিস কোডের দুইটি প্রধান স্তম্ভ।

১৭৯১ সনে তিনি ঘোষণা করেন যে কোম্পানীর বেসামরিক, সামরিক অথবা নৌবিভাগের কোন কাজে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হইবে না। এই ঘোষণার দ্বারা তিনি কর্মক্ষম সুযোগ্য ভারতীয়দের সামনে হইতে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা লোপ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসকদের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতার মনোভাবকেও বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রায় ৪০-৪২ বছর পরে ১৮৮৩ সনের 'চার্টার অ্যাক্ট' অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক সরকারী কর্মক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভারতীয়ের এই বৈষম্য দূর করিয়াছিলেন। কর্নওয়ালিস চাহিয়াছিলেন শুধু ইউরোপীয়ানদের লইয়া ভারতে একটি স্বতন্ত্র শাসকজাতি গঠন করিতে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিতে। ১৮৩৩ সনের চার্টার অ্যাক্টে এই নীতি পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

QUESTIONS

1. What is permanent settlement ? Why it was introduced ? What were its consequences ?

2. Briefly narrate the main features of the administrative reforms introduced by Cornwallis.

উনত্রিংশ অধ্যায়

নবজাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নূতন প্রাণ স্পন্দন শোনা যায় এবং এক নূতন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজ ও জীবনকে গড়িয়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ইহাকেই বলা হয় 'নবজাগরণ'। 'naissance' ফরাসী কথা, অর্থ হইল 'জন্ম' সুতরাং 're-naissance' কথার অর্থ 'পুনর্জন্ম' অর্থাৎ নূতন জীবন বা নবজাগরণ।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমল হইতেই আমাদেব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বোম্বেটে বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের ক্রমাগত অভিযানে, যুদ্ধবিগ্রহে ও অন্যায়-অত্যাচারে সমাজের শৃঙ্খলা সংযম ও সুনীতির বন্ধন দ্রুত শিথিল হইয়া যায় এবং চারিদিকে ভাঙ্গন ধরিতে থাকে। সমাজে কূপমণ্ডুকের মতো মনোভাব, জাতিবর্ণের ভেদবৈষম্য, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, সতীদাহ, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতিপ্রবণতা প্রভৃতি যতরকমের অধঃপতনের উপসর্গ আছে সবই পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়। সমাজের আর নড়াচড়া করিবার মতো শক্তি ছিল না। এই সময় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাত ও নূতন শিক্ষাদীক্ষার ফলে এদেশের মানুষ সমাজের মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। অবশ্য এই সময় ও তাহার আগে হইতে ইউরোপেও কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়া যাইবার ফলে মানুষের পুরাতন ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের পরিবর্তন হইতে থাকে। সেই পরিবর্তনের স্রোত ঘটনাচক্রে ইংরেজদের আগমনের ফলে প্রধানত তাঁহাদেরই মাধ্যমে এদেশে আসিয়া পৌছায়। ১৭৭৫ সনে আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাহার কয়েকবছর পরে ফ্রান্সে আরম্ভ হয় ফরাসী বিপ্লব, ১৪ জুলাই ১৭৮৯

CHAPTER XXIX : Western education and ideas. Bentinck – his social and other reforms. Hare, Macaulay, Rammohan Ray, Progress of education, Vidyasagar, Foundation of Universities.

বাস্তিলের পতন হয়। বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী কেবল ফ্রান্সের নহে, সারা ইউরোপের ও বিশ্বের মানুষের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। রুশো ভলতেয়ার বেকন লক হিউম বেন্থাম টমপেইন মিল প্রমুখ দার্শনিক ও মনীষীদের যুক্তিবাদী ও মানববাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষের ধর্মান্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত মন অন্ধকার হইতে প্রচুর আলোবাতাসের মধ্যে মুক্তি পায়।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার

১৮১৩ সনের চার্টার অ্যাক্টে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কমপক্ষে বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই টাকা কি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য খরচ করা হইবে—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা ও ইংরেজীশিক্ষা, না ভারতীয়দের পুরাতন সংস্কৃত শাস্ত্র, আরবী ফার্সী শিক্ষা ও টোল-চতুষ্পাঠী মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা—ইহা লইয়া দীর্ঘকাল দুইপক্ষে তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। একদল আধুনিক শিক্ষার পক্ষে, আর একদল পুরাতন ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে। যাঁহারা আধুনিক শিক্ষা ও ইংরেজীর সমর্থক ছিলেন তাঁহাদের বলা হইত **অ্যাংলিসিস্ট** (Anglicists) এবং যাঁহারা পুরাতন ভারতীয় বিদ্যা বা প্রাচ্যশিক্ষাপন্থী ছিলেন তাঁহাদের বলা হইত **ওরিয়েণ্টালিস্ট** (Orientalists)। বিখ্যাত **মেকলে** (Thomas Babington Macaulay) ছিলেন অ্যাংলিসিস্টদের পক্ষে এবং বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ 'উইলসন' (Horace Hayman Wilson) ছিলেন অ্যাংলিসিস্টদের বা ইংরেজীশিক্ষাপন্থীদের বিপক্ষে। মেকলে শেষ পর্যন্ত অবিরাম যুক্তিতর্ক করিয়া তাঁহার সহযোগীদের ও গভর্নর-জেনারেল 'উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে' বুঝাইতে সক্ষম হন যে ইংরেজীভাষার মাধ্যমে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিলে ভারতীয়রা যথার্থ যুগোপযোগী শিক্ষালাভ করিবে এবং পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় পারদর্শী হইবে। মেকলের ওকালতিতেই শেষ পর্যন্ত **উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক** অবসর গ্রহণের কয়েকদিন আগে ৭ মার্চ ১৮৩৫, ইংরেজী-শিক্ষার পক্ষে সরকারী প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়—"the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India, and the funds appropriated to education

would best be employed in English education." এইদিন হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার ভাষারূপে গৃহীত হয়। এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এইজন্য এই দিনটি স্মরণীয় এবং ইহা বেণ্টিঙ্ক ও মেকলের অন্যতম কীর্তি। ইহার পর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে (১৮৫৭) আধুনিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হইতে পারে।

সরকারীভাবে ইংরেজীশিক্ষার প্রতিষ্ঠার আগেই মিশনারীদের ও এদেশীয় লোকদের প্রচেষ্টায় ইংরেজী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সূচনা হইয়াছিল। ১৮১৭ সনে প্রধানত এদেশীয় লোকের উদ্‌যোগেই কলিকাতায় বিখ্যাত হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই হিন্দু কলেজই ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আধুনিক বিদ্যালয়, পরে ইহাই নামবদল করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে। এই কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন ইংরেজ শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার।

ডেভিড হেয়ার

এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ডেভিড হেয়ারের বিশিষ্ট দান আছে। হেয়ার স্কটল্যাণ্ডে ১৭৭৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫ বছর বয়সে ঘড়ির কাজকর্ম করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। ১৮১৬ সনে ঘড়ির ব্যবসা হস্তান্তরিত করিয়া দিয়া হেয়ার তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ শক্তিসামর্থ্য ও অর্থ এদেশের শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য অকাতরে নিয়োগ করেন। বিদেশীদের মধ্যে তো বটেই, এদেশের লোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রসারের জন্য এরকম আত্মত্যাগ আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। হেয়ারের হৃদয়ের মতো মনটিও ছিল উদার, কোনরকম কুসংস্কার ও পশ্চাদমুখী চিন্তা সেখানে স্থান পাইত না। আমাদের দেশের নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক রামমোহন রায়, হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণ প্রগতিশীল 'ইয়ং বেঙ্গল' দল এবং আরও অনেকে ডেভিড হেয়ারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পোষকতা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন।

রামমোহন রায়

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায় প্রত্যক্ষভাবে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ হিন্দুসমাজের প্রধানরা যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁহারা রামমোহনের ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত মতামতের জন্য

তাঁহার প্রতি আদৌ প্রীত ছিলেন না। তাই ইংরেজীশিক্ষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুকলেজের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮২২ সনে কলিকাতায় হেদুয়ার দক্ষিণপূর্ব কোণে নিজে **অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল** নামে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট যখন কলিকাতায় একটি 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন তখন রামমোহন পাশ্চাত্যবিদ্যা ও ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া গভর্ণর-জেনারেল আমহার্স্টকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন (১৮২৩), এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তাহা মূল্যবান দলিল হইয়া আছে। উক্ত পত্রে রামমোহন লেখেন: "গভর্ণমেণ্ট যদি প্রাচীন পদ্ধতিতে এদেশে সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে খুবই আক্ষেপের বিষয় হইবে। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে তাঁহারা এদেশের লোককে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী করিয়া রাখিতে চান, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া প্রকৃত শিক্ষিত করিতে চান না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই দেশের কল্যাণ কামনা করেন তাহা হইলে দেশের লোককে আধুনিক শিক্ষা দিতে হইবে—যেমন গণিত দর্শন রসায়ন শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান—যাহা শিক্ষা করিয়া ইউরোপের মানুষ নূতন বুদ্ধি ও দৃষ্টি লাভ করিয়াছে।"

রামমোহনের এই পত্রে তখন বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ আগেই বলিয়াছি যে এই সময় 'অ্যাংলিসিস্ট' ও 'ওরিয়েণ্টালিস্টদে'র মধ্যে শিক্ষার রীতি ও নীতি সম্বন্ধে বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল। এই বাক্‌যুদ্ধের অবসান হয় মেকলের আনুকূল্যে বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর (১৮৩৫)। ইহার পর হইতে সরকারী পোষকতার ফলে আমাদের দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইতে থাকে।

চার্লস উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন

১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক-মেকলের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রায় ২০ বছর পরে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস উড (Sir Charles wood) তাঁহার ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখের নির্দেশপত্রে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করেন। ইহার পর হইতেই সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে একটা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হয়। উডের 'ডেসপ্যাচ'

অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে 'ডিপার্টমেন্ট অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' স্থাপিত হয় এবং বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলিকাতায় এবং তাহার পর ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর ও এলাহাবাদে। ইহার পর হইতে সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আধুনিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হইতে থাকে ভারতবর্ষে।

বেথুন, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সমাজব্রতীদের উদ্‌যোগে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে থাকে। পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সমাজচেতনা ও সমাজদৃষ্টি বদলাইতে থাকে, ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন ক্রমে ব্যাপক রূপ ধারণ করে, নবযুগের সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয় এবং ক্রমে জাতীয়তাবোধেরও বিকাশ হয়।

সমাজসংস্কার

উনিশ শতকের নবজাগরণের ধর্মসংস্কারের সহিত শিক্ষা ও সমাজসংস্কার অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। রামমোহন যেমন একদিকে এক-ব্রহ্মের উপাসনার আদর্শ প্রচারের জন্য বহু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সতীদাহ, জাতিবর্ণভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীর কাছে যুক্তিপূর্ণ আবেদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার এক বা একাধিক স্ত্রী স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতেন। ইহাকে সহমরণ বা সতীদাহ বলা হইত। যাঁহারা স্বামীর সহিত স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিতেন তাঁহাদেরই প্রকৃত 'সতী' বলা হইত। এই সতীদাহ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়।

রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া আন্দোলন করিতে থাকেন। ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হইবে মনে করিয়া ইংরেজ শাসকরাও ইহা আইন করিয়া বন্ধ করিতে টালবাহানা করিতেছিলেন। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ গভর্নর-জেনারেল **উইলিয়ম বেন্টিক সতীদাহপ্রথা বেআইনী** বলিয়া ঘোষণা করেন। রামমোহন ও তাঁহার সহকর্মীদের

আন্দোলনেই বেণ্টিঙ্ক প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইবার পর সমাজসংস্কার আন্দোলনে নূতন প্রাণসঞ্চার হয়। ইংরেজী শিক্ষার সরকারী সমর্থন ও সতীদাহ নিবারণ বেণ্টিঙ্কের প্রধান কীর্তি।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে নবযুগের শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে আবির্ভূত হন **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।** বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে বহু পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের পক্ষে দেশের জনমত গঠনে অগ্রসর হন। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৫৫ তিনি বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন এবং ২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫ বহুবিবাহ আইনত বন্ধ করার জন্য আবেদন পাঠান। ১৬ জুলাই ১৮৫৬ বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং বিলম্ব না করিয়া সেই বছরই ৭ ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর নিজে উদ্‌যোগী হইয়া কলিকাতায় একটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহ। নারীজাতির মানবিক অধিকাব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের দান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা শতাধিক বছর পরে আজ আমবা কিছুটা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগরের কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের **তত্ত্ববোধিনী সভা** সামাজিক সংস্কারকর্মে ব্রতী হন, পরে কেশবচন্দ্র সেনের আমলে ইহা আরও ব্যাপক হয়। ১৮৭১ সনে কেশবচন্দ্র 'সমাজ-সংস্কার সভা' স্থাপন করিয়া নাবীকল্যাণ, নারীশিক্ষা, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭২ সনে কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল Civil Marriage Act নামে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ (divorce) স্বীকৃত হওয়ায় এদেশের স্ত্রীজাতি আর একটি সামাজিক ও মানবিক অধিকার লাভ করে আইনের চোখে। পরবর্তীকালে এই সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা জাতীয় আন্দোলনের ধারার সহিত মিশিয়া গিয়া বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।*

* ইহাব সহিত শেষ ৩৭ অধ্যায় পঠিতব্য।

QUESTIONS

1. What were the effects of the impact of Western education and ideas on our society ? Why it is called Renaissance ?
2. Write notes on :
   (a) Rammohan Roy
   (b) David Hare
   (c) William Bentinck

ত্রিংশ অধ্যায়

পাঞ্জাব। সিন্ধু। আফগানিস্তান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্ বেশ পাকাপোক্ত করিয়া ওয়েলেসলি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং ময়রা বা লর্ড হেস্টিংসের আমলে তাহা মারাঠাদের চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে আরও মজবুত হইয়াছিল। তাঁহার পরে আমহার্স্ট বেণ্টিঙ্ক অকল্যাণ্ড এলেনবরা হার্ডিঞ্জ ডালহৌসি ও ক্যানিংএর মতো শাসকরা ভারতের গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষপর্বের অনুষ্ঠান হয় ইঁহাদের শাসনকালে। সাম্রাজ্য বিস্তারের এই চূড়ান্ত পর্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১। ভারতের পশ্চিমদিকে বিস্তার।

২। ভারতমহাসাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বদিকে বিস্তার,

পশ্চিমদিকে বিস্তারের সহিত আফগানিস্তান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবের শিখদের কাহিনী জড়িত। পূর্বদিকে বিস্তারের সহিত বর্মা চীন আসাম ও সিঙ্গাপুরের ইতিহাসের সম্পর্ক আছে।

পাঞ্জাব ও রণজিৎ সিংহ

নাদির শাহ ও আহম্মদ সাহ্ আবদালির ভারত অভিযানের ফলে পাঞ্জাব অঞ্চলে মোগল কর্তৃত্ব লোপ পায়। ১৭৬৭ সনে আবদালি শেষবার ভারতে অভিযান করেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পাঞ্জাবে শিখজাতির রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ হয় এবং সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারা আফগান ও মোগল প্রাধান্য বিনাশের জন্য সংগ্রাম করে। রণজিৎ সিংহ ছিলেন একটি শিখগোষ্ঠীর (সুকেরচকিয়া) নায়কের পুত্র, আবদালির শেষ ভারত অভিযানের ১৩ বছর পরে ১৭৮০ সনে তাঁহার জন্ম হয়। দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন এবং ১৭ বছর বয়সে তাঁহার পিতার গোষ্ঠিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রণজিতের দূরদৃষ্টি সংগঠন শক্তি ও প্রতিভাবলে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত শিখজাতি একধর্মরাজ্যপাশে আবদ্ধ হয়। একটির পর একটি রাজ্য অধিকার করিয়া তিনি বিরাট একটি শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। লাহোর (১৭৯৯) ও অমৃতসর (১৮০৫) অধিকার

CHAPTER XXX : (1) Ranajit Singh—Anglo-Sikh relation, annexation of the Punjab.
(2) 1st and 2nd Afghan Wars.
(3) Annexation of Sind.

শিখ রাজ্য ১৮৪৬
সীমানা শতদ্রু নদী
চিত্রল
গিলগিট
কাবুল নং
কাশ্মীর
কাবুল
পেশোয়ার
আটক
শ্রীনগর
গজনী
কোহাট
রাওয়ালপিণ্ডি
কলাবাগ
কান্দাহার
জম্মু
আফগানিস্তান
বিতস্তা নং
চন্দ্রভাগা নং
ডেরা ইস্মাইল খাঁ
অমৃতসর
লাহোর
সিন্ধু নং
ফিরোজসাহ
ইরাবতী
কোয়েটা
ডেরা গাজী খাঁ
মুলতান
শতদ্রু নং
বাহাওয়ালপুর
বেলুচিস্তান
সক্কুর
রাজপুতানা
সিন্ধু
আজমীড়

করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হন। ক্রমে শতদ্রুনদীর পশ্চিম-তীরের শিখরাজ্যগুলি অধিকার করিয়া রণজিৎ প্রবল শক্তিশালী হইয়া ওঠেন।

রণজিতের নেতৃত্বে শিখশক্তির অভ্যুত্থান দেখিয়া ইংরেজরা স্বভাবতঃই আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন। মিণ্টো ছিলেন তখন গভর্ণর-জেনারেল, তিনি হঠাৎ রণজিতকে শত্রু করিতে চাহিলেন না। আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি চার্লস মেটকাফকে রণজিৎ সিংহের দরবারে পাঠান। এদিকে শতদ্রুর পূর্বতীরে রণজিৎ সিংহ লুধিয়ানা অধিকার করিয়া বসিলে (১৮০৬-৭) এই অঞ্চলের শিখ নায়করা শঙ্কিত হইয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। মিণ্টো একদল সৈন্য পাঠান রণজিতের বিরুদ্ধে, কিন্তু দূরদর্শী রণজিৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত মনে করিলেন না। তাহার ফলে অমৃতসরে ইংরেজদের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হইল (১৮০৯)। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পশ্চিমতীরস্থ শিখরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং পূর্ব-তীরস্থ শিখরাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

শতদ্রুর পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ নাই দেখিয়া রণজিৎ সিংহ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কাংড়া জেলা অধিকার করিলেন। আফগানদের পরাজিত করিয়া আটক দখল করিলেন (১৮১৩) এবং মোগল সম্রাটের কাছ হইতে নাদিরশাহ যে কোহিনুর মণি লইয়া গিয়াছিলেন তাহা শাহ সুজার কাছ হইতে উদ্ধার করেন। ক্রমে মুলতান (১৮১৮), কাশ্মীর (১৮১৯) ও পেশোয়ার (১৮১৯) তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইল। বেশ বড একটি শিখ-রাজ্যের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন রণজিৎ সিংহ।

তেজস্বিতা, বীরত্ব ও সংগঠনশক্তির জন্য রণজিৎ সিংহ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। রাজ্যশাসনেও তিনি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রজাদের উপর যাহাতে কোন পীড়ন না হয় সেদিকে তাঁহার সতর্ক-দৃষ্টি ছিল। ধর্মবিষয়ে তাঁহার কোন কুসংস্কার বা গোঁড়ামি ছিল না। যোগ্যতার মাপকাঠিতেই তিনি সব বিচার করিতেন। পাশ্চাত্ত্য সামরিক আদর্শে তিনি শিখসৈন্যদের সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই কারণে দেশবাসীর কাছে তিনি **পাঞ্জাব-কেশরী** নামে পরিচিত হন।

শেষজীবনে রণজিৎ সিংহ শিখশক্তির ভাঙ্গনের আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খড়ক সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্বল চরিত্রের জন্য এই ভাঙ্গন রোধ করিতে পারেন নাই। এক বছরের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয়। রণজিতের আর এক পুত্র শের সিংহ রাজা হন, কিন্তু আততায়ীর হাতে তাঁহারও মৃত্যু হয় (১৮৪৩)। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শিখসৈন্যদলের নায়করা প্রধান হইয়া ওঠেন এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। রণজিৎ সিংহের নাবালক কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং সৈন্যদলের নায়ক তেজ সিংহ সেনাপতি ও লাল সিংহ উজীর মনোনীত হন (১৮৪৫)। এই দুই জন শিখনেতার মধ্যে রাজপদ লাভের বাসনা প্রবল ছিল, স্বাধীনতা বা জাতীয় মর্যাদারক্ষার সংকল্প আদৌ সেই অনুপাতে দৃঢ় ছিল না।

হার্ডিঞ্জ ও প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬

রণজিতের উত্তরাধিকারীদের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া ইংরেজরা শিখশক্তির পতন আসন্ন মনে করিলেন। নিজেদের দুর্গগুলিকে তাঁহারা সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইংরেজদের প্রস্তুতি দেখিয়া শিখনেতাদের মনে সন্দেহ হইল যে, শিখরাজ্য আক্রান্ত হইবে। কাজেই বিলম্ব না করিয়া শতদ্রুর পূর্ব তীরস্থ ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চল শিখবাহিনী আক্রমণ করিল (১৮৪৫)। কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হইল। এই পরাজয়ের জন্য লাল সিংহ ও তেজ সিংহের বিশ্বাসঘাতকতাই দায়ী, তাঁহারা ইংরেজের আশ্রয়ে তখন মন্ত্রিত্ব-লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন। শিখবাহিনীর দৃঢ়তা, রণদক্ষতা ও বীরত্ব সত্ত্বেও ইংরেজরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ হয় হার্ডিঞ্জের আমলে।

ইংরেজরা লাহোর অধিকার করিবার পর (১৮৪৬) শিখদের সহিত সন্ধি হয়। এই লাহোরের সন্ধি অনুসারে শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজদের দখলে আসে, শিখবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ শিখদের কাছে ১৫ লক্ষ স্টার্লিং দাবী করা হয়। টাকা দিবার সামর্থ্য না থাকায় শিখরা কাশ্মীর ছাড়িয়া দিলেন এবং ইংরেজরা তাহা জম্মুর ডোগরা-সর্দার গুলাব সিংহের কাছে বেচিয়া দিলেন। শিখসৈন্যদের কামানগুলি ইংরেজদের হস্তগত হইল এবং লাহোরে একজন ইংরেজ

'রেসিডেণ্ট'-এর অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখারও ব্যবস্থা হইল। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব ইংরেজদের পদানত হইল।

ডালহৌসী ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৮-৪৯

ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অধীনে পাঞ্জাবের শাসনকার্য চলিতে লাগিল, নাবালক দলীপ সিংহ তাঁহারই রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। ডালহৌসির আমলে চারিদিকে শিখবিদ্রোহ দেখা দিল। মুলতানে বিদ্রোহ হইল (১৮৪৮), দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী নিহত হইলেন। বালক রাজার জননী রাণী ঝিন্দনকে ব্রিটিশ-বিরোধী চক্রান্তের জন্য চুনরদুর্গে নির্বাসন হইল। হাজারার শাসনকর্তা ছত্র সিংহ বিদ্রোহ করিলেন। তাঁহার পুত্র শের সিংহ ছিলেন শিখসৈন্যদের অধিনায়ক, তিনিও বিদ্রোহে যোগদান করিলেন। চারিদিকে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। ডালহৌসি স্থির করিলেন যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিবেন। চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাট নামক দুইটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯)। যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হইল। মুলতান বিধ্বস্ত হইল, ছত্র সিংহ ও শের সিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। নাবালক দলীপ সিংহকে ইংরেজরা সিংহাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিলেও পারিতেন। কিন্তু ডালহৌসি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি দলীপকে মাসহারা দিয়া সরাইয়া দিলেন এবং এক ঘোষণার দ্বারা পাঞ্জাব আত্মসাৎ করিয়া লইলেন (৩ মার্চ ১৮৪৯)। পাঞ্জাবে শিখশক্তির চরম বিপর্যয় হইল।

আফগানিস্তান

দুররানীবংশের পর যখন বরকজাই-বংশের দোস্ত মহম্মদ কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৮২৬-৬৩) তখন হইতে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হইতে থাকে। দোস্ত মহম্মদ জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। উনিশ শতকের ত্রিশের পর হইতে রাশিয়া যখন এসিয়ার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং পারস্যকে দলে টানিয়া আফগানিস্তান অর্থাৎ ভারত-সীমান্ত পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তখন হইতে রুশ আতঙ্ক ইংরেজদের মধ্যে প্রবল হইতে থাকে। ইংলণ্ডে পামারস্টোনের আমলে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে এই রুশবিদ্বেষ প্রকট হইয়া ওঠে, ভারতের সাম্রাজ্যবিস্তার নীতিতে ইহাই

প্রতিফলিত হয়। আফগানদের সহিত ইংরেজদের বিরোধের মূলে ছিল এই রুশবিদ্বেষ ও আতঙ্ক।

আফগান যুদ্ধ

১৮৩৬ সনে অকল্যাণ্ড ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে তিনি পামারস্টোনের যোগ্য মুখপাত্র ছিলেন, ভারতবর্ষে রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁহারও প্রবল ছিল। তাঁহার উপর রাশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য যখন হিরাট আক্রমণ করিল (১৮৩৭-৩৮) তখন অকল্যাণ্ড রাশিয়ার আতঙ্কে আফগানিস্তান সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন। এই সময় তিনি আলেকজাণ্ডার বার্নস নামে একজন অভিজ্ঞ কুটনীতিবিশারদকে ব্যবসাবাণিজ্যের দৌত্যকর্মে কাবুলে পাঠান। এই দৌত্যের পিছনে ছিল রাজনীতিক উদ্দেশ্য। দোস্ত মহম্মদের সহিত তিনি বন্ধুত্বের প্রস্তাব করেন। বন্ধুত্ব করিতে দোস্ত প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তিনি দাবী করেন রণজিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার। অকল্যাণ্ড উভয়সংকটে পড়েন—শিখনায়ক রণজিৎ সিংহ ও আফগান-নায়ক দোস্ত মহম্মদ, এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন না। অবশেষে শিখদের বন্ধুত্ব বেশী কাম্য মনে করিয়া তিনি পেশোয়ার প্রত্যর্পণের ব্যাপারে রণজিৎ সিংহের উপর চাপ দিতে রাজী হইলেন না। ইহাতে স্বভাবতঃই দোস্ত মহম্মদ বিচলিত হইলেন।

এই ঘটনার পর কাবুলের রুশ দূতের প্রতি আফগান আমীরের পক্ষপাতিত্ব পদে পদে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বার্নস কাবুল ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন (এপ্রিল ১৮৩৮)। আফগান আমীরের রুশপ্রীতির আধিক্যে অকল্যাণ্ডও বিচলিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন যে দোস্ত মহম্মদকে উচ্ছেদ করিয়া কাবুলের সিংহাসনে দুররানীবংশের পলাতক আমীর শাহ সুজাকে অধিষ্ঠিত করিবেন। যুদ্ধের যুক্তি হইল—ভারত সীমান্তে আফগানিস্তানের গুরুত্ব অত্যধিক এবং সেখানকার আমীর দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের তাঁবেদার নহেন। তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া শাহ সুজার মতো একজন তাঁবেদার আমীরকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইতে পারিলে ইংরেজরা নিশ্চিত হইতে পারেন। অতএব যুদ্ধ করিতে হইবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কান্দাহারের পতন হইল। (এপ্রিল ১৮৩৯)। গজনী ও কাবুল অধিকৃত হইল (আগস্ট ১৮৩৯)। শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইল। আফগান-যুদ্ধে অকল্যাণ্ডের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন স্যার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটেন, রাজনৈতিক বুদ্ধি তিনি অকল্যাণ্ডকে যোগান দিতেন। যুদ্ধের পর সব শান্ত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া তিনি কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদ হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেন। সামরিক অফিসারদের কাবুলে স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইবারও অনুমতি দেওয়া হয়। কটনের বদলে জেনারেল এলফিনস্টোন সৈন্যবাহিনীর নায়ক হন।

কিন্তু আফগানরা স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ জাতি, ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও শাসন মানিবার পাত্র তাহারা নহে। ম্যাক্‌নটেন উপরের শান্তভাব দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা ভুল। ভিতরে বিদ্রোহের যে চাপা আগুন জ্বলিতেছিল তাহা তিনি দেখিতে ও বুঝিতে পারেন নাই। সেই আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বার্নস নিহত হইলেন, কোষাগার লুট হইল। তাহার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ হত্যা করিলেন ব্রিটিশ ধুরন্ধর রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতা ম্যাক্‌নটনকে। কাবুল ছাড়িয়া, কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া চলিয়া আসাই সাব্যস্ত করেন এলফিনস্টোন (জানুয়ারি ১৮৪১)। ৬ জানুয়ারি ১৮৪২ প্রায় ১৬,০০০ সৈন্য, স্ত্রীপুত্রসহ জালালাবাদ অভিমুখে ডুলিতে চড়িয়া ও হাঁটিয়া যাত্রা করে। পথে দুর্ধর্ষ আফগানরা তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

অকল্যাণ্ড স্বদেশে ফিরিয়া যান। এলেনবরা এদেশে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৪২)। আফগানিস্তান ছাড়িতে হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইল আত্মমর্যাদা বজায় রাখিয়া কিভাবে ফিরিয়া আসা যায়। সেনাপতি নট (Nott) কান্দাহার হইতে এবং সেনাপতি পোলক (Pollock) জালালাবাদ হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া কাবুলে আসিয়া মিলিত হইলেন। শহর ও বাজার অগ্নিদগ্ধ করিয়া জিনিসপত্র লুট করা হইল, ঘরবাড়ি কামান দাগিয়া নিশ্চিহ্ন করা হইল। এইভাবে বীরত্বের বাজীখেলা দেখাইয়া ব্রিটিশশক্তির মর্যাদা রক্ষা করা হইল। তারপর কাবুল ছাড়িয়া ইংরেজসৈন্য খাইবার গিরিপথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলেন (১২ অক্টোবর ১৮৪২)। দোস্ত মহম্মদ কাবুলে ফিরিয়া গিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং আরও প্রায় একুশ বছর (১৮৬৩ সনে ৮০ বছর বয়সে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত) রাজত্ব করিলেন।

সিন্ধুদেশ জয়

আফগানিস্তানের পরাজয়ের গ্লানি ইংরেজরা পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন। পাঞ্জাব আত্মসাৎ করার কাহিনী আগেই বলা হইয়াছে। এলেনবরা আফগানিস্তানের প্রতিশোধ নিলেন সিন্ধুর আমীরদের উপর দিয়া। ইহা কতকটা বাহিরের কর্মক্ষেত্রে অপমানিত হইয়া আসিয়া ঘরে নিরীহ স্ত্রীপুত্রের উপর দাপট দেখাইয়া স্বমর্যাদা জাহির করার মতো। সিন্ধুদেশ তালপুর আমীরদের শাসনাধীনে ছিল এবং ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের কোন শত্রুতাও ছিল না। চার্লস নেপিয়ারকে সিন্ধুদেশে পাঠানো হইল আমীরদের সহিত নূতন চুক্তি করিবার জন্য। জেমস আউটরাম তখন হায়দারাবাদে (সিন্ধুর রাজধানী) ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট' ছিলেন, তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। কোন ফল হইল না। বালুচিরা বিদ্রোহ করিল, নেপিয়ার মিয়ানি ও দাবোর যুদ্ধে তাহাদের পরাজিত করিলেন। সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে আনা হইল (১৮৪৩)।

পশ্চিমভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পর্ব এইভাবে একরকম শেষ করা হইল। আফগানিস্তানে বিপর্যয় (১৮৪২), সিন্ধু জয় (১৮৪৩) এবং পাঞ্জাব জয় (১৮৪৯) এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

QUESTIONS

1. Discuss critically the Afghan policy of Auckland.

2. Give an account of the growth of Sikh power and Anglo-Sikh relations in the time of Ranajit Singh.

একত্রিংশ অধ্যায়

ডালহৌসির আমল

ভারতের ব্রিটিশ-শাসনের ইতিহাসে ডালহৌসির আমলকে স্বর্ণযুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডালহৌসী তাঁহার দূরদর্শী সাম্রাজ্যনীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে 'অখণ্ড ভারতে' পরিণত করেন। আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি নবযুগের ভারতের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেন।

স্বত্বলোপ নীতি ও ডালহৌসী

স্বত্বলোপ নীতিকে ইংরেজীতে "Doctrine of Lapse" বলা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই নীতির অর্থ হইল ভারতে ব্রিটিশের অধীন এবং ব্রিটিশের নিজের গঠিত কোন রাজ্যের রাজা যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর ন্যায্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সেই রাজ্য প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসিবে। কোন দত্তকপুত্র অথবা অন্য কোন উত্তরাধি-কারীর দাবী বিধিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হওয়া না-হওয়া সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাধীন থাকিবে। ডালহৌসি গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিবার অনেক আগেই ১৮৩৪ সনে কোম্পানির ডিরেক্টররা পরিষ্কার এই মর্মে এক বিধান জারী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন অপুত্রক দেশীয় রাজা দত্তক লইতে পারিবে না। অনুমতিও নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবে কদাচিৎ দেওয়া হইবে। ১৮৪১ সনেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষণা করা হয়। সুতরাং ১৮৪৮ সনে ডালহৌসি শাসনভার গ্রহণের আগেই স্বত্বলোপ নীতি সরকারী নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ডালহৌসি সেই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দিয়াছেন মাত্র।

CHAPTER XXXI.—Dalhousie—administrative measures, annexations, Doctrine of Lapse.

হিন্দুশাস্ত্রের বিধান ও হিন্দু আইন অনুযায়ী নিঃসন্তান ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এই দত্তক ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হইতে পারে। পুত্রের মতো ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য পালনের অধিকারও দত্তকের থাকে। ডালহৌসি এই হিন্দু আইনেব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে অপুত্রক রাজাব প্রতি দত্তকেব পুত্রবৎ যাবতীয় কর্তব্য পালনের অধিকার স্বীকৃত হইবে এবং অপুত্রক রাজার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ওয়ারিশও তিনি হইতে পারিবেন। তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের কোন আপত্তি নাই এবং কোন সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায়ও তাঁহাদের নাই। কিন্তু কোন রাজ্য কখনও কোন রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমিদারী বলিয়া গণ্য হইতে পাবে না, যেমন ইংলণ্ডের বা অন্য যে-কোন ছোট দেশেব রাজা সমগ্র দেশ বা রাজ্যটিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। কাজেই ভারতের ছোটবড যে-কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা তাঁহার সিংহাসনের উত্তবাধিকারী হিসাবে দত্তক লইতে পারিবেন না, এমনিতে মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেব মতো কাজকর্ম কবিবার জন্য এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওয়াবিশের জন্য দত্তক লইতে পারিবেন। অপুত্রক রাজার রাজ্যের শাসনভার সরাসবি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন।

ডালহৌসিব এই স্বত্বলোপ নীতি প্রথম প্রয়োগ করা হয় সাতারা রাজ্যেব উপর। ১৮১৮ সনে মারাঠা সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইযা যাইবাব পর ১৮১৯ সনে ব্রিটিশের কৃপায় এই সাতারা রাজ্য গঠিত হয়। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া দত্তক গ্রহণের অনুমতি চান, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে অনুমতি দেন না। অবশেষে ১৮৪৮ সনে মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বিনা অনুমতিতে দত্তক গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে আসিয়াই ডালহৌসি সাতাবার এই সমস্যার সম্মুখীন হন এবং স্বত্বলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনেন। উত্তরভারতে ঝাঁসির একটি ছোট মারাঠা-অধিকৃত রাজ্য ছিল, ১৮১৭ সনে পেশোয়া ইহা ইংরেজদের হস্তান্তরিত করেন। ১৮৩২ সন হইতে একজন রাজার অধীনে ইহা শাসিত হইত। ১৮৫৩ সনে ঝাঁসির রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাঁহার দত্তকপুত্রকে রাজ্যটি না দিয়া এই সময় ডালহৌসি আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। নাগপুরের ভোঁসলে রাজ্যকেও অনুরূপ কারণে ১৮৫৪ সনে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা হয়। মধ্যপ্রদেশের

ব্রিটিশ—ভারতের প্রসার
ক্লাইভ হইতে ডালহৌসি
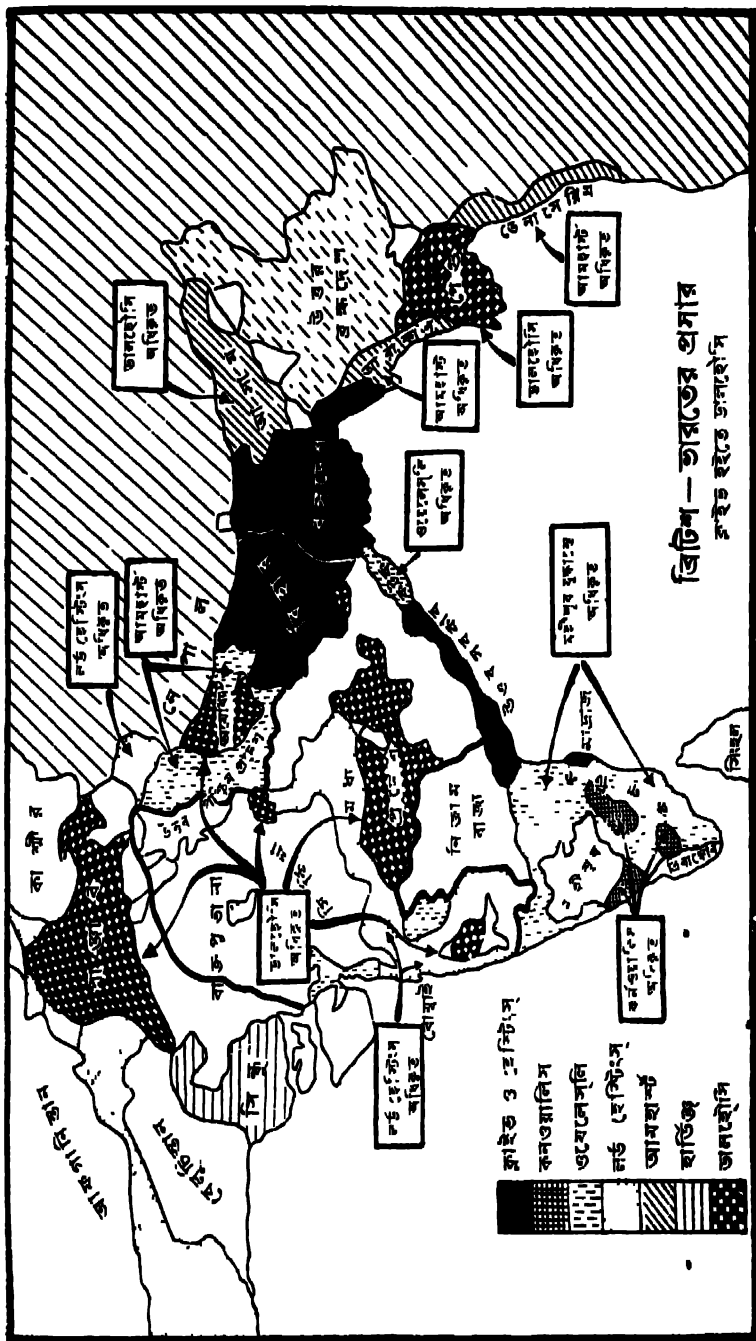
প্রায় পাঁচভাগের চারভাগ জুড়িয়া এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহা ছাড়া উড়িষ্যার সম্বলপুর রাজ্য, বুন্দেলখণ্ডের জৈতপুর, পাঞ্জাবের বাঘাত নামে ছোট একটি পার্বত্য রাজ্য, উদয়পুর, খান্দেশের বুদাওয়াল প্রভৃতি রাজ্য এই একই কারণে অধিকার করা হয়।

১৮৫০ সনে সিকিমের রাজা কয়েকজন ইংরেজের উপর অত্যাচার করিয়াছেন এই অজুহাতে সিকিমরাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ সরকার গ্রাস করেন। হায়দারাবাদের নিজাম কোম্পানিকে তাঁহার দেয় অর্থ দিতে পারেন নাই বলিয়া বেরার প্রদেশ ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হন (১৮৫৩)। ১৮৫৬ সনে অযোধ্যা রাজ্যও গ্রাস করা হয়, অযোধ্যার নবাবরা বংশপরম্পরায় কুশাসন ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কুশাসনের দোষে নবাবরা যে দোষী ছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু তাহার জন্য ব্রিটিশ শাসননীতি দায়ী বেশী, না অযোধ্যার নবাবরা, তাহা বিচার্য বিষয়। অযোধ্যা অধিকার করিয়া নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। তখন অযোধ্যার রেসিডেন্ট ছিলেন কর্নেল স্লিম্যান (Colonel Sleeman)। অযোধ্যার নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া রাজ্যদখল করিবার সময় স্লিম্যান ডালহৌসিকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহার জন্য অযোধ্যার মতো দশটি রাজ্যের মূল্য ব্রিটিশ সরকারকে খেসারত দিতে হইবে এবং ইহার ফলে ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ হইবে।" দূরদর্শী স্লিম্যানের সতর্কবাণী অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তব সত্যে পরিণত হইল।

ডালহৌসির কীর্তিবিচার

স্যার এডুইন আর্নল্ড ডালহৌসির কীর্তিকলাপ আলোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন—"We are making a people in India, where hitherto there have been a hundred tribes, but no people"—"আমরা ভারতীয়দের একজাতিতে পরিণত করিতেছি। আগে ভারতে বহু জনগোষ্ঠী ছিল বটে, কিন্তু এক ও অবিভক্ত ভারতজাতি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না।" ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষকে ডালহৌসি

ভারতবর্ষ
১৮৫৭
কাবুল
আফগানিস্তান
কান্দাহার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
লাহোর
পাঞ্জাব
দিল্লী
রাজপুতানা
আগ্রা
আজমীড়
সিন্ধু
করাচী
গুজরাট
নেপাল
ভুটান
পাটনা
বারাণসী
রেওয়া
বিহার
বঙ্গদেশ
ঢাকা
কলিকাতা
আকিয়াব
স্বাধীন
ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
রেঙ্গুন
নাগপুর
বোম্বাই
নিজাম
গোয়া
মহীশূর
মাদ্রাজ
ত্রিবাঙ্কুর
ব্রিটিশ রাজ্য
হিন্দু রাজ্য
মুসলমান রাজ্য
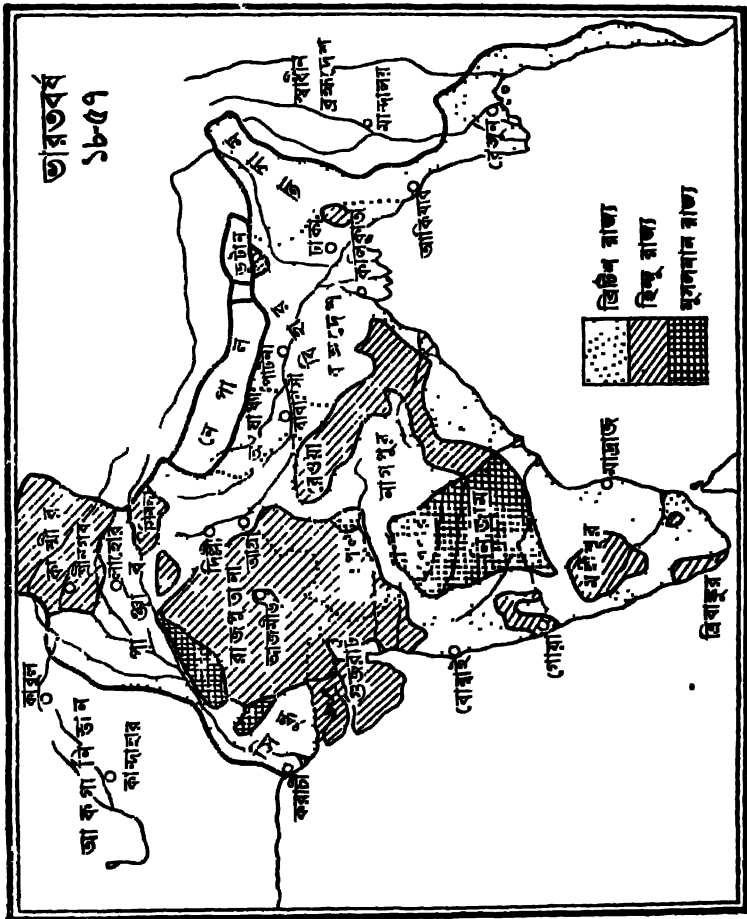
এক অখণ্ড ব্রিটিশ রাজ্যরূপে, একই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই ডালহৌসির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই একরাজ্যের বাস্তব ভিত্তিও ডালহৌসি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতের আধুনিক রেলপথ, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, জনকল্যাণকর্ম (Public Works), আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, স্কুলকলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ডালহৌসির শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৮৪৮-৫৬)। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বিদায়ের পর স্থাপিত হইলেও (১৮৫৭), চার্লস উডের বিখ্যাত শিক্ষা-সংক্রান্ত 'ডেসপ্যাচ' (জুলাই ১৮৫৪), যাহার ভিত্তির উপর আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিযাছে, ডালহৌসিই তাহা বাস্তবে রূপ দিয়াছেন। এইজন্য উইলিয়ম হাণ্টার বলিযাছেন—"the India created by Lord Dalhousie, is the India of today." সর্দার পানিক্করও ইহা সমর্থন করিয়া বলিযাছেন : "In fact politically and administratively, Dalhousie is the greatest of India's proconsuls ··India owes a heavy debt of gratitude to this great Scotsman."

কিন্তু ভারতের মতো বহুরাজ্য-বিভক্ত বিশাল দেশকে ডালহৌসি ব্রিটিশ শক্তির জোরে ঐক্যবদ্ধ করার যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার বিদায় গ্রহণের প্রায় এক বছরের মধ্যেই 'বিদ্রোহ' আকারে দেখা দিয়াছিল। এই বিদ্রোহকে সাধারণত "সিপাহীবিদ্রোহ" বলা হয়, কিন্তু ইহা শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ নহে, ক্ষমতাচ্যুত রাজা ও নবাবদের এবং কিছুটা ক্ষুব্ধ জনসাধারণেরও বিদ্রোহ।

QUESTIONS

1. Give an estimate of Dalhousie as a ruler and an administrator.

2. What is 'Doctrine of Lapse' ? How far it was effective in the consolidation of British rule in India ?

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

জাতীয় বিদ্রোহ

অযোধ্যার নবাবকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখন অযোধ্যার রেসিডেণ্ট স্লিম্যান সিপাহী বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ডালহৌসিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ডালহৌসির পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্যানিংএর পুত্র ভাইকাউণ্ট ক্যানিং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবার আগে কোম্পানির ডিরেক্টরদের তিনি বলিয়াছেন: "ভারতের রাজনৈতিক আকাশে একটা থমথমে ভাব দেখা যাইতেছে। হয়ত একখণ্ড মেঘ হঠাৎ এই আকাশে দেখা দিবে এবং সেই খণ্ডমেঘটি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতের বুকে ঝড়ের বেগে ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিবে।" ক্যানিং যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভারতে পৌঁছাইবার কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ কলিকাতার কাছে দমদমের হিন্দু সিপাহীরা নূতন চর্বি-মাখানো বন্দুকের কার্তুজ ব্যবহার করিতে আপত্তি করে, ২৯ মার্চ বারাকপুরের একজন ইংরেজ সামরিক কর্মচারী হিন্দু সিপাহীর হাতে নিহত হন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঘটনাটি বহুদিনের বহু অভিযোগের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগের মতো। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহ সারা উত্তরভারতে ছড়াইয়া পড়ে, বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে দিল্লী লক্ষ্ণৌ কানপুর রহিলাখণ্ড মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড। ১০ মে ১৮৫৭ মীরাটের সিপাহীরা (তিনটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট) প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের এই আঞ্চলিক রূপ দেখিয়া বোঝা যায় যে ডালহৌসির স্বত্বলোপ নীতি সাতারা নাগপুর ঝাঁসি অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করার ফলে এই সব অঞ্চলের

CHAPTER XXXII : The Indian Revolt—its character and consequences.

সর্বস্তরের লোকের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী অসন্তোষ ও অভিযোগ ধূমায়িত হইতেছিল। অযোধ্যা উত্তরভারতের মুসলমানদের কাছে গৌরবের কারণ ছিল এইজন্য যে, ইহা তাহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের শেষ প্রতীকরূপে ছিল। অযোধ্যার নবাব বিতাড়িত হইবার পর দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত মুসলমানদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এদেশে মুসলমানরাজত্বের যুগ বাস্তবিকই শেষ হইয়াছে। উত্তরভারতে মারাঠারা ছিল হিন্দুরাজ্যের শেষ প্রতিনিধি। সিন্দিয়া হোলকার ভোঁসলে প্রভৃতি বড় বড় রাজবংশগুলি যখন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হইয়া গেল, সাতারা নাগপুর ঝাঁসি পর্যন্ত যখন ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হইল, তখন মারাঠা ও উত্তরভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে লাগিল। এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল মীরাটে, দমদম ও বারাকপুরে সিপাহীরা ইহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল মাত্র।

মীরাটের বিক্ষোভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহীরা দিল্লী অধিকার করিল, হতভাগ্য মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া 'ভারতসম্রাট' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা বিদ্রোহীদের এক বিস্ময়কর কীর্তি এবং ব্রিটিশযুগে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টা।

১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী পুনরধিকৃত হয়, যুদ্ধে জন নিকলসন মারা যান। বাহাদুর শাহকে গ্রেফ্‌তার করিয়া নির্বাসন দেওয়া হয় এবং রেঙ্গুনে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৬২)। লক্ষ্ণৌ-এর সিপাহীরা রেসিডেন্সি অবরোধ করিলে হেনরি লরেন্স যুদ্ধে নিহত হন, ব্রিটিশরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে। ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে কলিন ক্যাম্পবেল শহরটি পুনরধিকার করেন। ইহার পর অযোধ্যার বিদ্রোহও আয়ত্তে আসে এবং ১৮৫৮ সনের শেষে অধিকাংশ বিদ্রোহী নেপাল-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করে।

কানপুরের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয়-বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র বিখ্যাত **নানা সাহেব**। এই বিদ্রোহে বহু ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি এমন কি নারী ও শিশুরা পর্যন্ত নিহত হয়। নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু ১৮৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিন ক্যাম্পবেল কানপুর পুনরুদ্ধার করেন। বেরিলিতেও বিদ্রোহ হয়, ১৮৫৮ সনে মে মাসে ইংরেজরা বেরিলি দখল করেন।

জাতীয় বিদ্রোহের কারণ
মুসলমানপ্রধান অঞ্চল
অযোধ্যা ১৮৫৬
ঝাঁসি ১৮৫৩
ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার
নাগপুর ১৮৫৪
বঙ্গদেশ
বেঙ্গল আর্মি বিদ্রোহ করে
বোম্বাই শান্ত ছিল
সাতারা ৮৪৯
মাদ্রাজ শান্ত ছিল
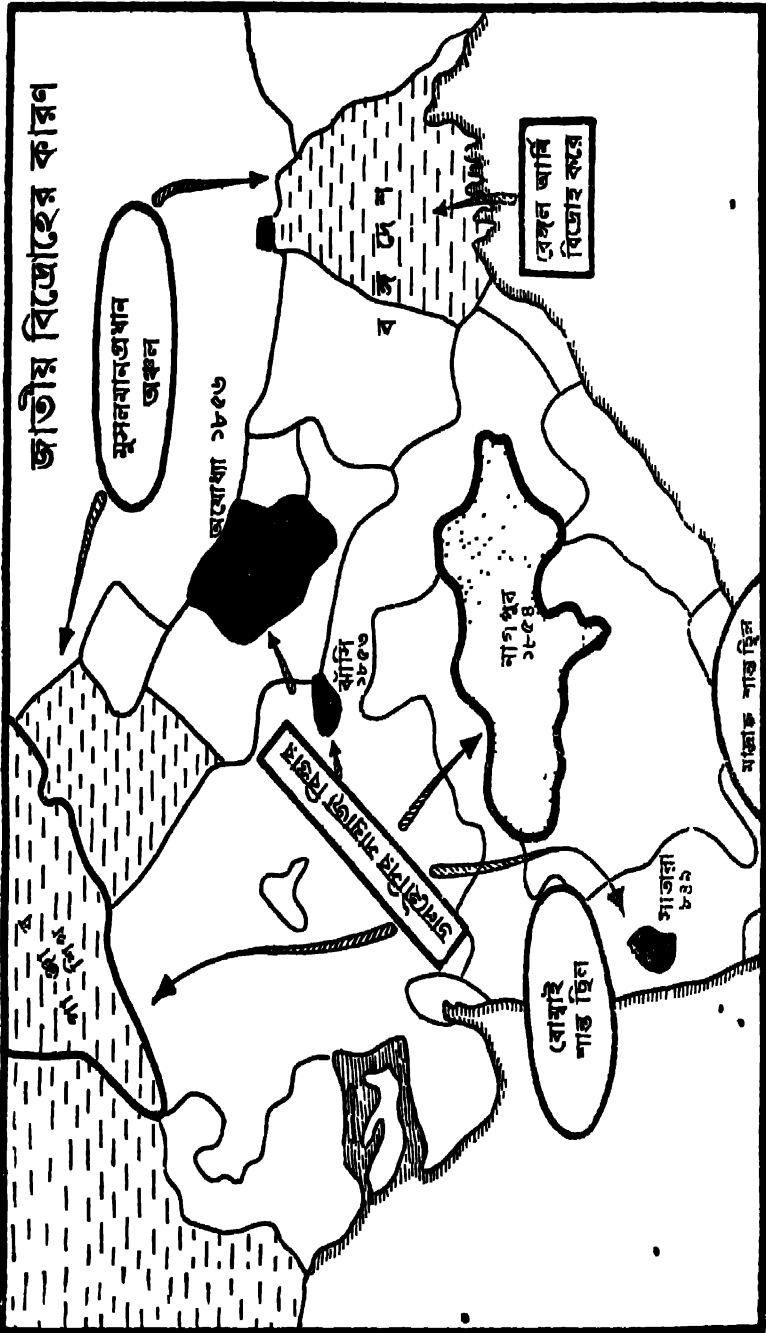
মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঝাঁসিতে বিদ্রোহীদের নেত্রী ছিলেন **রানী লক্ষ্মীবাঈ**। তিনি ছিলেন রাজরানী। অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বামীর রাজ্য ডালহৌসি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, রানী তাহা ভুলিতে পারেন নাই। বিদ্রোহে তাঁহার সহকারী ছিলেন নানা সাহেবের সেনাপতি **তাঁতিয়া টোপি**। ইংরেজপক্ষে এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের ভার ছিল স্যার হিউ রোজ-এর উপর। ১৮৫৮ সনের এপ্রিল-মে মাসে তিনি ঝাঁসি অধিকার করিলে রানী ও তাঁতিয়া গোয়ালিয়র দখল করিয়া ব্রিটিশের অনুগত সিন্ধিয়াকে আগ্রায় আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। ১৮৫৮ সনের জুন মাসে ইংরেজরা গোয়ালিয়র অধিকার করেন। পুরুষের বেশে লক্ষ্মীবাঈ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁতিয়া টোপি ধরা পড়েন, বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। নানা সাহেব পলায়ন করেন নেপালে, শোনা যায় সেখানেই অজ্ঞাতবাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিহারে **কুনওয়ার সিংহ** নামে একজন রাজপুত জমিদারের নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। মধ্যভারত ও উত্তরপ্রদেশের স্থানে স্থানে কুনওয়ার বিদ্রোহীদল গঠনের চেষ্টা করেন। রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রতেও কিছু কিছু বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। মাদ্রাজে কোন গোলযোগ হয় নাই। পাঞ্জাবও একরকম শান্ত ছিল। দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকে ব্রিটিশের সহিত বিদ্রোহ দমনে হাত মিলাইয়াছিলেন। এযুগের ভাষায় তাঁহাদের 'কুইজলিং' বা 'পঞ্চম-বাহিনী' বলা যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হায়দারাবাদের নিজাম।

বিদ্রোহের এই বহুরূপের মধ্যেও দেখা যায় যে বিদ্রোহীদের একটি লক্ষ্য স্থির ছিল। উপরের বড় বড় রাজা নবাব হইতে নীচের সাধারণ সিপাহী ও মানুষ পর্যন্ত সকলেই বিদ্রোহ করিয়া বিদেশী ব্রিটিশের শাসনমুক্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। পানিক্কর বলিয়াছেন: "In that sense the 'mutiny' was no 'mutiny' at all, but a great national uprising…it was a heroic effort of a dispossessed people to reassert their national dignity." বিদেশীর শাসনমুক্ত হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষার জন্যই ইহাকে 'মিউটিনি' বা 'সিপাহীবিদ্রোহ' বলা সংগত নহে, জাতীয় অভ্যুত্থানই বলা উচিত।

জাতীয় বিদ্রোহ ১৮৫৭-৫৮
বিদ্রোহের এলাকা
মিরাট
দিল্লী
নেপাল
অযোধ্যা
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
এলাহাবাদ
গোয়ালিয়র
ঝাঁসি
বুন্দেলখণ্ড
ব্রিটিশ আক্রমণ
ফেব্রুয়ারী—জুন ১৮৫৮
ব্রিটিশ আক্রমণ
ব্রিটিশ আক্রমণ
বারাকপুর
দমদম
কলিকাতা
ইন্দোর
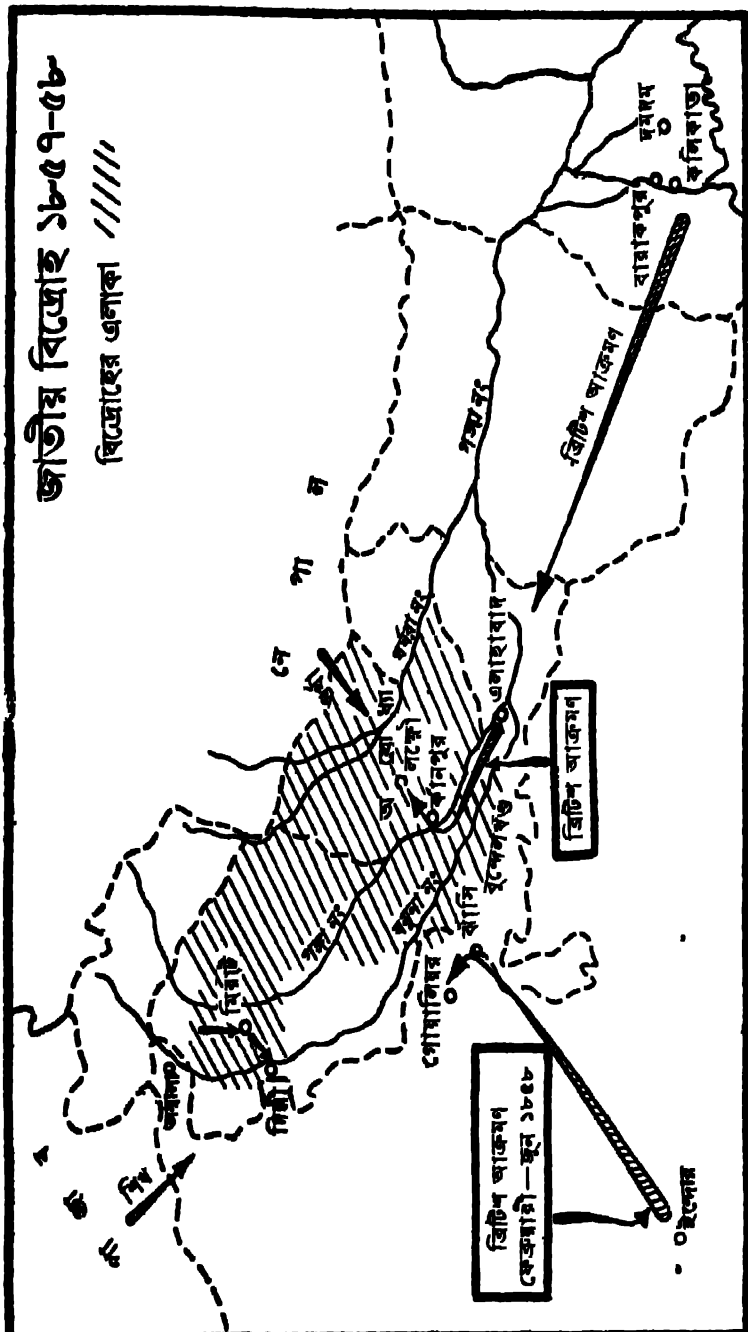
বিদ্রোহের ফলাফল

পনিক্করের ভাষায় এই বিদ্রোহকে "the Great Divide in modern Indian history" বলা যায়। ব্রিটিশ শাসনের দুইটি যুগ এই বিদ্রোহের পর হইতে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একটি যুগকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল, আর-একটি ব্রিটিশ রাজশক্তির (Crown) অধীন আমল বলা যায়। বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির আমলের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে ভারতশাসনের সূচনা হইয়াছে। এইজন্য এই বিদ্রোহকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে "the Great Divide" বলা হইয়াছে।

বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ সনেই পামারস্টোন কোম্পানির চেয়ারম্যান রস ম্যাঙ্গলসকে (Ross Mangles) জানান যে কোম্পানির শাসনে ভারত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আর ইচ্ছুক নহে। এই মর্মে পার্লামেণ্টে এক বিল উত্থাপন করিয়া ভারতসাম্রাজ্যকে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশরাজের শাসনে আনার প্রস্তাব করা হইবে, ইহাও তাঁহাকে জানানো হয়। কোম্পানির ডিরেক্টররা এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেদের কৃতিত্বের কথা সগর্বে ঘোষণা করিয়া পার্লামেণ্টে আবেদন করেন, কিন্তু তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ২ আগস্ট ১৮৫৮ ভারতে সুশাসনের (Act for the better Government of India, 1858) অ্যাক্ট পাস করা হয় এবং স্থির হয় যে কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল-এর পরিবর্তে একজন "সেক্রেটারী অফ স্টেট' ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের সহায়তায় ভারতশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইবেন 'ভাইসরয়' বা রাজ-প্রতিনিধি। মহারানী ভিক্টোরিয়া ১ নভেম্বর ১৮৫৮ তাঁহার ঐতিহাসিক ঘোষণায় (Queen's Proclamation বলা হয়) এই নূতন ব্যবস্থা জ্ঞাপন করেন।

QUESTION

1. Discuss the causes and character of the Revolt of 1857 and its consequences.

ত্রিত্রিংশ অধ্যায়

পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার

ইংরেজদের বাণিজ্যস্বার্থই ছিল প্রধান। এই বাণিজ্যের জন্যই তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। তারপর ইতিহাসের ঘটনাচক্রে তাঁহাদের বণিকের মানদণ্ড ভারতে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে। সাম্রাজ্যবিস্তারের চূড়ান্ত পর্বে পশ্চিমের সীমান্তসমস্যার একরকম সমাধান করিয়া তাঁহারা পূর্বদিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বাণিজ্যের দিক হইতে পূর্বদিকের গুরুত্ব আরও বেশী, কারণ ভারতসমুদ্রের পথে উপদ্রব করিতে পারে এরকম দেশের সংখ্যা বর্মা হইতে মালয় শ্যাম পর্যন্ত কম নহে, এবং কম হইলেও তাহারা যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে পারে। কেবল মালয় শ্যাম বা ইস্ট ইণ্ডিজের বাণিজ্য নহে, চীনের সহিত বাণিজ্যের পথ সুগম ও সুরক্ষিত রাখিতে হইলে ভারতসমুদ্রকে, অর্থাৎ সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলিকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ আয়ত্তে আনিতে হয়, কাহাকেও বেশী মাথা তুলিতে দেওয়া যায় না। ভারতসমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার লইয়া দক্ষিণভারতের চোলরাজাদের সহিত শৈলেন্দ্রবংশের রাজাদের বিরোধ ও সংঘর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল, সেকথা আমরা জানি। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজরা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে প্রথমে মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখন সমস্যা হইল সমুদ্রপথের মধ্যবর্তী দক্ষিণ-এসিয়ার অন্য দেশগুলি।

বর্মার সহিত যুদ্ধ

দক্ষিণএসিয়ার দেশগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে বর্মা ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশে যখন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্য নির্ধারিত হইতেছিল তখন বর্মায় আলমপ্রা নামে একজন বর্মী সর্দার একটি নূতন রাজবংশ স্থাপন করিয়া শ্যামদেশের থাইদের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং পেগু ও তেনাসেরিম দখল করেন। তাঁহার বংশধর বোদাপায়া আরাকান অঞ্চল অধিকার করিয়া (১৭৮৫) মণিপুর (১৮১৩) ও আসাম পর্যন্ত (১৮১৬) অগ্রসর হন। আরাকান দখল করিবার পর বর্মীরা লর্ড হেস্টিংসের কাছে (তখন গভর্নর-জেনারেল ছিলেন) চট্টগ্রাম, ঢাকা, এমন

CHAPTER XXXIII—Expansion towards the East, Singapore, Burmese Wars, Assam.

কি মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত দাবী করিয়া বসেন (১৮১৮)। আমহার্স্ট যখন গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন (১৮২৩) তখন বর্মীরা সাম্রাজ্যক্ষুধায় অস্থির হইয়া চট্টগ্রামের কাছে একটি দ্বীপ আক্রমণ করে এবং আসাম-সীমান্ত পর্যন্ত হামলা করার হুমকি দিতে থাকে (সেপ্টেম্বর ১৮২৩)। ব্রিটিশ অনুরোধ-উপরোধ সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

প্রথম বর্মাযুদ্ধ (১৮২৪-২৬)

বর্মীদের মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া কোন লেখক বলিয়াছেন—"From the king to the beggar they were hot for a war with the English"—বর্মার রাজা হইতে ভিখারি পর্যন্ত সকলেই তখন ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তপ্ত হইয়াছিল। আপসে মীমাংসার কোন উপায় নাই দেখিয়া আমহার্স্ট শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮২৪)। চারটি অঞ্চল কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ চলিল—আসাম, আরাকান, ইরাবতী নদীর নিম্ন-উপত্যকা ও তেনাসেরিম। দুই বছর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রথমদিকে আঞ্চলিক পথঘাটের অসুবিধার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য সুবিধা করিতে পারে নাই, পরে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহারা যুদ্ধে জয়ী হইতে থাকে। তেনাসেরিম সমুদ্রপথে অভিযানের ফলে অধিকৃত হয় (১৮২৪) এবং বর্মার রাজধানী পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইয়া যায়। এই সময় বর্মার সহিত সন্ধি হয় (১৮২৬) এবং বর্মীরা আরাকান ও তেনাসেরিম ইংরেজদের ছাড়িয়া দেয়, আসাম ও কাছাড় হইতে সরিয়া আসে এবং মণিপুরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নেয়। এই সময় আসাম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ইহা ছাড়া ১০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে, বাণিজ্যচুক্তি করিতে ও একজন ব্রিটিশ 'রেসিডেণ্ট' বা পরামর্শদাতা রাখিতে বর্মীরা স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ (১৮৫২)

ইহার পর ডালহৌসীর আমলে দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ হয় প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে। বর্মার ব্রিটিশ বণিকরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ করিতে থাকেন (১৮৫০-৫১)। এই সময় কোন কারণে বর্মা হইতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট চলিয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য বাণিজ্য সম্বন্ধে

সমস্ত আলোচনা বর্মার কর্তৃপক্ষের সহিত জাহাজের ক্যাপটেনদের করিতে হইত। একাজে তাঁহারা আদৌ পটু ছিলেন না, কাজেই উভয়পক্ষে ভুল বোঝার সুযোগ ঘটিল। এই ভুল বোঝার জন্যই দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ হয়। ডালহৌসি যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু যুদ্ধ কয়েকমাস মাত্র স্থায়ী হয় (মার্চ হইতে ডিসেম্বর ১৮৫২)। বর্মার নিম্নভাগ ব্রিটিশের করতলগত হয় এবং পেগু সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন—"This war marked the real beginning of the British period in Burma"—এই দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ হইতেই বর্মায় ব্রিটিশ শাসন পর্বের সূচনা হয়, কারণ আগে যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করা হইয়াছিল তাহা ঠিক বর্মার ভিতরে অবস্থিত ছিল না, ধারেপাশে ছিল। ইহার প্রায় ৩২ বছর পরে (১৮৮৫ সনে) ডাফরিনের শাসনকালে বর্মার সহিত আর একটি যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বর্মার উত্তরভাগও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৮৮৬)।

সিঙ্গাপুর পত্তন

বর্মার সমস্যা ছাড়াও পূর্বদিকে বাণিজ্যের স্বার্থে আরও অনেক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল। ভারতসমুদ্রপথে চীনদেশ ও ইস্ট ইণ্ডিজের সহিত নির্বিঘ্নে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার জন্য মধ্যপথে একটি মজবুত ঘাঁটি ও বন্দর ব্রিটিশের অধিকারে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই ঘাঁটি নির্বাচিত হইল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর দ্বীপ মালয়ের দক্ষিণে ভারত-সমুদ্রে অবস্থিত, 'সিংহপুর' নাম হইতে সিঙ্গাপুর নাম হইয়াছে। কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেলস এই দ্বীপটিকে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত করার পরামর্শ দেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রথমে ইহা ইজারা নেন (১৮১৯), তখন ইহা জলাজঙ্গলে ভর্তি ছিল। ধীরে ধীরে ইহাকে একটি সুন্দর শহর, বন্দর ও বাণিজ্যঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। ১৮২৪ সনে কোম্পানি ইহা স্থায়িভাবে গ্রহণ করেন। প্রথমে ইহা পেনাঙ ও মালাক্কার সহিত শাসনকার্যের জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির সহিত যুক্ত ছিল, পরে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিব ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮৮৭)।

QUESTION

1. Give an account of the British policy of expansion towards the East, with reference to Burmese wars.

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী আন্দোলন

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সুসংহত সংগঠন ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার অভাবে ব্যর্থ হইলেও, হাজার হাজার শহীদের আত্মবলিদানের ফলে ভারতজনের মনে দেশাত্মবোধের দ্রুত বিকাশ হইতে লাগিল। দমদম ও বারাকপুরের সিপাহী-বিক্ষোভ হইতে বিদ্রোহের সূচনা হইলেও বাংলাদেশের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। বরং দেখা যায় যে শিক্ষিত বাঙালীরা সেই সময় বিদ্রোহের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্রোহের পরে বাংলাদেশেই দেশাত্মবোধের দ্রুত বিকাশ হইয়াছে এবং শিক্ষিত বাঙালীরাই তাহাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিযাছেন। ১৮৫৯-৬০ সন হইতে বাংলার চাষীরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে তাহাই ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনেব পথ তৈরী করিয়া দেয়। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালীবা এই সময় বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী কৃষকদের দাবী সমর্থন করেন। ষষ্ঠ শতকের জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা (১৮৬১), স্বাদেশিকের সভা (১৮৬৫), হিন্দুমেলা ইত্যাদির ভিতর দিয়া এই নূতন জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হইতে থাকে। ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৫৭), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভা (১৮৭৬), ষ্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা ইত্যাদি, প্রতিষ্ঠার ফলে এই জাতীয় চেতনা সপ্তম দশকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে। এই সময় পুনাতেও ভারতসভার মতো 'সার্বজনিক সভা' স্থাপিত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নেতারা পদার্পণ করেন।

CHAPTER XXXIV—(1) Lytton and his policy. Ripon's reforms, Ilbert Bill.

(2) Growth of political consciousness. Indian National Congress.

(3) Curzon,—partition of Bengal—Swadeshi Movement. Extremists in Bengal.

লিটনের শাসন ও তাহার প্রতিক্রিয়া ১৮৭৬-৮০

সুরেন্দ্রনাথ ও ভারতসভার যুগে লিটন এদেশে ভাইসরয় হইয়া আসেন এবং এমন কতকগুলি অপকর্ম তিনি করেন যাহাতে ইংরেজ-ভারতীয়দের জাতি-বৈরতা আরও দ্রুত তীব্র হইয়া ওঠে। ভারতে আসিয়া লিটন দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বাধাইয়া দেন এবং তাহাতে তাঁহার অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। ভারতের হিন্দুরা তো নয়ই, মুসলমানরাও এ ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লিটন ভারতে গৃহযুদ্ধের এক কাল্পনিক বিভীষিকা দেখিয়া **অস্ত্র আইন** (Arms Act) পাস করেন। কোনরকম অস্ত্র ধারণ ও বহন ভারতীয়দের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হয়, কিন্তু ইংরেজদের এই আইনের আওতায় আনা হয় না। অস্ত্রধারণ নিষেধ করা ছাড়াও লিটন একটি আইন পাশ করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। এই আইন **ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট** (১৮৭৮) নামে পরিচিত। ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলিকে এই আইনের বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও লিটন বুঝাইয়া দেন যে ব্রিটিশের সহিত এদেশী লোকের পার্থক্য আছে—ব্রিটিশদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভারতীয়দের তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। এই দুইটি আইন—অস্ত্র আইন ও দেশীয় সংবাদপত্রের মতামত নিয়ন্ত্রণ আইন—বিধিবদ্ধ করিয়া লিটন ইঙ্গ-ভারতীয় জাতিবৈরিতায় যে ইন্ধন যোগান তাহা সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করে।

রিপনের সংস্কারকর্ম ১৮৮০-৮৪

লিটনের অপকীর্তি রিপন যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করেন। দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লিটন যে কুখ্যাত আইন পাশ করিয়াছিলেন, রিপন তাহা রদ করিয়া দেন। ১৮৮৫ সনে যে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হইলে এদেশের কৃষকদের দুঃখদুর্দশা কিছুটা দূর হয়, তাহারও মূলে ছিলেন রিপন। ১৮৮৫ সনে বাংলাদেশে যে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন' (Local Self-Government Act) পাশ হয় তাহাও পূর্বে রিপনের চেষ্টার জন্য হইয়াছিল। নির্বাচননীতি প্রসারিত করিয়া রিপন দেশীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছুটা জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। গ্রামাঞ্চলে লোকাল

বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডও তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই সব জনহিতকর কাজ করিয়া রিপন এদেশবাসীর কাছে বিশেষ প্রিয় হইয়া ওঠেন।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন ১৮৮২-৮৩

রিপন সাহস করিয়া এই সময় আরও একটি বড কাজ করিতে গিয়াছিলেন। এই কাজটি হইল অপরাধ বিচারকালে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে যে জাতিগত বৈষম্য ছিল তাহা দূর করা। ইউরোপীয়দের ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ব্যাপারে এদেশের জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। রিপন-বিচারবিভাগের এই ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবধান দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার আইনসচিব ছিলেন স্যার কোর্টনি ইলবার্ট (Courtney Ilbert)। সেইজন্য ইলবার্টকে তিনি এই মর্মে এমন একটি আইনের খসড়া করিতে বলেন যাহাতে বিচারক্ষেত্রে এই বর্ণ-বৈষম্য দূর হইয়া যায়। আইনসচিব ইলবার্ট এই আইনটি খসড়া করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ এই আইনের খসড়াটি যখন ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হয় তখন বাহিরের ইউরোপীয় সমাজে হঠাৎ যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো অবস্থা হয়। শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা জেলেবেগুনে খেপিয়া ওঠেন, কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রা তাঁহাদের অপরাধের বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন, ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। ভারতের সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ রিপনের উপর খড়্গহস্ত হইলেন, এমন কি তাঁহাকে ধরিয়া জোর করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবারও ষড়যন্ত্র হইল। এক বছর পরে ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩ এই আইন সংশোধিত আকারে পাশ হইল। ইউরোপীয়রা জুরীর দ্বারা বিচারের অধিকার পাইলেন।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন এদেশের লোকের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল-যে ইংরেজরা তাহাদের পরাধীন বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং এই অবজ্ঞা জাতিগত। ইহা বুঝিবার পর ইঙ্গ-ভারতীয় জাতিবৈরিতা যে দ্রুত দাবানলের মতো জ্বলিয়া উঠিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ভারতসভার চেষ্টায় কলিকাতায় একটি 'ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স' আহ্বান করা হইল এবং আলবার্ট হলে (কলেজ স্কোয়ারে) তাহার অধিবেশন হইল (ডিসেম্বর ১৮৮৩)।

সুরেন্দ্রনাথ আবার ভারতভ্রমণে বাহির হইলেন এবং সমগ্র উত্তরভারতে একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করিলেন। জনসাধারণের বিপুল সাড়া পাইয়া তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ' প্রকাশিত হয় (১৮৮২ ডিসেম্বর)। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত ইহাতেই উদ্‌গীত হয়—

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্

দ্বিতীয়বার কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং এইবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রূপ বাংলার এই জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ১৮৮৫ সনের ২৭ ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়, পরদিন ২৮ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বোম্বাইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

জাতীয় জাগরণ

বাংলাদেশে এই জাতীয় আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। পুনায় 'সার্বজনিক সভা, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা', বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম স্থাপিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে সর্বভারতীয় রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন সার্বজনিক সভার প্রাণ। পুনার বিখ্যাত মনীষী বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লঙ্কার 'নিবন্ধমালা' পত্রিকার মাধ্যমে মারাঠাজাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেন। বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিজিভাই, বদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা মেহতা ও দিনশা ওয়াচা। মহাজনসভার প্রাণ ছিলেন সুব্রহ্মণ্য আয়ার। ইহারা সকলে উদ্‌যোগী হইয়া ১৮৮৫ সনের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। বিদেশীদের মধ্যে হিউম ছিলেন অন্যতম উদ্‌যোগী। কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। একটি রয়েল কমিশন নিয়োগ করিয়া ভারতশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবী জানানো হয়, ভারত-সচিবের 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামে পরিষদ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করা হয়, নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলি সংস্কাব করিয়া অন্তত অর্ধেক ভারতীয় প্রতিনিধি লইবার দাবী করা হয়। কেহ কেহ বিদেশী দ্রব্য কেনা বন্ধ করিয়া স্বদেশী শিল্পের পোষকতার জন্যও অধিবেশনের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন কবেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ধীরে ধীরে তাহা বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের জাতীয় আশা-আকাজ্ক্ষার প্রতিভূ হইয়া ওঠে।

লর্ড ক্রস-এর অ্যাক্ট। কাউন্সিল আইন ১৮৯২

কাউন্সিল আইন ১৮৯২। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সংবাদপত্র সভা-সমিতি ইত্যাদিব ভিতর দিয়া ব্রিটিশের কাছে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ পেশ করিয়া তাহা যথাসম্ভব আপসে পূরণ করিবাব চেষ্টা করা। কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন বা সংগ্রামের কথা তাঁহারা তখন বিশেষ চিন্তা করিতেন না। শাসনব্যবস্থায় ও সবকারী কাজকর্মে শিক্ষিত ও সংগতিপন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী যাহাতে ব্রিটিশের অংশীদার হইতে পারেন, তাহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কাম্য। ইংরেজ শাসকরাও ভারতীয় মধ্যবিত্তের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। কাজেই তাঁহারা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দাবী কিছুটা পূরণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের পথ রোধ করিতে চাহিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৬১ সনে যে "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট" পাশ করা হইয়াছিল তাহাতে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন আইনসভার সদস্য হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের গবর্নমেণ্ট মনোনয়ন করিতেন এবং এই মুষ্টিমেয় সদস্যদের ক্ষমতাও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯২ সনে ল্যান্সডাউনের শাসনকালে যে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ করা হইল তাহাতে ভারতীয় সদস্যদেব সংখ্যা ও ক্ষমতা দুই-ই আরও খানিকটা বৃদ্ধি করা হইল। তখন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড ক্রস (Lord Cross), এইজন্য ১৮৯২ সনের "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট"কে লর্ড ক্রস্-এর

অ্যাক্টও বলা হয়। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যরা কেবল ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে নহে, সরকারী বাজেট ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা ও সমালোচনা করার অধিকার পাইলেন। ইহা যে একটি খুব বড অধিকার তাহা নহে, তবে সেই সময় এই অধিকারটুকু পাইয়াই গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ ও অন্যান্য জাতীয় নেতারা ব্রিটিশ শাসন-নীতির সমালোচনার ভিতর দিয়া জনসমাজে জাতীয়তাবোধের প্রসারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কার্জনের শাসননীতি

উনিশ শতকের শেষ বছরে, ১৮৯৯ সনে, জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন ভারতের ভাইসরয় হইয়া আসেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীব অহমিকা ও একগুঁয়েমি যে কার্জনের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহা তাঁহার কয়েকটি কর্মনীতির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি এমন কতকগুলি কাজ করেন যাহাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহানুভূতি হইতেও তিনি বঞ্চিত হন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ব্রিটিশ শাসকবা এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেব কিছুটা তোষণ করার চেষ্টা করিতেন। কার্জন এতদূর দাম্ভিক ছিলেন যে শিক্ষিত-জনের মতামতকেও তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। প্রধানত তিনটি কাজ বা কুকাজ করিয়া তিনি শিক্ষিতসমাজেব বিবাগভাজন হইলেন। সেই কাজ তিনটি এই :

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৮৯৯
২। ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ১৯০৪
৩। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, ২০ জুলাই ১৯০৪

১৮৭৬ সন হইতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনাব ব্যাপারে কিছুটা স্বায়ত্ত-শাসননীতি প্রবর্তিত হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ৫০ জন ছিলেন নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আর ২৫ জন ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী। কার্জন ১৮৯৯ সনে এক নূতন আইন পাশ করিয়া নাগরিকদের প্রতিনিধি-সংখ্যা কমাইয়া ২৫ জন করিয়া সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের সমান করেন। চেয়ারম্যান থাকেন সরকারী প্রতিনিধি। কাজেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আসল শাসনক্ষমতা সরকাবের হাতে

চলিয়া যায়। এই স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে কলিকাতার নাগরিকরা তীব্র প্রতিবাদ করিলেও কার্জন তাহা অগ্রাহ্য করেন।

কার্জনের দ্বিতীয় আঘাত হইল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, অর্থাৎ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন। ১৯০১ সনে কার্জন সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন, তাহাতে কেবল ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌রা আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনের পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে একটি কমিশন নিয়োগ করেন এবং ইহাতেও একজনও হিন্দুকে আহ্বান করা হয় না। অথচ শিক্ষা-ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রগণ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বার্থই বেশী জড়িত ছিল। আন্দোলন করিবার পর জাষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। কমিশন যাহা প্রস্তাব করেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ তুলিয়া দেওয়া (এই শ্রেণীর কলেজ বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল); (২) আইনের (Law) ক্লাস তুলিয়া দেওয়া; এবং (৩) কলেজের ছাত্রদের মাহিনা নূতন করিয়া ঠিক করা অর্থাৎ বৃদ্ধি করা। এই তিনটি বিষয়েই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা বাংলাদেশের। ইহার ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তাহা বাহিরের প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রকাশ পায়। প্রতিবাদ বিশেষ গ্রাহ্য না করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাশ করা হয়। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়, কারণ সেনেটের অধিকাংশ সভ্য সরকারের মনোনীত হইবেন স্থির হয়। কার্জনের কার্যকলাপে শিক্ষিত সমাজ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। ইহার কিছুদিন পরেই বাংলাবিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ২০ জুলাই ১৯০৫। সমগ্র দেশ জুড়িয়া পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আগ্নেয় বোমার মতো ফাটিয়া পড়ে। কার্জনী কুশাসন ও দম্ভের জবাব দেয় দেশবাসী।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জল্পনা-কল্পনা কয়েক বছর আগে হইতেই চলিতেছিল। স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট হইয়া ১৯০৩ সনে বঙ্গবিভাগের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহাতে প্রস্তাব করা হয় যে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। এখানকার অধিবাসীরা শত শত সভা

করিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদের তীব্রতায় বিচলিত হইয়া কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গে সফর করেন (ফেব্রুয়ারী ১৯০৪)। ইহার পর কিছুদিন বাংলার রাষ্ট্রিক আবহাওয়ায় একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিতে থাকে। ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মতো। হঠাৎ কিছুদিন পরে শোনা যায় ভারতসচিব বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। স্থির হয় যে রাজসাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে, এবং প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের সহিত ছোটনাগপুর বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত করিয়া 'বাংলাদেশ' গঠিত হইবে।

এইভাবে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার পশ্চাতে ছিল ব্রিটিশ শাসকদের একটি রাজনীতিক দুরভিসন্ধি। জাতীয় আন্দোলনে বাংলাদেশই ছিল অগ্রগামী, শিক্ষাদীক্ষাতেও তাহার সমকক্ষ তখন আর কোন প্রদেশ ছিল না। কার্জনের শিক্ষাসংক্রান্ত আইন ও বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা প্রধানত বাঙালীজাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই রচনা করা হইয়াছিল। কার্জন ভাবিয়াছিলেন বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পারিলে ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইবে না।

এই আন্দোলনকে বলা হয় 'স্বদেশী' আন্দোলন। ইহার আগে হইতেই জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রসারও হইতেছিল। সেই আন্দোলনও তো দেশের জন্য দেশীয় লোকের আন্দোলন, তাহাও স্বদেশী। তবে ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ কেন্দ্র করিয়া ভারতব্যাপী যে বিরাট আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছিল তাহাকেই বিশেষ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন বলা হয় কেন? এই সময় জাতীয় আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে স্বদেশী ভাবধারা, স্বদেশী আদর্শ, স্বদেশী পণ্যদ্রব্য পর্যন্ত নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ও স্বদেশী ঐতিহ্যকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরা হয় এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বা আদর্শ যে শ্রেয় নহে তাহাও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রেরণা সংগ্রহ করা হয় আমাদেরই জাতীয় ইতিহাস হইতে—রাজপুত শিখ মারাঠা প্রভৃতি জাতির যে অভ্যুত্থান ও বীরত্বের কাহিনী আমরা আগে বর্ণনা করিয়াছি, প্রধানত সেই ইতিহাসই স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রনীতিক প্রেরণার প্রধান উৎস হইয়া ওঠে। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী পণ্যদ্রব্যের পোষকতা করিয়া বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কটের বা বর্জনের নীতি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষেত্রে 'স্বরাজ'

প্রতিষ্ঠার আদর্শ বড হইয়া ওঠে। এইভাবে সর্বক্ষেত্রে দেশের চিন্তাধারা স্বদেশের মাটিতে শিকড প্রসারিত করিতে উন্মুখ হইয়া ওঠে। এরকম স্বাদেশিকতাবোধ পূর্বে আর কখনও দেশবাসীর মনে জাগে নাই। এই কারণে ১৯০৫ সনের জাতীয় আন্দোলনকে 'স্বদেশী' আন্দোলন বলার সার্থকতা আছে।

বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং আরও অনেকে। মহারাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। বাংলাদেশে 'স্বদেশী' ও 'স্বরাজ' আদর্শের প্রধান প্রবক্তা হইয়া ওঠেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র তিলক ও লাজপৎ রায় সর্বভারতীয় নেতা হইয়া ওঠেন। সেইজন্য লোকে তখন কথায় বলিত **লাল-বাল-পাল**। মহারাষ্ট্রে তিলক ছিলেন 'শিবাজী উৎসবে'র প্রবর্তক। বাংলাদেশেও বীরপূজা আরম্ভ হয়। সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মারাঠি যুবক এই সময় বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন। সখারাম 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা এই পুস্তিকার ভূমিকারূপে প্রকাশিত হয়।

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

বাংলাদেশ ও বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা ও জাতীয় চেতনার মূলে আঘাত করিবার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি কার্জন বঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশকে খণ্ডিত করিয়া বাঙালীর জাতীয় সংহতি ও ঐক্য নষ্ট করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের যে ঝড বহিয়া গেল তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হইল এবং বাংলাদেশে ও সারা ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী নব্যজাতীয়তাবাদীদের আবির্ভাবে ব্রিটিশ শাসকরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র অপেক্ষা বাংলাদেশেই চরমপন্থীদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাহা ছাডা বাংলাদেশই ছিল এই নব্য-স্বাদেশীকতার পীঠস্থান। ইহা ব্রিটিশ শাসকরা জানিতেন। 'যুগান্তর' 'বঙ্গবাসী' 'নবশক্তি' 'সন্ধ্যা' 'স্বরাজ' প্রভৃতি পত্রিকার ভিতর দিয়া বাংলার চরমপন্থীরা যে সব

বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিদিন প্রচার করিতেছিলেন তাহাও শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। এই অবস্থায় বাংলার বিদ্রোহী মনোভাবকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা সঙ্গীন উদ্যত করিলেন।

বলপ্রয়োগ করিয়া কোন বিদ্রোহ কখনও দমন করা যায় না, আগ্নেয়গিরির মতো তাহা ভিতরে ধূমায়িত হইতে থাকে এবং শেষে যে-কোন দিক দিয়া তাহার উদ্গীরণ হয়। ব্রিটিশ দমননীতিতে যখন বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব ও অন্যান্য নেতারা নির্বাচিত হইতে লাগিলেন এবং প্রকাশ্যে স্বাভাবিক আন্দোলনের পথ যখন প্রায় একরকম অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তখন বিদ্রোহী বাংলার অগ্ন্যুদ্গীরণ হইল সন্ত্রাসবাদের (terrorism) পথে। ব্রিটিশ শাসকদের হত্যা করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করাই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য। ১৯০৭-৮ সন হইতে গোপন চক্র গঠন করিয়া বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমদিকে অগ্রগণ্য ছিলেন ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রভৃতি। ইংরেজ হত্যা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য ইঁহারা হাসিমুখে ফাঁসী, দ্বীপান্তর ও কারাবাস বরণ করেন।

জাতীয় আন্দোলনে বাংলার ও পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীদের কোন দান আছে কিনা তাহা লইয়া আজ বিচক্ষণ ও প্রবীণ দেশনেতাদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দেখা দিয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদের নীতি ও পন্থা লইয়া মতভেদ অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহাদের কোন দান আছে কিনা সে-বিষয়ে কোন মতভেদ ঘটিলে তাহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে। সন্ত্রাসবাদীরা যদি বিপথগামীও হইয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদের আদর্শ কলঙ্কিত হয় নাই এবং তাঁহাদের অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে কোনদিন কলঙ্কিত হইবে না।

QUESTIONS

1. Give an account of Ripon's internal reforms.

2. Give a critical review of the administrative policy of Curzon.

3. What led to the Partition of Bengal in 1905? What were its consequences?

4. Trace briefly the history of the Indian nationalist movement from the birth of Congress in 1885 to the end of the Swadeshi movement in 1910-11.

5. Write notes on:

(a) Ilbert Bill 1882-83

(b) Terrorism in Bengal

(c) Bipin Chandra Pal

(d) Bal Gangadhar Tilak

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

জাতীয় সংগ্রাম

উত্তরভারতের আলিগড় ছিল উনিশ শতকের ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায়ের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। এই আন্দোলনের জনক হইলেন **সৈয়দ আহমেদ খাঁ** (১৮১৭-৯৮)। সৈয়দের জন্ম দিল্লীতে এবং উত্তর ভারতই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র। ভারতের হিন্দু-সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের ইতিহাসে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রাণাডে, তিলক প্রমুখ দেশনেতাদের দান যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের মুসলমানদের নবযুগের ভাবধারায় উজ্জীবিত করার কাজে সৈয়দ আহমেদের দানও ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সৈয়দের নিজের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যা ও ইংরাজী ভাষার সহিত একেবারেই পরিচিত ছিলেন না, আরবী-ফার্সীতে ও ইসলামিক শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি ধর্মগোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠিয়া অনুন্নত মুসলমান-সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কথা সবপ্রথম সাহস করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারের ফলে, সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। **আলিগড় আন্দোলন** ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে।

আলিগড় আন্দোলন

১৮৭০ সনে সৈয়দ আহমেদ ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৭৫ সনে আলিগড়ে Muhammadan Anglo-Oriental College নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ইহার পর সৈয়দ আহমেদ আলিগড়কে কেবল বিদ্যাকেন্দ্র নহে, তাঁহার ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলেন।

CHAPTER XXXV: Aligarh Movement—birth of Muslim League—Minto-Morley Reforms (1909). Tilak Bipin Chandra Pal. Split in the Congress. Lala Lajpat Rai The Montague-Chemsford Reforms (1919). Khilafat Agitation. Rowlat Bill. Jalianwala Bag. Gandhiji.

রাজনীতিক ভাবধারায় স্যার সৈয়দ প্রধানত ব্রিটিশপন্থী ও মুসলমানপন্থী ছিলেন। তাঁহার ধর্মচিন্তার মধ্যে উদারতা থাকিলেও রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা ব্রিটিশ পক্ষপুটে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই চালিত হইত। ১৮৮৭ সনে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন বোম্বাইএর বিখ্যাত মুসলমান ব্যারিস্টার বদরুদ্দিন তায়েবজী। এই অধিবেশনকালে লক্ষ্ণৌএ সৈয়দ আহমেদ একটি বক্তৃতায় বলেন যে মুসলমানদের ব্রিটিশ পোষকতার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য তাঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানও গড়িতে পারেন। এই ভেদনীতির বীজ পরে মুসলিম লীগের মধ্যে ধীরে ধীরে বনস্পতির মতো মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। আলিগড়ের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারাও ক্রমে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৯৩৭ সন হইতে আলিগড় মুসলিম লীগের প্রধান আদর্শকেন্দ্র হইয়া ওঠে। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাঁহার Modern Islam in India গ্রন্থে বলিয়াছেন: "Aligarh was by 1941 the emotional centre of Pakistan"—১৯৪২ সনের মধ্যে আলিগড় পাকিস্তান-আদর্শের প্রাণকেন্দ্র হইয়া ওঠে। সৈয়দ আহমেদ প্রবর্তিত আলিগড় আন্দোলনের শেষ পরিণতি হয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় ও পাকিস্তানের আদর্শ প্রচারে। ইহাই আলিগড় আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য।

মুসলিম লীগ

মিণ্টো যখন হিন্দুমুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির কথা চিন্তা করিতেছিলেন তখন মুসলমানসমাজের পয়গম্বর তুল্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের আগা খাঁ তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিলেন (১ অক্টোবর ১৯০৬)। বড়লাটকে যে অভিনন্দন-পত্র তিনি দিলেন তাহা "অভিজাত, ধনিক, জমিদার, আইনজীবী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য মুসলমানদের" পক্ষ হইতে দেওয়া হইতেছে বলিয়া জানানো হইল। এই শ্রেণীর মুসলমানরা সকলেই ব্রিটিশের অনুরাগী প্রজা এবং সেইজন্য ন্যায্যত তাঁহারা ব্রিটিশের অনুগ্রহ দাবী করিতে পারেন—একথাও পত্রে নিবেদন করা হইয়াছিল। এই শ্রেণীর মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করিবার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হয়। এই সংগঠনই **মুসলিম লীগ**। ১৯০৬ সনের শেষে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়, তারপর বছরে একবার করিয়া কংগ্রেসের মতো লীগেরও বিভিন্ন স্থানে অধিবেশন হইতে

থাকে। প্রথম হইতে লীগ কংগ্রেস-বিরোধী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসকরা এই বিরোধিতায় সর্বপ্রকারে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। মুসলমানদের সম্পর্কে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহারা একমাত্র লীগের সহিত পরামর্শ করিতেন। বড় বড় চাকরি মুসলমানদের দিতে হইলে লীগের সমর্থকদেরই দেওয়া হইত। এইভাবে শাসকদের প্রত্যক্ষ পোষকতায় লীগের বিকাশ হইতে থাকে। পরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে লীগ ভারতের মুসলমানদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। লীগের আদর্শ হইয়া ওঠে 'a separate Islamic State for Muslim Indians'—অর্থাৎ পাকিস্তান।

মিণ্টো-মোর্লে সংস্কার ১৯০৭-৯

লর্ড মোর্লে ছিলেন তখন সেক্রেটারী-অফ-স্টেট এবং মিণ্টো ছিলেন ভাইসরয়। উভয়ে মিলিয়া ভারতশাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'মিণ্টো-মোর্লে রিফর্মস' বলা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় সরকার-মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কিছু কমাইয়া নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হয়। উদ্দেশ্য হইল, জাতীয় নেতাদের কিছু ক্ষমতা দিয়া সন্তুষ্ট করা।

আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি পাকা করা। ১৯০৯ সনে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট' অনুযায়ী ভারতের আইনসভায় নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচিত নীতিও স্বীকৃত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীকে চারভাগে ভাগ করা হয়— (ক) সাধারণ, (খ) জমিদার, (গ) মুসলমান ও (ঘ) বিশেষ। হিন্দু ও মুসলমানের ভোটদানের অধিকারের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং ভোটাধিকারের অসমতা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বৈষম্য বাড়াইয়া তোলে। মিণ্টোমোর্লে শাসনসংস্কার কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতীয় প্রতিনিধিদের দিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করিয়া সেই সামান্য ক্ষমতাটুকু আমাদের জাতীয় নেতাদের গ্রহণ করিতে হইয়াছিল

ভারতবর্ষ
১৯১৯
আফগানিস্থান
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
পাঞ্জাব
দিল্লী
আগ্রা
নেপাল
ভুটান
আগ্রা অযোধ্যা
আজমীর
সিন্ধু
করাচী
রাজপুতানা
কচ্ছ
বরোদা
বিহার
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
কটক
ব্রহ্মদেশ
দিউ
বেসিন
বোম্বাই
গোয়া
মান্দ্রাজ
পণ্ডিচেরী
বাঙ্গালোর
ত্রিবাঙ্কুর
ব্রিটিশ রাজ্য
ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্য
দেশীয় রাজ্য
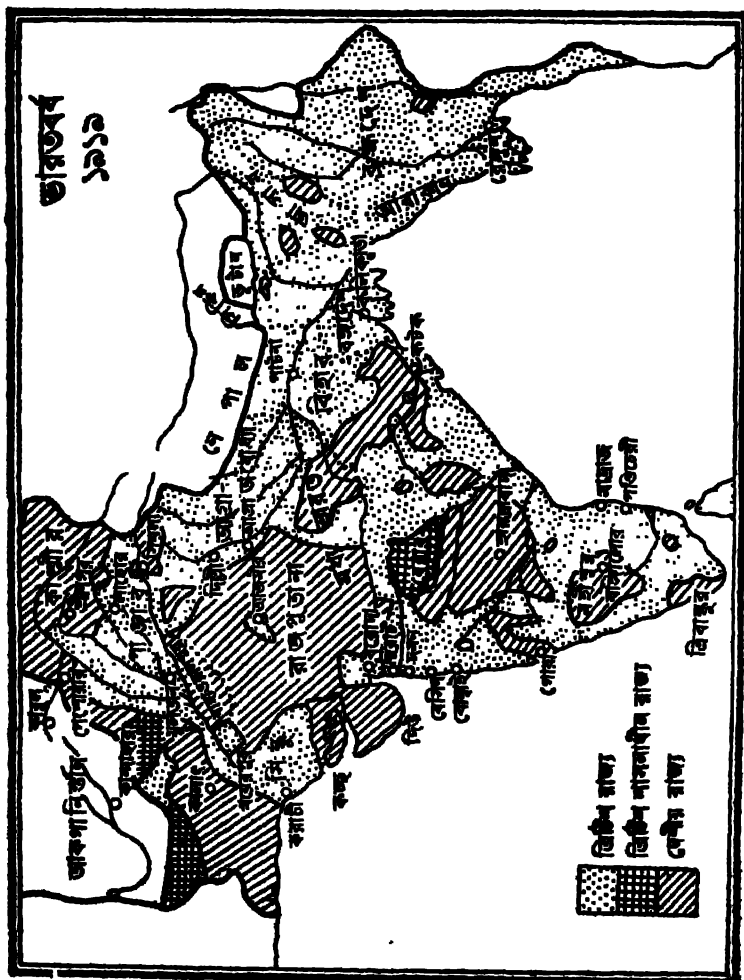
বিপিনচন্দ্র ও তিলক

এই সময় মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার দৈনিক 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মারাঠা' পত্রিকার ভিতর দিয়া 'Home Rule' বা স্বরাজের বার্তা জনসমাজে প্রচার করিতেছিলেন। অ্যানি বেসাণ্ট ১৯১৬, সেপ্টেম্বর মাসে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং তিলক ও তাঁহার অনুগামীরা এই সব সভায় বক্তৃতা করিয়া স্বরাজের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। এদিকে বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পাল নূতন রাজনীতিক ভাবধারার ধারক ও বাহক হইয়া ওঠেন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার ১৯১৭-১৯

১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে ভারতসচিব মণ্টেগু স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিলেন এবং শাসনসংস্কার সম্বন্ধে বড়লাট চেমসফোর্ড ও কয়েকজন ভারতীয় নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন। এই আলোচনার ফলাফল ১৯১৮ সনের জুলাই মাসে 'মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে' প্রকাশ করা হইল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সনের নূতন ভারতশাসন আইন (Government of India Act 1919) রচিত হইল।

এই অ্যাক্ট বা আইন অনুসারে বিচার সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগের দায়িত্ব ভারতীয়দের দেওয়া হইল এবং অন্যান্য বিষয়গুলি (যেমন প্রতিরক্ষা, অর্থ ইত্যাদি) ভাইসরয় ও তাঁহার কার্যনির্বাহক কমিটির অধীনেই রহিল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাতেও এই একই নীতি প্রয়োগ করা হইল। যে-সব বিষয় বড়লাট ও ছোটলাট এবং তাঁহাদের কাউন্সিলের অধীনে রহিল সেগুলিকে 'Reserved' বা 'সংরক্ষিত বিভাগ' বলা হইল এবং যেগুলি হস্তান্তরিত হইল সেগুলির নাম হইল 'Transferred' বা 'হস্তান্তরিত বিভাগ'। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রহিল, কোন পরিবর্তন করা হইল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু বড়লাট ও ছোটলাটের হাতে আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতাও রহিল।

রাওল্যাট অ্যাক্ট ১৯১৯

রাজদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লবপ্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার এই সময় রাওল্যাট সাহেবের অধীনে এক কমিটি নিযুক্ত

করেন। এই কমিটির রিপোর্টে দেশের অরাজকতা সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি দমনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টের ভিত্তিতে বিপ্লবীদের দমন করার অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার আইন পাশ করিয়া ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করিতে উদ্যত হন। সন্দেহ হইলেই যাহাকে খুশী গ্রেফতার করা চলিবে, নির্বাসন দেওয়াও চলিবে, ইহাই আইনের বিষয়বস্তু। ইহা নির্বিচার স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। আইনের প্রস্তাব করা হইলে ভারতব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। দমননীতিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিবাদ উপেক্ষা করেন। সরকার-মনোনীত সদস্যদের ভোটের জোরে 'রাওল্যাট আইন' পাশ করানো হয় (১৮ মার্চ ১৯১৯)। ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৩ এপ্রিল ১৯১৯ প্রায় ১০ হাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ জালিয়ানওয়ালা-বাগের (পাঞ্জাবে) প্রতিবাদ সভায় সমবেত হয়। পাঞ্জাবের অত্যাচারী দাম্ভিক লাটসাহেব মাইকেল ও'ডায়ার সৈন্য ও কামান-বন্দুক লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। একটি বাগের (বাগান) ভিতরের একটি উঁচু জায়গা হইতে নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর নৃশংসভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করেন। সরকারী হিসাব মতে ৩৭৯ জন এবং বেসরকারী হিসাবমতে প্রায় ১০০০ জন গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়ে। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর ভারতজন ঐক্যবদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়।

খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের অন্যায় আচরণে ভারতে মুসল-মানরা গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই বিক্ষোভ হইতেই খিলাফৎ আন্দোলনের জন্ম হয়। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমান-দুনিয়ার 'খলিফা' বা ধর্মগুরু। তুরস্ক-সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইলে অথবা সুলতানের রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে ইসলামধর্মের উপর আঘাত হানা হইবে বলিয়াই মুসলমানরা বিশ্বাস করিতেন। প্রথম যুদ্ধের পর বিজয়ী রাষ্ট্রনায়করা তুর্কী-সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করিলেন

তুরস্কের ইউরোপস্থ অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়া একটি কমিশনের শাসনে রাখা হইল, আরব প্যালেস্টাইন সিরিয়া মেসোপোতামিয়া (ইরাক) ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আড়ালে নিজেরা আয়ত্ত করিলেন। কেবল এসিয়া মাইনর, যেখানে খাঁটি তুর্কীদের বাস, সুলতানের অধীন রাখা হইল। সেভার্স সন্ধির (১৯২০) এইসব শর্ত প্রকাশিত হইবার পর স্বভাবতঃই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের পাশে দাঁড়াইয়া সংগ্রামের নূতন পথ নির্দেশ করেন। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে (১৯২০) গান্ধিজীর নীতি মুসলমানরা সমর্থন করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন সওকৎ আলি ও মহম্মদ আলি। জাতীয় আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পথ খুলিয়া দেন। তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই ঐক্যের পথ আরও প্রশস্ত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর পদক্ষেপ

জাতীয় আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। সমগ্র দেশবাসী যখন পথের সন্ধান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদের নূতন পথ দেখাইয়া দিলেন। তারপর ভারতের জাতীয় আন্দোলন বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া, স্বরাজ ও স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রাখিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাওল্যাট আইন পাশ হইবার আগে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন (১ মার্চ ১৯১৯) যে প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। কিন্তু ইহার ১৭ দিন পরে আইন বিধিবদ্ধ হইল (১৮ মার্চ ১৯১৯)। বোম্বাইএ সত্যাগ্রহ সভা গঠন করিয়া গান্ধীজী ৬ এপ্রিল 'হরতাল' পালন করিবার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করিলেন। সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম এইভাবে আরম্ভ হইল। তাঁহার আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিল, ভারতের সর্বত্র হরতাল পালিত হইল। তারপর এই হরতালের ঢেউ সাতদিনের মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ পর্যন্ত গড়াইল।

কংগ্রেসে মতভেদ

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল (সেপ্টেম্বর ১৯২০)। সভাপতি হইলেন লালা লাজপৎ রায়। সকলের দৃষ্টি নূতন নেতা মহাত্মা গান্ধীর দিকে

এবং সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় এই নূতন নেতার বাণী ও সংগ্রামনীতি—সত্যাগ্রহ ও অহিংসা অসহযোগ। মডারেট বা পুরাতনপন্থীরা এই নীতি সমর্থন করেন নাই। নূতনপন্থীদের মধ্যেও এই নীতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারা মহাত্মার আদর্শকে গ্রহণ করিলেও তাঁহার কর্মনীতিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। অ্যানি বেসান্ত এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ নেতারাও ইহা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। প্রবীণ নেতাদের মধ্যে সমর্থন করিয়াছিলেন কেবল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। চারদিন ধরিয়া গান্ধীজীর নীতি লইয়া সভায় আলোচনা ও তর্ক হইল। অবশেষে ভোটাধিক্যে তাঁহার নীতি গৃহীত হইল, ১৮৮৬ জন এই নীতির পক্ষে ভোট দিলেন, ৮৮৪ জন বিপক্ষে ভোট দিলেন। উল্লেখযোগ্য হইল, কলিকাতার এই অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিরা অনেক বেশী সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অধিকাংশই গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতেও অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হয় নাগপুরে, সভাপতি হন প্রবীণ নেতা বিজয়রাঘব আচার। প্রায় ১৪,০০০ প্রতিনিধি এবং ততোধিক দর্শক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। অসহযোগের আহ্বান জনচিত্তে যে কতখানি সাড়া জাগাইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাণ। অধিবেশনে অসহযোগ-নীতি লইয়া তুমুল বাদানুবাদ হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও লাজপৎ রায়ের মতো বিরুদ্ধবাদীরাও গান্ধীজীর মত সমর্থন করেন। পূর্বের অসহযোগ প্রস্তাব স্বয়ং চিত্তরঞ্জন আরও ব্যাপকতর করিয়া প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং তাহা সমর্থন করেন লাজপৎ রায়। মহাত্মা গান্ধীর কেবল ভোটের জয় নহে, নৈতিক জয়ও হইল।

QUESTIONS

1. Write notes on :
   (a) Muslim League and Aligarh movement.
   (b) Morley-Minto Reforms, 1909
   (c) Montagu-Chemsford Reforms, 1919
   (d) Rowlat Act 1919
   (e) Jalianwalabag
   (f) Calcutta and Nagpur Congress, 1920-21

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

জাতীয় স্বাধীনতার পথে

নাগপুর কংগ্রেসকে অনেকে "গান্ধী কংগ্রেস" বলিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জন নহে, কারণ নাগপুর অধিবেশন হইতেই গান্ধীজীর আদর্শে কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন নূতন অহিংস অসহযোগের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলন। প্রথম পর্ব ১৯২০-২১

১৯২০ সনের ১ আগস্ট হইতে মহাত্মার নূতন নীতির বিরাট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে স্থির হয়। সকলশ্রেণীর ভারতজনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এরকম দেশজোড়া আলোড়ন পরে হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে আর কখনও হয় নাই। আন্দোলনের নীতি ছিল **অহিংস অসহযোগ**। জনসাধারণ এই আদর্শে উদ্বুদ্ধও হইয়াছিল, কিন্তু শাসক ও পুলিশের নির্যাতন সহ্য করিয়া সর্বত্র সকলের পক্ষে 'অহিংস' থাকা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

কয়েকস্থানে অহিংসনীতির বাঁধ ভাঙিয়া গেল, নির্যাতিত দেশবাসীর পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব হইল না। যুক্তপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানায় একজন দারোগা ও একুশজন কনেস্টবলকে জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নিদগ্ধ করিল। এই সংবাদে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহার

CHAPTER XXXVI—Non Co-operation Movement—Swarajya party and Council entry, Simon Commission.

2nd phase of Non co-operation Movement. Round Table Conference. The Government of India Act : 1935. Congress Government in seven provinces—Jinnah and his demands. Outbreak of second World War Pakistan Resolution. Cripps Mission. August Rebellion Subhas Chandra Bose and I. N. A. Cabinet Mission. Transfer of Power on the basis of Partition (1947). Independence of India. Nehru.

'আন্দোলনকে' হিমালয়প্রমাণ ভুল (Himalayan blunder) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইল।

স্বরাজ্য পার্টি

আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি অনেকে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যখন বন্ধ হইল তখন প্রশ্ন উঠিল 'আইনসভায়' যোগদান করা উচিত কিনা। গান্ধীপন্থীরা বলিলেন উচিত নহে, ব্রিটিশ শাসকের সহিত সহযোগিতা না করাই ভাল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ইঁহারা বলিলেন যে আন্দোলন করিব না, অথচ হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিব, ইহা কোন কাজের কথা নহে। আইনসভায় প্রবেশ করিলেই ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা করা হয় না। বিরোধীদল হিসাবে আইনসভার ভিতরে বসিয়া ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং তাহাতে দেশবাসীকে অনেক বিষয়ে সচেতন করা চলে। অতএব আইনসভায় প্রবেশ করা দরকার।

১৯২২ সনে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সংখ্যাধিক্যের জোরে গান্ধীপন্থীরা তাঁহাদের নীতি মঞ্জুর করাইয়া লইলেন, চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের নিয়মাধীনে থাকিয়াই তাঁহার নীতি অনুযায়ী নূতন একটি 'দল' গঠন করিলেন। এই দলই হইল 'স্বরাজ্য পার্টি' বা স্বরাজ্য দল। এই দল গান্ধীনীতির পরিবর্তনের পক্ষে, সেইজন্য ইঁহাদের বলা হইত 'pro changer' (যাঁহারা পরিবর্তন চান), আর গান্ধীবাদীদের বলা হইত 'no-changer' (যাঁহারা পরিবর্তন চান না)। মতিলাল নেহরু, বিটলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, কেলকার, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতারা আইনসভায় যোগদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়া দেশবন্ধুর "স্বরাজ্য দলে" যোগ দিলেন। দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু হইলেন স্বরাজ্য দলের প্রধান নেতা। বাংলাদেশে ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে স্বরাজ্য দলের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ১৯২৫ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল দুর্বল হইয়া পড়ে।

সাইমন কমিশন ১৯২৭

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসনসংস্কারের সময় বলা হইয়াছিল যে দশ বছর পরে নূতন শাসনব্যবস্থা কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহা পার্লামেণ্টারী কমিশন নিয়োগ করিয়া তদন্ত করা হইবে। ঘটনাচক্রে বছর দুই আগেই এই তদন্তের ব্যবস্থা করা হইল। স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল ১৯২৭ সনে, কিন্তু তাহাতে একজনও ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইল না। সারা ভারতে কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। কমিশন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব করেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলি যাহাতে তাহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে সেই পথও খোলা রাখিতে বলেন।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ

১৯২৭ সনে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হইল মাদ্রাজে, সভাপতি হইলেন মহম্মদ আলি আনসারি। এই অধিবেশনে প্রগতিশীল দলের নূতন নেতা মতিলালের পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯২৯ সনে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন—দ্বিতীয় পর্ব ১৯৩০-৩২

লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবে আইনসভা হইতে ভারতীয় সদস্যদের পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। নির্দেশ অনুসারে ১৭২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। প্রস্তাবে একথাও বলা হইয়াছিল যে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যখনই সংগ্রামের সময় উপস্থিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তখনই ট্যাক্স বন্ধ করিয়া, আইন অমান্য করিয়া বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারিবেন। সাইমন কমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনসংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট

ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দল বাতিল করিয়া দেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। গান্ধীজী তাঁহার সবরমতী আশ্রমের শিষ্যদের লইয়া সমুদ্রকূলে ডাণ্ডিতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য যাত্রা করেন (৬ এপ্রিল ১৯৩০)। ভারতের গ্রামে গ্রামে আইনভঙ্গের ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়। লবণ তৈরী করা, মাদকদ্রব্য ও বিদেশী পণ্যের দোকানে পিকেটিং করা, স্কুল-কলেজ ও সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন করা ইত্যাদি ছিল আন্দোলনের কর্মসূচী. ব্রিটিশ শাসকরা পূর্ণমাত্রায় দমননীতি প্রয়োগ করিয়াও আন্দোলন দাবাইতে পারেন নাই। সামরিক আইন, জরুরী আইন ইত্যাদি জারী করা হইযাছিল, কংগ্রেস ও তাহার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। তবু আন্দোলনের জোয়ার রোধ করা সম্ভব হয় নাই।

গোলটেবিল বৈঠক

যখন আন্দোলন চলিতেছিল তখন বিলাতে সাইমন কমিশনের শাসনসংস্কার প্রস্তাব আলোচনার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠক বসে, কিন্তু তাহাতে কংগ্রেস যোগ না দেওয়াতে আলোচনা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার যে বৈঠক বসে (১৯৩১) তাহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজী যোগদান করিবেন স্থির হয়। সেই উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ভাইসরয় আরুইন ও গান্ধীজীর মধ্যে একটি আপস-রফা হয়। ইহা 'গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট' নামে কথিত। গান্ধীজী ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা কারামুক্ত হন। কিন্তু দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধীজী যোগদান করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই, কারণ মুসলমান প্রতিনিধিরা এই সময় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শাসনসংস্কার দাবী করিয়া সমস্ত আলোচনা পণ্ড করিয়া দেন। শূন্যহাতে গান্ধীজী ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯৩২ সনে তৃতীয়বার গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়, কিন্তু কংগ্রেস তাহা বর্জন করে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজী পুনরায় আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং পুলিশের অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

এই সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কেবল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে, হিন্দুদের মধ্যেও জাতিবর্ণগত বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির

উদ্দেশ্যে 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' (Communal Award) প্রস্তাব করেন। ইহাতে হিন্দুদের 'বর্ণ-হিন্দু' (Caste Hindus) ও 'অনুন্নত' বা 'তপশীল-হিন্দু' (Scheduled Castes)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। অনুন্নত বর্ণের হিন্দুদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে ভারতের জনসমাজকে ত্রিখণ্ডিত করা হয়।

ভারতশাসন আইন ১৯৩৫

১৯৩৫ সনে নূতন ভারতশাসন আইন পাশ করা হইল। এই আইন অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া একটি 'ফেডারেশন' বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে স্থির করা হইল। এই ফেডারেশনে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগ দেওয়ার বাধ্যতা রহিল না, উহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইচ্ছাধীন রহিল। ফেডারেশনের শাসনভার থাকিবে বড়লাট ও তাঁহার মন্ত্রিসভার উপর এবং বড়লাট তাঁহার খুশিমত মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে—'রাষ্ট্র-পরিষদ' ও 'ব্যবস্থাপক-সভা,' এবং উভয় পরিষদেই ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকিবেন। এই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ আয়ত্তেই রাখা হইল, কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছুই হইল না।

নূতন শাসন-আইন অনুসারে ভারতবর্ষকে ১১টি প্রদেশে বিভক্ত করা হইল—বাংলা বোম্বাই মাদ্রাজ সিন্ধু পাঞ্জাব বিহার উড়িষ্যা আসাম যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ। ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। ব্যবস্থাটি এই: প্রাদেশিক শাসনকার্যের সর্বময় কর্তারূপে একজন করিয়া 'গভর্ণর' থাকিবেন, তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য থাকিবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা। মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকিবেন এবং ভোটাধিক্যে আইনসভার সভ্যরা তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। গভর্ণর প্রয়োজন বুঝিলে মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াও কাজ করিতে পারিবেন। শান্তি-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জরুরী অবস্থায় 'অর্ডিন্যান্স' জারী করিবার ক্ষমতাও গভর্ণরের থাকিবে। এই শাসনব্যবস্থাও যে কতদূর "স্বায়ত্ত" নামের যোগ্য তাহা গভর্ণরের ক্ষমতা হইতে বোঝা যায়।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

১৯৩৭ সনের ১ এপ্রিল হইতে এই নূতন শাসনব্যবস্থা প্রদেশগুলিতে চালু করা হইবে স্থির হইল। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনীতিক দল শাসন দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে (election) দাঁড়াইবে সিদ্ধান্ত করিল। মাদ্রাজ মধ্যপ্রদেশ যুক্তপ্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস সর্বাধিক সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হইল। বাংলা বোম্বাই আসাম ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস অন্যান্য দল অপেক্ষা বেশী আসন পাইল। প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট লিনলিথগো প্রতিশ্রুতি দেন যে গভর্ণর দৈনন্দিন শাসনকার্যে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি পাইবার পর কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে—বিহার উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত—মন্ত্রিসভা গঠন করে।

মুসলিম লীগের নেতারা কংগ্রেসের সাফল্যে বিচলিত হন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে কংগ্রেস-লীগের মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁহাদের আহ্বান করা হইবে, কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে সম্মত হয় নাই। ইহার পর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিতে থাকে। লীগ পূর্ণোদ্যমে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রচারে ব্রতী হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনির ইটালির সহিত ইংলণ্ড-ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল। ভারতের ভাইসরয় ভারতবর্ষকেও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে যুদ্ধে যোগদান করা বা না-করা ভারতের জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থের উপর নির্ভর করে, ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ব্রিটিশ শাসকরা প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রে যুদ্ধকালীন অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের ভিত্তিতে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে চাহিল বটে, কিন্তু তাহা ব্রিটিশ সরকার গ্রাহ্য করিলেন না।

মুসলীম লীগের 'পাকিস্তান' দাবী

মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের রাজনীতিক আদর্শের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের প্রতিষ্ঠার পর হইতে। মুসলমানদের জন্ত জিন্না আগেই তাঁহার দাবী-দাওয়ার দীর্ঘ তালিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা '১৪-দফা দাবী' (Fourteen Points) নামে পরিচিত। অর্থাৎ প্রশাসনিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা জিন্না চৌদ্দ দফায় তালিকা করিয়া দাবী করিয়াছিলেন। যখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে তখন লীগ ভারতের বহুস্থানে 'মুক্তি দিবস' (Day of Deliverance') পালন করে। অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসন হইতে মুসলমানদের মুক্তি ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্তি অপেক্ষাও বেশী কাম্য ও আনন্দদায়ক—ইহাই উৎসব করিয়া মুসলমানদের বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ১৯৪০ সনে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন হইল জিন্নার সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে লীগ ভারতের মধ্যে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র দাবী করিল। কেহ বলেন পাঞ্জাবের P, আফগান-অঞ্চলের A, কাশ্মীরের K, ইহা মিলাইয়া 'PAK'—'পাক' বা 'পাকিস্তান' কথা হইয়াছে। 'পাকিস্তান' কথার অর্থ মুসলমানদের পবিত্রভূমি। এতদিন পরে জিন্না ও তাঁহাব করতলগত লীগের আবিষ্কার হইল যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি একেবারে 'পৃথক জাতি'—'ভারতীয়' বা 'ভারতজন' নহে। অবশ্য আজও ভারতের বহু মুসলমান লীগের এই আবিষ্কারকে মহাসত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসও তাঁহারা হারান নাই। ইহাই কংগ্রেসের একমাত্র সান্ত্বনা।

ক্রিপস-এর দৌত্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ইউরোপ হইতে এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া বসিল। ভারত-সীমান্তে যুদ্ধের কুচকাওয়াজ শোনা গেল, ভারতের আকাশে জাপানী বোমারুবিমান হানা দিতে লাগিল। ব্রিটিশের সমূহ বিপদ উপস্থিত, যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন রক্ষা নাই। এই সংকটের সম্মুখীন হইয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে (Stafford Cripps) ভারতে পাঠাইলেন, জাতীয় নেতাদের সঙ্গে

আলাপ-আলোচনার জন্য। ক্রিপ্স্ প্রস্তাব করিলেন যে যুদ্ধান্তে ভারতকে নিজ সংবিধান (Constitution) রচনার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং সংবিধান-সভায় দেশীয় রাজ্যগুলিও যোগদান করিতে পারিবে। সভায় যে শাসনব্যবস্থা গৃহীত হইবে তাহাই ভারতে প্রবর্তন করা হইবে, তবে কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য যদি তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করে তাহা হইলে তাহার নিজস্ব ব্যবস্থা নিজের করিবার অধিকার থাকিবে। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি হইতে সংবিধান-সভার সদস্যরা নির্বাচিত হইবেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব অবশ্য ব্রিটিশের থাকিবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। গান্ধীজী এই প্রতিশ্রুতিকে পড়ন্ত ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ তারিখের চেকের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন।

আগস্ট আন্দোলন। আজাদ হিন্দ ফৌজ

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর গান্ধীজীর নির্দেশে 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করে (১৭ জুলাই ১৯৪২)। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব ৮ আগস্ট তারিখে অনুমোদিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয় এবং নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ভারতের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। গান্ধীজী পরিষ্কার ইহাকে 'open rebellion' বা প্রকাশ্য গণবিদ্রোহ আখ্যা দেন এবং 'do or die' বা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। রেলপথ, থানা, ডাকঘর, সরকারী ঘরবাড়ি উপড়াইয়া, আগুন জ্বালাইয়া ভারতের পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভ সমগ্র দেশ জুড়িয়া ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আগস্ট মাসে (১৯৪২) এই গণবিক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'August Rebellion' বলা হয়।

মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি গোপনে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া ব্রিটিশবিরোধী জাপান-জার্মানির সহিত হাত মেলান এবং সিঙ্গাপুরে ভারতের মুক্তিফৌজ বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। Indian National Army বলিয়া ইহাকে I. N. A বলা হয়। শোনা যায় এই মুক্তিফৌজ নাকি আসাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর জাপানের পরাজয় হয় এবং

সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করেন। আজও তাঁহার অন্তর্ধান—মৃত্যু বলিয়া ঘোষিত হইলেও—অনেকের কাছে রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নেতাদের বিচার হয় দিল্লীর লালকেল্লায়। বিচারের ফলে ভারতের সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয় (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)। ইহা যে এক নিদারুণ ভয়াবহ পরিস্থিতির সংকেত তাহা ব্রিটিশ শাসকরা বুঝিতে পারেন।

ক্যাবিনেট মিশন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ইংলণ্ডে 'লেবার পার্টি' (শ্রমিক দল) সাধারণ-নির্বাচনে জয়ী হইল। ভারতেও যে সাধারণ-নির্বাচন হইল তাহাতে বিপুল জনসমর্থনে কংগ্রেসের জয় হইল। পেথিক-লরেন্স ভারতসচিব হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে আরও দুইজন ব্রিটিশ মন্ত্রী ক্রিপ্‌স ও আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিলেন একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য।

তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী এই আলোচনার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'ক্যাবিনেট মিশন' বা 'মন্ত্রীমিশন' বলা হয়। ২৪ মার্চ ১৯৪৬ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

কংগ্রেস ও লীগের সহিত মিশনের আলোচনা হইল, কিন্তু লীগের একগুঁয়েমির জন্য কংগ্রেসের পক্ষে কোন সম্মিলিত দাবী মিশনের কাছে পেশ করা সম্ভব হইল না। তিনটি অঞ্চলে ভারতকে বিভক্ত করিয়া মিশন সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করিলেন। অঞ্চল তিনটি এই—(ক) উত্তরপশ্চিম অঞ্চল, (খ) উত্তরপূর্ব অঞ্চল, বাংলা ও আসাম এবং (গ) অবশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারত। এই তিনটি অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংবিধান-সভা গঠিত হইবে স্থির হইল। দেশীয় রাজ্যগুলিও ইচ্ছা করিলে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারিবে। যে পর্যন্ত না সংবিধান রচিত হয় সেই সময় পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া 'অন্তর্বর্তী সরকার' (Interim Government) গঠিত হইবে।

এই ব্যবস্থাতেও আবার কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী হইল না, লীগ রাজী হইল। কিন্তু শুধু লীগের সম্মতিতে কোন জাতীয় সরকার গঠন করা যায় না জানিয়া তদানীন্তন ভাইসরয় ওয়াভেল কোন সরকার-গঠনে রাজী হইলেন না।

লীগ সংবিধান-সভার নির্বাচন বয়কট করিবে সিদ্ধান্ত করিল এবং 'direct action' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয় দেখাইল। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইল এবং তাহার প্রধান রঙ্গভূমি হইল কলিকাতা। হিন্দু-মুসলমানে এরকম নৃশংস হানাহানি ভারতের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 'অন্তর্বর্তী সরকার' গঠন করিলেন এবং লীগ তাহাতে অনেক টালবাহনা করিয়া যোগ দিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে লীগ-প্রতিনিধিদের কার্যকলাপে ব্যবস্থা অচল হইয়া উঠিল। ওয়াভেল দেশে ফিরিয়া গেলেন, মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হইয়া আসিলেন।

স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তান

দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভারতের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ম্যাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করিলেন যে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। লীগের 'পাকিস্থান' দাবী স্বীকৃত হইল. কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কংগ্রেসকেও ইহা মানিয়া লইতে হইল। 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' দুইটি রাষ্ট্রে চিরদিনের অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইয়া গেল।

৫ই জুলাই ১৯৪৭ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই মর্মে একটি 'বিল' পেশ করা হইল যে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিয়া তাহাদের হাতে ব্রিটিশ শাসকরা সমস্ত শাসনভার অর্পণ করিবেন। এই Independance Bill ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ হইতে কার্যকর হইল এবং ঐদিন হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইল।

QUESTIONS

1. Give a brief account of the Non co-operation Movements of 1920-21 and 1931-32.
2. Write what you know about the constitutional reform effected in India between 1919 and 1947.
3. Give a short account of the freedom movement in India from 1920 21 to 1947.
4. Write notes on :
   (a) August Rebellion, 1942
   (b) Cripps Mission
   (c) Cabinet Mission
   (d) 'Pakistan Resolution' of the Muslim League
   (e) I. N. A.

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

উনিশ শতকের জাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নূতন প্রাণ-স্পন্দন শোনা যায় এবং এক নূতন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজ ও জীবনকে গড়িয়া তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেকের মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহাকেই বলা হয় নবজাগরণ। 'naissance' ফরাসী কথা, অর্থ হইল 'জন্ম'—সুতরাং 're-naissance' কথার অর্থ পুনর্জন্ম অর্থাৎ নূতন জীবন বা নবজাগরণ। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমল হইতেই আমাদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বোম্বেটে বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের ক্রমাগত অভিযানে, যুদ্ধবিগ্রহে, অন্যায় অত্যাচারে সমাজের শৃঙ্খলা সংযম ও সুনীতির বন্ধন দ্রুত শিথিল হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে জীবনে ভাঙন ধরিতে থাকে। সমাজে কূপমণ্ডূকের মতো মনোভাব, জাতিবর্ণের ভেদবৈষম্য, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, সতীদাহ, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতিপ্রবণতা প্রভৃতি যত-রকমের অধঃপতনের উপসর্গ আছে সবই পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। সমাজের আর নড়াচড়া করিবার মতো শক্তি ছিল না। এই সময় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত ও নূতন শিক্ষাদীক্ষার ফলে এদেশের মানুষ সমাজের মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।*

* ইহার সহিত পূর্বের ২৯ অধ্যায় পঠিতব্য।

CHAPTER XXXVII—(1) Religious movements—Brahmo Samaj, Paramahamsa, Vivekananda, Sri Arabindo

(2) Social changes in the second half of the 19th Century.

(3) Development of Art and Literature, Bankim Chandra, Michael Madhusudan, Rabindranath, Abanindranath.

ধর্মসংস্কার আন্দোলন

উনিশ শতকের প্রথম হইতে ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন প্রবর্তন করেন **রাজা রামমোহন রায়** (১৭৭৪-১৮৩৩)। ইসলামধর্মের সংঘাতকালে মুসলমান আমলে দক্ষিণভারতে যেমন শঙ্করাচার্য, রামানুজ এবং উত্তরভারতে রামানন্দ কবীর নানক শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মসংস্কারকের আবিভাব হইয়াছিল, তেমনি ইংরেজ আমলে খ্রীষ্টধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংঘাতকালে পূর্বভারতে বাংলাদেশে রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টান পাদরিরা হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা জাতিবর্ণভেদ সতীদাহ বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানাবিধ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কুৎসা রটাইতেন এবং অশিক্ষিত অসহায় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই ধর্মসংকটকালে রামমোহন হিন্দুধর্মকে যুগসঞ্চিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া প্রাচীন বেদ উপনিষদ কল্পিত সত্যকার ধর্মাদর্শের ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়' ব্রহ্মের আদর্শ প্রচার করিয়া তিনি খ্রীষ্টানদের বুঝাইয়া দেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যেও এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে।

ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার বিষয়ে ঘরোয়া বৈঠকে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য রামমোহন ১৮১৫ সনে **আত্মীয় সভা** নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ সনে ব্রহ্মের উপাসনার জন্য **ব্রহ্মসভা** নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করেন। এই ব্রহ্মসভাই পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে **ব্রাহ্মসমাজ** নামে পরিচিত হয়। ক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের আদর্শ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮১৭-১৯০৫) ও **কেশবচন্দ্র সেনের** (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন বেশ ব্যাপক হইয়া ওঠে এবং বাংলার বাহিরেও তাহার প্রসার হয়। উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির আন্দোলনে এই ব্রাহ্মসমাজের দান অনেক। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মসংস্কার আন্দোলন উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে এবং **রামকৃষ্ণ পরমহংস** ও **স্বামী বিবেকানন্দের** সজীব ধর্মাদর্শের কাছে কতকটা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এদেশে ধর্মসংস্কার ও সমাজ

সংস্কারের চেতনা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের দান নবজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সমাজসংস্কার আন্দোলন

উনিশ শতকের নবজাগরণের ধর্মসংস্কারের সহিত শিক্ষা ও সমাজসংস্কার অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। রামমোহন যেমন একদিকে এক-ব্রহ্মের উপাসনার আদর্শ প্রচারের জন্য বহু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সতীদাহ জাতিবর্ণভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীর কাছে যুক্তিপূর্ণ আবেদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার এক বা একাধিক স্ত্রী স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতেন। ইহাকে সহমরণ বা **সতীদাহ** বলা হইত। স্বামীর সহিত যাঁহারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতেন তাঁহাদেরই প্রকৃত সতী বলা হইত। এই সতীদাহ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। তাহার কারণ মনে হয় ধর্মগোঁড়ামি, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা।

রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া আন্দোলন করিতে থাকেন। ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হইবে মনে করিয়া ইংরেজ শাসকরাও ইহা আইন করিয়া বন্ধ করিতে টালবাহানা করিতেছিলেন। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ গভর্ণর-জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক **সতীদাহপ্রথা বেআইনী** বলিয়া ঘোষণা করেন। রামমোহন ও তাঁহার সহকর্মীদের আন্দোলনেই বেন্টিঙ্ক প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর তোলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইবার পর সমাজসংস্কার আন্দোলনে নূতন প্রাণসঞ্চার হয়।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** (১৮২০-৯১) নব-যুগের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে আবির্ভূত হন। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাদের পুন-বিবাহের পক্ষে বহু পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের পক্ষে দেশের জনমত গঠনে অগ্রসর হন। ৪ অক্টোবর ১৮৫৫ তিনি বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করেন এবং ২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫ বহুবিবাহ আইন বন্ধ করার জন্য আবেদন পাঠান। **১৬ জুলাই ১৮৫৬**

বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং বিলম্ব না করিয়া সেই বছরই ৭ ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর নিজে উদ্‌যোগী হইয়া কলিকাতায় একটি বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহ। নারীজাতির মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের দান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা শতাধিক বছর পরে আজ আমরা কিছুটা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগরের কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের **তত্ত্ববোধিনী সভা** সামাজিক সংস্কারকর্মে ব্রতী হন, পরে কেশবচন্দ্র সেনের আমলে ইহা আরও ব্যাপক হয়। ১৮৭১ সনে কেশবচন্দ্র **সমাজসংস্কার সভা** স্থাপন করিয়া নারীকল্যাণ, নারী শিক্ষা, শ্রমজীবি বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। **১৮৭২ সনে** কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই **ব্রাহ্মবিবাহ বিল Civil Marriage Act** নামে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে বিবাহবিচ্ছেদ (divorce) স্বীকৃত হওয়ায় এদেশের স্ত্রীজাতি আর একটি সামাজিক ও মানবিক অধিকার লাভ করে আইনের চোখে। পরবর্তীকালে এই সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা জাতীয় আন্দোলনের ধারার সহিত মিশিয়া গিয়া বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

উনিশ শতকের এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয় এবং বহুযুগের সামাজিক দাসত্ব হইতে নারীজাতি মুক্তি পাইতে থাকে। স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের এই স্বীকৃতি উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম দান।

ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় উনিশ শতক হইতে গদ্যসাহিত্যের (prose literature) বিকাশ হইতে থাকে। সাহিত্যের বিষয়বস্তুও বদলাইয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে মানুষ ও সমাজের স্থান ছিল বটে, কিন্তু দেবতা ও পরলোকের স্থান ছিল তাহার অনেক উপরে। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইল মানুষ ও মানুষের সমাজ। কাব্যসাহিত্যের রূপান্তর ঘটিল। দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনী ছাড়িয়া কাব্যও মানুষের অনুভূতি আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিল। এই ব্যক্তিচেতনার ভিতর দিয়া সাহিত্য ধীরে ধীরে নূতন জাতীয়তাবোধেরও বাহন হইয়া উঠিল।

বাংলাদেশে মাইকেল মধুসূদন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কথাশিল্পীরা আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তন করিলেন। এই সাহিত্যের ভিতরেই নূতন জাতীয়তাবোধের স্পন্দন শোনা গেল। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য,' দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা' প্রভৃতি রচনা এই জাতীয়তা-বোধকে জনসমাজে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিল। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির দেশপ্রেমিক রচনাও এই জাতীয়তাবোধকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছে। বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন জাতীয় সাহিত্যের বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করে।

শিল্পকলার বিকাশ

সাহিত্যের মতো ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যেও ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য বিষয়বস্তু ও রীতি (style) আমাদের দেশের শিল্পীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এমন কি পটুয়াদের মতো লোকশিল্পীরাও এই প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। শিল্পী রবিবর্মা এ পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুকরণে শিল্পচর্চা করিয়া উনিশ শতকের শেষপর্বে এদেশে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে ভারতীয় শিল্পরীতির নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারার দিকে তরুণ শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে। যাঁহারা ভারতীয় শিল্পধারার পুনরনুশীলনে উদ্যোগী হন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ছাত্ররা জাতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন শিল্পরীতি ভারতে প্রবর্তন করেন।

QUESTIONS

1. Give a brief account of the religious reform movements in India in the 19th century.

2. Give a brief account of the social reform movements in India in the 19th century.

3. Give a short account of the development of modern literature and art in India in the 19th century.